সুধাবিষে মিশে

নবকুমার বসু

রীডার্স কর্নার
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন । কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ

শ্রীসমর দে

প্রকাশক ও মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

বোধি প্রেস । ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন । কলিকাতা ৬

মৌসুমী ও বাপী সমাদ্দার
প্রীতিভাজনেষু

দেবতোষ দেখলেন গাছের পাতার রং বদলে যাচ্ছে। ঘন সবুজ, ফ্যাকাশে হতে শুরু করেছে, এর পরেই বাদামি কমলা লাল ছোপ ধরে যাবে। দেখে মনে হবে যেন আর এক ফুলের ঋতু আসছে। আসলে তো তা নয়। ফুল ঝরে গেছে কবেই, এবার আসছে পাতা ঝরার পালা। কীভাবে ঝরার আগে একবার রঙিন হয়ে ওঠে, সাজিয়ে দেয় গাছগুলোকে। অথচ সে সাজ নিঃস্ব আর রিক্ত হয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি। এই কি যাওয়ার আগে রাঙিয়ে দিয়ে যাওয়া!

অবস্থাটা কি তাঁর মতোই!

নিঃশব্দে ভেসে ওঠা চোরা প্রশ্নটাকে প্রশ্রয় দিলেন না দেবতোষ। ঝরে যাওয়ার মতো একটা নেতিবাচক বিষয়কে এমনকী নিজের সম্পর্কেও এখনও মাথায় ঠাঁই দিতে চান না। কেনই বা দেবেন! তেষট্টি বছর বয়সে এখন ভারতের মতো দেশেই কেউ নিজেকে প্রবীণ বলতে চান না, এ দেশে তো নয়ই। মাত্র দুদিন আগেই বিবিসি খবর জানিয়েছে, সরকার পঁয়ষট্টির বদলে, অবসর গ্রহণের বয়স সাতষট্টি করার কথা ভাবছে। যদিও তিনি অগ্রিম অবসর নিয়েছেন কলেজ থেকে, কিন্তু অবশ্যই সেটা বয়সের কারণে নয়। বরং বলা যেতে পারে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জীবনকে আরও টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যই। এমনকী দরকার বুঝলে, এখন আবার নতুন কাজেও তিনি বহাল হতে পারেন। অভিজ্ঞতা, স্বাস্থ্য সব মিলিয়ে এ দেশে অন্তত এখনও তাঁর কাজের অভাব হবে না।

এ সবই জানা কথা দেবতোষের। অথচ তা সত্ত্বেও, তাঁর কনজারভেটরির এই চতুর্দিকে কাচ লাগানো ঘরটা থেকে বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলতেই যেন প্রকৃতির অনুষঙ্গে কোথায় একটা বিমর্ষতা ছুঁয়ে রইল

মনের মধ্যে। কিছু দিন ধরেই এমন হচ্ছে। কারণটাও তাঁর অজানা নয়। কিন্তু কিছুতে যেন এমন একটা রাস্তা খুঁজে পাচ্ছেন না, কিংবা সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না, যাতে অবস্থাটা পুরো কাটিয়ে ওঠা যায়। অথচ কাটাতে যে হবে সে-ব্যাপারে তিনি নিঃসন্দেহ।

এ কি তাঁরই মন এবং ভাবনার কোনও গোপন দুর্বলতা। নাকি বিদেশবিভুঁই-এ এমন একটি পরিস্থিতির মোকাবিলা করার মতন যথেষ্ট অভিজ্ঞতা কিংবা মানসিক প্রস্তুতির অভাব। কিন্তু দুর্বলতার প্রশ্নটাই বা উঠবে কেন? দুর্বলতা কখন অধিকার করে মনকে। কোনও অপরাধ বা অভাববোধ কিংবা সংশয়-ত্রাস-সন্দেহ-আশঙ্কা যখন মনকে আচ্ছন্ন করে তখনই তো!

কাচের ঘর থেকে বাগানের সিলভার-বার্চ গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নীরবে আর একটি শব্দের উদ্ভাস ক্রমশ ধোঁয়ার মতো ভাসতে থাকে দেবতোষের ভাবনায়। স্নেহ। দুর্বলতার আর একটি দুর্ভেদ্য আবাস হচ্ছে স্নেহ। ভালবাসার সঙ্গে ঠিক কোথায় এবং কতখানি তফাত স্নেহের, দেবতোষ ব্যাখ্যা করতে পারেন না। কিন্তু আজীবন নিজের ভাবনায়, মননে প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের আপাত কাঠিন্য মিশিয়ে চললেও টের পান, তাঁর পিতৃহৃদয়ে স্নেহ এমনই এক দুর্বলতা যার কোনও বিকল্প অনুভব উপলব্ধি বা ব্যাখ্যা নেই। অথবা এমনও হতে পারে, স্নেহ-ই হয়তো সেই মানসিকতা যার সঙ্গে অবাধে মিশে থাকে প্রীতি-ভালবাসা-উদ্বেগ-আশঙ্কা-ভয়-সংশয়, হয়তো ব্যাখ্যাহীন কিছুটা পাগলামিও।

দেবতোষ বেশ বুঝতে পারেন, যত বারই তাঁর একমাত্র সন্তান দেবমাল্য উদয় হচ্ছে তাঁর ভাবনায়, মুহূর্তের মধ্যে আকাশটি ছেয়ে যাচ্ছে এক নিবিড় বেদনার আর্তিতে, বুকটা ভার হয়ে থাকছে কষ্টের অনুভবে। আবার ছেলেকে বাদ দিয়ে, নিজের ব্যক্তিত্ব খাটিয়ে যে একপেশে সিদ্ধান্ত নেবেন এবং নিয়ে এই পরিস্থিতির সমাপ্তি ঘটাবেন, তাও যে সম্ভব না। গোটা পরিস্থিতির কেন্দ্রেই যে দেবমাল্য বসে আছে। আসল যা কিছু টানাপোড়েন, ফলাফল এবং তার প্রতিক্রিয়া, সবই তো বর্তাবে

ওর ওপর। আর বর্তানোর অর্থই এর পর গোটা জীবন ছেলেটাকে বয়ে বেড়াতে হবে সেই ফলাফল জনিত প্রভাব। কেমন হবে সেই প্রভাব, কতখানি ও সামলে চলতে পারবে, অনিবার্য তাও তো ভাবাচ্ছে দেবতোষকে। বাবা-মা হিসেবে তিনি আর নির্মলা যে জড়িয়ে পড়বেন, পড়েছেন, সে তো অনেকটাই নিয়তি। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে সমস্ত ব্যাপারটা তাঁদের নিয়ে, তাঁরাই হোতা, তাঁরাই পাত্রপাত্রী। তাঁদের একমাত্র পরিচয় এক্ষেত্রে তাঁরা নিকটতম মানুষ। আর ছেলে অথবা মেয়ে, যে-ই হোক, বাবা-মা ছাড়া শেষ পর্যন্ত কে-ই বা ঘনিষ্ঠতম! ষোলো-সতেরো বছর এ দেশে জীবনযাপন করলেও, সত্যিই তো, তাঁরা কি পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই উদাসীন কিংবা নিষ্ক্রিয় হতে পেরেছেন, যতটা এই দেশের বাবা-মা, ছেলেমেয়েদের বিষয়ে হতে পারেন।

নাকি, কথাটা উলটো করে বলা যেতে পারে, ছেলেমেয়েরাই একটু বড় হয়ে উঠতে উঠতে, জ্ঞানবুদ্ধি হতে হতেই চায়—বাবা-মায়েরা তাদের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় না হয়ে গেলেও, অন্তত নৈর্ব্যক্তিক হয়ে যাক। আর ক্রমাগত তেমনই একটি সামাজিক-পারিবারিক আবহে থাকতে থাকতে তাঁরাও অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন, তথাকথিত অ্যাডাল্ট ছেলেমেয়ের বিষয়ে মাথা না ঘামাতে।

কিন্তু যেটাই হোক, দেবতোষ এটাই জানেন এবং বিশ্বাসও করেন, এত বছর এই রানির দেশে জীবনযাপন করলেও, এখনও তাঁরা কিছুতেই ঠিক ততটা নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠতে পারেননি, যতটা হলে তাঁরা নিজেদের পাশ্চাত্য অভিভাবক বলে মনে করতে পারতেন।

তা ছাড়া কেনই বা!

এদেশে বসবাস, জীবনযাপন করলেও রুচি-সংস্কৃতি-ভাবনায় তাঁদের এমন কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলে তো মনে হয় না। সত্যিই কি তেমন কারও হয়? নাকি সেটা হওয়া উচিত!

অবশ্য চটজলদি তথাকথিত 'সাহেব' বনে যাওয়ার দৃষ্টান্তও যে দেবতোষ জানেন না বা দেখেননি তা নয়। প্রাণকৃষ্ণ থেকে 'প্যান' এবং

গোবর্ধন থেকে 'গর্ডন' হয়ে যাওয়া তিনি তো চোখের সামনেই দেখেছেন। কিন্তু সে তো আলাদা প্রসঙ্গ।

আবার এটাও ঠিক, আটাশ বছর বয়েস হলেও, এগারো-বারো বছর বয়স থেকে এই এসেক্স-এ থাকলেও, দেবমাল্য এখনও তেমন একালষেঁড়ে, ঝাড়া হাত-পা ইয়াংম্যান তো হয়ে যায়নি! অবশ্যই সে স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল। কিন্তু সনাতন এবং এখনও অনেকাংশে টিকে থাকা দেশীয় মূল্যবোধ যে ছেলেটার মধ্যে আছে, দেবতোষ দিব্যি টের পান সেটা। ছেলেটা স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক নয়। বরং উদার, হয়তো একটু ভাবালুতা নিয়ে চলে। নিজের জীবনযাপনের পদ্ধতি প্রক্রিয়া যে বাবা-মায়ের মনেও ছায়াপাত করে, দেবমাল্য তা শুধু বোঝে তাই নয়, সেটাকে গুরুত্বও দেয়।

বোধহয় সেই কারণে ছেলেও এত দিন কোনও একটা স্থির সিদ্ধান্ত নেয়নি, কিংবা নিতে দ্বিধা করেছে।

দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন দেবতোষও। এখনও সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠেননি। কিন্তু কিছু একটা যে করার দরকার, সেটুকু পরিষ্কার হবার পরে, আর কিছু না হোক এখন অন্তত নিজে থেকে মুখ খোলেন মাঝেমধ্যে।

মাসচারেক আগে, প্রথম যখন সন্দেহ হয়েছিল দেবতোষের, নির্মলারও, তখন কিছু জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে শুধু দ্বিধা নয়, কেমন একটা অস্বস্তি বা আত্মসচেতনতা যেন বাধা দিচ্ছিল কেবলই। মনে হচ্ছিল, ছেলের জীবনের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর মুখ খোলা কি সাজে! একটা ভুল বোঝাবুঝির সূচনা করার জন্য দায়ি হয়ে থাকবেন না তো!

কথাটা আগে মাথায় এসেছিল নির্মলার।

দিব্যি গরমকাল তখন। এ দেশের সামার। পর-পর দু বছর ঠিকমতো সামার হয়নি। এ বছর মে মাসের মাঝামাঝি থেকেই প্রকৃতি যেন খানিকটা পুষিয়ে দিচ্ছিল। দিন বাড়তে বাড়তে নটা, সাড়ে নটার আগে সন্ধে নামছিল না। তার পরেও আকাশ নীলচে কালো হয়ে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। ঝিরঝিরিয়ে হাওয়া বইতে শুরু করে রোদ পড়ে এলে। দেশের ফাল্গুন-চৈত্রের সঙ্গে কেমন একটা মিল পান দেবতোষ। পেতে

পেতে একটু উদাসও হন। তা সত্ত্বেও অফিস টাইমের মতো অভ্যস্ত নিয়মেই বাগানে নামেন।

শহর থেকে কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরে, দেবতোষের এই ব্যাসিলডন-এর বাড়িতে বাগানটা নেহাত ছোট না। লন্ডনের মধ্যে হলে এসব বাড়ি-বাগানের যা আকাশছোঁয়া দাম হত, অবশ্যই দেবতোষের তা নাগালের বাইরে। এটাও কিনেছিলেন একটু ঝুঁকি নিয়েই, আর বিশেষ করে বাগানটা বড় পছন্দ হয়েছিল বলে। বার্চ-ওক ছাড়াও একটা মেপল গাছ তো ছিলই, এ ছাড়া কোণের দিকে ছিল একটা ম্যাগনোলিয়া আর চেরিব্লসমের গাছ। আপেল গাছ দুটোও কম বড় না। কেটে ছেঁটে কিছুটা ফাঁকা করে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, গরমকালে যখন কিছু সবজি লাগাবেন, তখন যাতে আলো-হাওয়া আসে।

পড়ন্ত বিকেলের আলোয় সেই সব সবজি গাছেরই তদারক করছিলেন দেবতোষ। একই সঙ্গে শরীরচর্চাও।

নিত্যদিনের মতো কিছু পানীয় নিয়ে নির্মলা এসে বসেছিলেন। সাহেব-বাড়ির মতো এখনও তাঁদের আর্লি ডিনার-এর অভ্যাস হয়নি। রাতের খাওয়া নিয়ে বসতে বসতে সেই দশটা। সাতটা সাড়ে সাতটার সময় এক গ্লাস ফলের রস বা একটা বিয়র কিংবা লাগার-এর ক্যান দেবতোষও বাগানের কাজের মধ্যে বেশ উপভোগ করেন। কদিনই বা আর এদেশে বাইরে বসা যায়!

ছাঁটা ঘাসের সবুজ তোয়ালের ওপর গোটা কয়েক প্লাস্টিকের চেয়ার আর একটা লোহার গোলটেবিল রাখাই থাকে। নির্মলাকে আসতে দেখে, হাতের গ্লাভস, মাথার টুপি খুলে দেবতোষ এগিয়ে গেলেন। চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, এ বছর যদি আর তেমন ঠান্ডা না পড়ে, মনে হচ্ছে পালং-ধনেপাতা আর টমেটো খুব ভাল হবে।

স্বামীর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নির্মলা বললেন, হবে, কিন্তু খাবে কে অত?

অত? অত কোথায় গো? হালকা লাগার-এর ক্যান খুললেন দেবতোষ। চুমুকে গলা ভিজিয়ে বললেন, এই তো বছরে কটা দিন...তা

নয়তো মাটিটা এত ভাল এখানে, সত্যি সত্যি সবজি আর কিনে খেতে হত না।

হ্যাঁ, সারা বছর গ্যারাজের ডিপফ্রিজারে জমিয়ে রাখতে।

আইডিয়াটা কিন্তু খারাপ না। দেবতোষ বললেন।

এদেশে অর্ধেক কেনা খাবারই তো ফ্রোজেন। ডিপফ্রিজে জমিয়ে রেখে দিলে ক্ষতি কী? নির্মলার যেন ততটা উৎসাহ নেই, কথা চালানোর মতো বললেন, তা হলে আর লাভটাই বা কী হল! সেই ফ্রোজেন খাবারই তো খাওয়া। পা-টান করে বসে দেবতোষ বললেন. লাভটা হচ্ছে বাড়ির গাছের শাকসবজি খাওয়া হবে..একেবারে ন্যাচারালি গ্রোন, অরগ্যানিক ফুড সব। জেনেটিক্যালি মডিফায়েড তো নয়!

একটা শ্বাস ফেলে নির্মলা বললেন, খাওয়ার আর লোকই বা কোথায়!

রাখতে না পারলে একে-ওকে দেব। ক্যানে চুমুক দিলেন দেবতোষ। নিজের জমিতে ফলানো শাকসবজি, ভেজিটেবল কাউকে হাতে করে তুলে দিতে যে কী ভাল লাগে...মনে নেই গতবারের আগের বার কলকাতা যাওয়ার সময় গোছ করে ধনেপাতা তুলে নিয়ে গেলাম...কী হইচই বাড়িতে...পাপিয়ারা দুর্গাপুর থেকে ছুটে এল দেখতে...।

দেবতোষের দিকে না তাকিয়ে কিছুটা উদাস গলায় নির্মলা বললেন, সেই...দেশেই লোকে এসব অ্যাপ্রিসিয়েট করে বেশি... এখানে তো...।

ওঁর কথার মধ্যে দেবতোষ বললেন, টিপলুও খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করে, ইচ্ছেমতো ওদের ফ্ল্যাটেও নিয়ে যাবে, রেঁধে তো খেতে হয়, বাজারও করতে হয়। তার বদলে এ বাড়ি থেকে নিয়ে যাবে। কুন্তলা অবশ্য রান্নাবান্না কতটা পারে...তবে এত দিনে কি আর...।

ছেলেকে টিপলু বলে ডাকেন নির্মলা-দেবতোষ। পুত্রবধূ কুন্তলা। এখনও দু বছর হয়নি ওদের বিয়ে হয়েছে। এই ডিসেম্বরে দু বছর পূর্ণ হবে। পাঁচ সাত মাইলের মধ্যে ফ্ল্যাট কিনেছে দেবমাল্য। চাকরি শুরু করার বছর খানেকের মধ্যে ফ্ল্যাট কেনার কথাটা দেবতোষ মনে করিয়ে দিলেও, দেবমাল্যর মাথায় যে ব্যাপারটা ছিল না তা নয়। তা ছাড়া নিজের জীবনযাপন শুরু করার প্রস্তুতিও নিশ্চয়ই ছিল। ছেলের সঙ্গে

কথা বলতে গিয়ে দেবতোষ টের পেয়েছিলেন, তাঁর ভাবনার আগেই টিপলু আগামী বেশ কয়েক বছরের জীবনযাপনের মানসিক প্রস্তুতি সেরে রেখেছে। ব্যাসিলডন-এ নিজেদের বাড়ি থাকলেও বিয়ের পরে ও যে অন্য বাড়িতে থাকবে, সে ভাবনা আগেই ভেবে রেখেছিল দেবমাল্য। খুশিই হয়েছিলেন দেবতোষ। তাঁর স্পষ্ট করে না বলা ভাবনার সঙ্গে ছেলের মানসিকতা মিলে গিয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন টিপলু কাছেপিঠে থাক, কিন্তু বিয়ের পরে যেন অন্য বাড়িতে বউ নিয়ে থাকে, তা সে যবে আর যখনই বিয়ে করুক না কেন।

এসেক্স-এর মধ্যেই বিলারিকে ফ্ল্যাট কিনেছিল দেবমাল্য। তাও চার বছরের কাছাকাছি হতে চলল। নিয়মিত থাকত না নিজের বাড়িতে তখন। তাহলেও উভয় তরফে একটা প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। তাড়াহুড়ো ছিল না, হঠাৎ শূন্যতা অনুভূত হওয়ারও ব্যাপার ছিল না। অথচ এ দেশীয় নিয়মে যা মোটামুটি সিস্টেম, সকলেরই সয়ে যাচ্ছিল সেটা ধীরেসুস্থে। কখনও উইকএন্ড-এ, কখনও উইক-ডেতেও দেবমাল্য তখন গিয়ে থাকত বিলারিকের ফ্ল্যাটে। বিয়ের পরে যাতায়াত থাকলেও মোটামুটি নিয়মিত ও বাড়িতেই বসবাস। যোগাযোগ সম্পর্ক স্বাধীনতা সব কিছুর মধ্যে আপনাআপনি একটা ভারসাম্য এসে গেছে।

দেবতোষের অনিশ্চিত ভাবনাটা পূরণ করে দিলেন নির্মলা। বললেন, রান্নাবান্না টিপলুকেই দেখতে হয়।

নির্মলার দিকে তাকালেন দেবতোষ। এখনও?

তাই তো মনে হয়। বলতে চায় না বেশি, আভাসে ইঙ্গিতে যতটা মনে হয়—।

কথাটা তেমন পাত্তা দিলেন না দেবতোষ। বললেন, তার মানে টিপু বলে না, তুমিই ধরে নিয়েছ অনেকটা।

অনেকটা না হলেও, নির্মলা বললেন, মা হয়ে ছেলের কথা কিছুটা তো বুঝি বটেই।

তা বোঝ হয়তো, কিন্তু তার মধ্যে তোমার মেটারন্যাল সেন্টিমেন্টও অনেকখানি মিশে থাকে।

সেটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি সেন্টিমেন্টের ওপর নির্ভর করেই ওকে বোঝার চেষ্টা করি। কথাবার্তার মধ্যে তেমন হিন্ট না থাকলে আমি গেস করব কী করে!

একটু হেসে দেবতোষ বললেন, তা হিন্টটা ছেলেই দেয়, নাকি মা একটু খুঁড়ে বার করে?

আমি তেমন মা বলেই তোমার ধারণা নাকি?

কথার সুরটা খেয়াল করলেন দেবতোষ। একটু মোলায়েম হওয়ার দরকার। বললেন, না-না তা নয়।

তাই তো বললে! নির্মলার কণ্ঠস্বরে চাপা অথচ স্পষ্ট বিরক্তি।

নিজেকে আর একটু শুধরে নেওয়ার মতো দেবতোষ বললেন, হয়তো আমার কথাটা শুনিয়েছে ওইরকম, কিন্তু যেটা মিন করতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে, 'মায়ের মন' বলে তো একটা কথা আছে— আর ছেলের একটু আধটু অসুবিধের কথা শুনলে মায়েরা একটু বেশি উৎকণ্ঠায় ভোগেন, যতটা ছেলে না বলে, মা ধরে নেন তার থেকে বেশি।

নির্মলা বললেন, টিপলু যে চাপা স্বভাবের ছেলে সে তো তুমিও জানো। বিশেষ করে, অসুবিধের কথা হলে তো আমাদের কাছে আরও বলবে না।

তাহলে তুমি জানলে কী করে?

সেই কথাটাই তো প্রথমে বললাম। নির্মলা বললেন, ওর মতো ছেলে যখন আকারে-ইঙ্গিতেও কিছু বলে, তার মানে অসুবিধে নিশ্চয়ই কিছু আছে। তুমি তো ধর্তব্যের মধ্যেই নিলে না আমার কথাটা।

আরে বাবা, তা নয়, তা নয়। তোমার কথা কি আমি—

দেবতোষকে শেষ করতে না দিয়েই নির্মলা বললেন, কোনও ইম্পর্টেন্সই দিলে না। বললে, মেটারন্যাল সেন্টিমেন্ট। একটু হেসে আবার বললেন, সেন্টিমেন্ট বাদ দিয়ে মায়েদের একটা ইনসটিংক্ট-ও কাজ করে।

আচ্ছা বেশ, সেটা অস্বীকার করছি না। লাগারের ক্যান গলায় উপুড় করলেন দেবতোষ। কয়েক ঢোকে শেষ করে বললেন, তা মোদ্দা কথাটা

কী বলছে টিপু? কুন্তলা এখনও রান্নাবান্না কিছুই পারে না?

সে ভাবে কি তোমার ছেলে আর কিছু বলবে! নাকি কোনও দিনই স্পষ্টাস্পষ্টি তেমন কিছু বলেছে!

দেবতোষ বুঝে যান নির্মলার কণ্ঠস্বরে স্বাভাবিকতার ছোঁয়া।

আটটা বেজে গিয়েছিল, অথচ দিব্যি রোদ তখনও। তাপ নেই কিন্তু ঝলমলে। উঁচু গাছগুলোর পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যরশ্মি লনের ওপর পড়ে লুটোপুটি করছিল। হাওয়ার জন্যই আলোছায়া যাতায়াত করছিল দেবতোষ-নির্মলার গায়ের ওপর দিয়েও। ব্যাসিলডন-এর দিকটা গ্রাম নয়, অথচ সব পাড়াগুলোতেই বেশ নিঝুম গ্রাম্য ভাব। অজস্র গাছপালা চারদিকে। রোদ থাকা সত্ত্বেও নিবিড়, শান্ত, না-গরম না-ঠান্ডা আবহাওয়া। পাখিদের, বিশেষ করে ম্যাগপাইগুলোর ওড়াউড়ি, ডানা ঝাপটানো ছাড়া কোনও শব্দাশব্দিও নেই। মাঝেমধ্যে শুধু স্ট্যানস্টেড বিমানবন্দরে নামতে যাওয়া দু-একটা এরোপ্লেনের গর্জন, তাও মৃদু কানে আসে।

লাগার-এর ক্যান বাগানের বিন-এ ফেলে, আবার চেয়ারে বসতে বসতে দেবতোষ বললেন, তা তুমি কীরকম আভাস-ইঙ্গিত পেলে, সেটাই বল একটু শুনি।

একটু যেন আনমনা হয়েছিলেন নির্মলা। বললেন, ওই আর কী— বেশি তো আসে না আজকাল, এলেও বেশিক্ষণ বসে না। কদিন আগে বলছিলাম, বোস না আর একটু, বাবার সঙ্গে দেখা করে যা। তাড়া কীসের? বলল, নাহ যাই—আজ একটু রান্না করতে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে, মামণি তো বাড়িতে আছে— ব্যবস্থাট্যাবস্থা করবে—। দেখি, টিপু যেন কেমন একটা মুখ করে তাকিয়ে আছে, হাসি অথচ যেন হাসছে না। তারপর বলল, ও যে কী ব্যবস্থা করবে—! বলতে বলতে চুপ করে গেল।

চুপ করে গেলেন নির্মলাও।

সেটা লক্ষ করেই মাথা নেড়ে দেবতোষ বললেন, দ্যাখো—তোমার বউমা কলকাতার মেয়ে, কলকাতায় মানুষ, বাড়ির অবস্থাও তো সচ্ছল

বলেই মনে হয়েছিল— নেহাত দরকার না পড়লে অমন ফ্যামিলির মেয়ে আর হাত পুড়িয়ে রান্না করতে যাবে কেন! এসেছে এদেশে এখন— ধীরেসুস্থে ঠিক পিক-আপ করে নেবে।

কী জানি! নির্মলা বললেন, দু বছর হতে চলল— এখনও যদি ধীরেসুস্থে শেখে— টিপুব তো কাজের চাপ-ও আছে।

দেবতোষ বললেন, তুমি ভাবছ— কিন্তু দেখবে টিপুই হয়তো ওকে রান্নাবান্না করতে দেয় না। নিজেই এনজয় করে— অফিসের স্ট্রেস কমাতে রান্নাটা একটা থেরাপির মতোও কাজ করে। মনে নেই আমরাই যখন প্রথম এলাম—ওহ্ বাবা—

সেটা হলে তো ভালই। নির্মলা বললেন, কিন্তু টিপু যেন ঠিক করে বলল না।

অ্যায়, ওইটাই আমি বলছিলাম— মানে, তোমার একটু উৎকণ্ঠা হচ্ছে। যতই বল না কেন—।

উৎকণ্ঠার আর একটু কারণ আছে। নির্মলা বললেন, টিপলু একটু চুপচাপ হয়ে রয়েছে, তুমি খেয়াল কর না? কথাবার্তায় কেমন একটা আড়ো-আড়ো-ছাড় ছাড় ভাব— আমাদের সঙ্গে দেখা করতে না এলে নয়, সেইজন্যই যেন আসে— জামাকাপড়ে ওর সেই পরিপাটি ভাব নেই—।

কথাগুলো শুনতে শুনতেই সোজা হয়ে চেয়ারে বসেছিলেন দেবতোষ। নির্মলা চুপ করে যেতেই বললেন, শোনো, আমার মনে হচ্ছে তুমি একটা কিছু বলতে চাইছ। একটু স্পষ্ট করে বল তো তোমার ঠিক কী মনে হচ্ছে, আর... কেন? ফ্র্যাঙ্কলি বল না।

উদ্বেগের ভাবটা কাটাতে পারলেন না নির্মলা। স্বামীর কথায় সামান্য একটু সমর্থনের আভাস পেয়েই বলে ফেললেন, আমার যেন কেমন একটা খটকা লাগছে। বড্ড টেনশন হচ্ছে।

না-না-না অত সিরিয়াস হয়ো না তো! দেবতোষ একটু হালকা সুরে বললেন, ছেলের বউ তাদের সংসারে রাঁধে কি রাঁধে না, এটা কখনওই শাশুড়ির ভাবনার বিষয় হতে পারে না। টেনশনের তো নয়ই। ওটা ওরাই

বুঝুক না। অন্য আর কিছু কি তোমার...?

শুধু রান্না করা, না-করা নিয়ে তো আমি টেনশন করছি না। সব মিলিয়ে যেন কেমন একটা... নতুন বিয়ে, এই বয়েস, এ সময় তো আরও বেশি... বেশ একটা হাসিখুশি, ডগমগ ভাবই থাকার কথা—।

নেই বলেই বা তুমি ধরে নিচ্ছ কেন?

ধরে নিচ্ছি! নির্মলার উচ্চারণের মধ্যে যেন একটু সন্দেহও মিশে গেল। প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করলেন।

আমাদের সঙ্গে টিপু-কুন্তলার কদিন, কতটুকু দেখা হয় বল তো? দেবতোষ বললেন, আর যখন দেখা হয়, টিপলু আসে অফিস ফেরত, ওকে তো এগজস্টেড দেখাবেই। লন্ডনের জ্যাম কাটিয়ে, আরও চব্বিশ-পঁচিশ মাইল ড্রাইভ করে তারপর ঢোকে...।

কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথম প্রথম যেরকম ঢুকেই এ ঘর ও ঘর করা, ফ্রিজ খুলে কিছু খাওয়া, এর তার খোঁজখবর নেওয়া— দেখি ওসব কিচ্ছু নেই। ঝুম হয়ে রান্নাঘরেই হয়তো বসে রইল। তিনটে কথা জিজ্ঞেস করলে একটার উত্তর দেয়, তাও যেন দায়সারা ভাবে। আর মামণির কথা তো... জিজ্ঞেস করলে যেন এড়িয়েই যায়।

দেবতোষ টের পাচ্ছিলেন, বেশ কিছুক্ষণ ধরে স্ত্রীর কথায় তেমন গুরুত্ব না দেওয়ার চেষ্টা করতে করতেও যেন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য সঞ্চারিত হচ্ছে তাঁর মধ্যে। বললেন, তোমার কী মনে হচ্ছে বলো তো? ওদের মধ্যে মিল হচ্ছে না?

নিজের কাছেই যেন নিজেকে গোপন করতে চাইলেন নির্মলা। স্বগতোক্তির মতন উচ্চারণ করলেন, মিল না হওয়ার মতো কী হতে পারে!

ওটা আমার কথার উত্তর হল না। একটু অসহিষ্ণু হয়েই বলে ফেললেন দেবতোষ।

নির্মলা তখনও নিজের মনেই নিচু স্বরে বলে চলেছেন, আমরা তো কোনও জোরজারি করিনি... খোঁজখবর পাওয়ার পরে কথাবার্তা চলছিল, তারপর তো ও নিজেই উৎসাহ করে কলকাতা গেল, মামণির

সঙ্গে আলাপ করে কথাবার্তা বলে এল... বায়োকেমিস্ট্রির এম এসসি শুনে, খুশি হয়ে বিয়ের আগেই ওর জন্য পিএইচ ডি করার খবরাখবর নিচ্ছিল, তারপর তো...।

দেবতোষ একবার ভাবলেন চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন। দিনের আলো কমে আসছে। এখনও কয়েকটা গোলাপগাছের গোড়ায় আজ বোনমিল ডাস্ট ছড়াতে হবে, গ্রিন হাউস-এর মধ্যে রানার-বিনস আর পুঁইশাক গাছগুলোয় ঝাঁঝরি দিয়ে জল দিতে হবে...। নির্মলার মনের অশান্তি তিনি টের পাচ্ছেন বটে, কিন্তু কতটা যে তার নেহাতই দুশ্চিন্তা, আর কতটা...।

নাহ, উঠতে গিয়েও ওঠা হল না। তাঁর ভাবনাতেও অশান্তির উড়ো ধোঁয়া ভেসে বেড়াচ্ছে।

ভাবালুতা নিয়ে আকাশকুসুম চিন্তার জাল বোনেন না নির্মলা। বাস্তবের মাটিতে পা দিয়েই তো চলেন। বারো বছর চন্দননগরে উইমেনস কলেজের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, ভূগোল পড়াতেন। লেকচারার থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট অধ্যাপিকা হয়েছিলেন। এদেশে চলে না এলে বিভাগীয় প্রধানও হতেন। এখানে এসেও লিন্ডসি কলেজে এ লেভেল ছাত্রছাত্রী পড়িয়েছেন এগারো-বারো বছর। ডায়াবিটিস ধরা না পড়লে আরও বেশ কয়েক বছরই কাজ চালিয়ে যেতে পারতেন। এখনও একেবারে কিছু করেন না তা নয়। ব্যাসিলডন কাউন্সিলের একটা পার্টটাইম চাকরি করেন, সপ্তাহে সতেরো ঘণ্টা। আর কিছু না, নিজেকে কিছুটা জড়িয়ে রাখার জন্য। সাতান্ন বছর বয়সে শরীরে অবশ্যম্ভাবী কিছুটা ভাঙন এলেও, ঘরে বাইরে কাজকর্ম নিয়ে, অন্তত এই বয়েসের দেশীয় মহিলাদের তুলনায় কর্মঠ-ই আছেন বলা উচিত, এমনকী ডায়াবিটিস থাকা সত্ত্বেও।

আবার মনের দিক থেকে প্রাচীনপন্থী না হয়েও, বহিরঙ্গে এখনও বেশ আটপৌরে ভাবটাই ধরে রেখেছেন নির্মলা। বাড়িতে শাড়ি পরেন। মাঝারি উচ্চতা, গায়ের মাজা রঙে সেটাই দিব্যি মানিয়ে যায়। শুধু সপ্তায় তিনদিন কাজে যাওয়ার সময় ট্রাউজার্স পরেন, তা-ও গাড়ি চালানোর

সুবিধার জন্য। ঘর-গেরস্থালির সব কাজই নিজে করেন। অবশ্য দেবতোষ হাত লাগান সবেতেই। নয়তো চলবেই বা কী করে!

দেবতোষ একটু ইতস্তত করে বলেন, একটা কথা বলো তো? টিপু কি এরমধ্যে নিজে মুখে ওদের সম্বন্ধে কিছু বলেছে? মানে... ডাইরেক্টলি না বলে, কিছু কি উত্থাপন করেছে ওদের জীবনযাপন... ঘর সংসার নিয়ে?

নিজে থেকে মুখফুটে কিছু বলেনি। নির্মলা বললেন। তবে কিছু বলার জন্য বোধহয় ওর একটা প্রিপারেশন চলছে।

দেবতোষ হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, ওদের বাচ্চা-টাচ্চা হবে না তো? সেইজন্যই কি না...?

তাহলে ও বলত। আমি জিগ্যেস করেছিলাম।...আর সেটা হলে তো আরও সুখী দেখাবারই কথা।

ওহ তাহলে তো...। সামান্য উৎসাহিত ভাবটা মিইয়ে গেল দেবতোষের। একটু পরে বললেন, তুমি কি চাও আমি একবার টিপুর সঙ্গে কথা বলি? ...আসলে একটু ডেলিকেট ইস্যু তো...!

আমার মনে হয়... একটু থেমে, নির্মলা আবার বললেন, ছেলের সঙ্গে লুকোছাপার তো কিছু নেই, কথা বলতেই পার। আমার থেকে তোমার ওপর টিপুর কিছুটা ইমোশনাল ডিপেন্ডেন্স আছে। তা ছাড়া বাপ-ছেলের মধ্যে একটা অন্য রকম...

মুখের কথা টেনে নিয়ে দেবতোষ হালকাভাবে বললেন, আমার তো ধারণা মা-ছেলের মধ্যেই ঘনিষ্ঠতা বেশি।

আছে, তবে তার নেচারটা অন্য রকম। ছেলে তো... তোমার কথার ইম্পর্টেন্স অন্য রকম।

শ্বাস পড়ে গেল একটা দেবতোষের। বললেন, বুঝেছি, অন্য রকম একটা দায়িত্বই পড়ে গেল আবার।

দেবতোষের মনে আছে, নির্মলার এর পরের কথাটাই তাঁকে এক ধাপ বেশি সতর্কতার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। কী যেন একটা আর্তি ছিল নির্মলার কণ্ঠস্বরে। বলেছিলেন, দেরি কোরো না, পরের দিন টিপু এলেই তুমি কথা বোলো তো! আমার ভাল্লাগছে না।

হ্যাঁ, কথা বলেছিলেন দেবতোষ ছেলের সঙ্গে।

একেবারে সোজাসুজি পরের দিনই বলেননি। ভাবনা আর মানসিক প্রস্তুতির দরকার ছিল নিজের। নির্মলার কথা, তার মূল্যায়ন, মা হিসেবে ওঁর ভূমিকা বাচনভঙ্গি এই সবই কয়েকটা দিন দেবতোষের চিন্তার জগৎকে অধিকার করে রেখেছিল। আর ক্রমাগতই তিনি ভাবনার পরিধিটা বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন কয়েকদিন ধরে। একইসঙ্গে খেয়াল করে যাচ্ছিলেন টিপলুকে, ওর শরীরের ভাষা পড়ার চেষ্টা করেছিলেন, নিজের মানসিকতা এবং প্রস্তুতি, উদ্দেশ্য সবকিছু গোপন রেখেই। অন্য কারও সম্বন্ধে, এমনকী সে যদি নিজের ছেলেও হয়, কথা বলা বা আলোচনা করতে গেলে, আগে যে নিজেকে খানিকটা তৈরি করে নেওয়ার দরকার, এই বোধটা দেবতোষের পরিণত হয়েছে ইংল্যান্ডে বেশ কয়েক বছর জীবনযাপনের পরে। সাহেবরা মন্তব্য করার বা অংশগ্রহণের পূর্বে নিজেদের প্রস্তুত করে অনেক বেশি। এই শিক্ষা তাদের বরাবর।

নির্মলার ভাবনা, অনুভবকে অস্বীকার করার প্রশ্ন ছিল না দেবতোষের। ছেলের ব্যাপারে তিনি যে উদাসীন, তা নয়। অন্য কারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করার অর্থ যে তার অথবা তাদের সম্পর্কে নির্লিপ্ত হয়ে যাওয়া, দেবতোষ তাও মনে করেন না। কিন্তু মাসচারেক আগে স্ত্রী-র কাছ থেকে ছেলের সাম্প্রতিক জীবন ও পরিস্থিতির আভাস-আন্দাজ পেয়ে, খুব সূক্ষ্ম একটু অপরাধবোধ অনুভূত হয়েছিল তাঁর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায়। টিপলুকে ভাল করে লক্ষ করা এবং নিজেকে একটু অতিরিক্ত গভীর ভাবেই প্রস্তুত করার কথা ভেবেছিলেন। আর কয়েকটা দিন ধরে সেই অনুশীলন চালাতে চালাতেই টের পেয়েছিলেন, টিপলু-কুন্তলার যৌথ জীবনযাপনের ব্যাপারে, ওদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করেও হয়তো আর একটু নজর দেওয়া কিংবা আর একটু সতর্ক হলেও পারতেন।

দু-তিন দিন দেবমাল্যকে একটু কাছ থেকে লক্ষ করে দেবতোষ বুঝেছিলেন, ছেলেটা দগ্ধ হচ্ছে।

কিন্তু তাঁর পরিণত ভাবনায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এসেছিল, তাহলে কুন্তলার অবস্থাটাই বা কী! টিপলুকে দেখা, লক্ষ করা, মনের ওঠাপড়া নিয়ে ভাববার জন্য তবু তো পাঁচ-সাত মাইল দূরত্বের মধ্যে তাঁরা আছেন। মেয়েটার কে আছে! হ্যাঁ, ওর দাদা আছে এদেশে। হিথরো বিমানবন্দরের দিকে ইকেনহামে থাকে, মাইল চল্লিশ দূরে। হয়তো এ দেশের তুলনায় দূরত্বটা কিছু না। কিন্তু বিবাহিত বোনের সঙ্গে, প্রবাসে থাকা দাদার সম্পর্ক নিশ্চয়ই কাছেপিঠে থাকা মা-বাবার সঙ্গে তুলনীয় নয়।

অগ্রিম অবসর নেওয়া তেষট্টি বছরের অধ্যাপক দেবতোষ ভাবনা এবং মন যথাসম্ভব খোলা রেখেছিলেন ছেলের সঙ্গে কথা বলার আগে এবং বলার সময়েও। তাঁকে মাথায় রাখতে হয়েছিল অনেক কিছু। দেশ-কাল-দূরত্ব-পরিবার-সংস্কৃতি-সম্পর্ক।

আজ চার মাস পরে বাড়ির কনজারভেটরি থেকে শরতের উদাস গোধূলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেবতোষ ভাবলেন, সম্ভাব্য বিষয় হিসেবে যা কিছু বর্তমান পরিস্থিতিতে মনোযোগ দাবি করতে পারে কিংবা করা উচিত, তার কোনওটাই তিনি এখনও ত্যাগ করেননি। বরং একটু একটু করে বিশ্লেষণ করারও নিভৃত নীরব উদ্যোগ নিয়েছেন— আরও কোনও কিছুকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত কি না, তাই নিয়ে। নিজের অভিজ্ঞতা আর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছেন নিরন্তর। বিগত চার মাস ধরে ছেলের জীবনযাপন কেন্দ্র করে এ যেন এক ধারাবাহিক সমীক্ষা চালিয়ে যাওয়া, কিন্তু এমনকী নিজের কাছেও তিনি কি সত্যি সত্যি একটা সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন!

একটু আগেও তাঁর মাথায় স্নেহ শব্দটি আবার নতুন করে অনুরণন সৃষ্টি করেছিল। ভাবিয়েছিল তাঁকে।

হ্যাঁ একমাত্র পুত্রের জন্য স্নেহের ভূমিকা তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু তিনি কি স্নেহান্ধ!

তাহলে পুত্রবধূ কুন্তলার জন্যই বা তাঁর বুকের মধ্যে বেদনার অমন হিমশীতল তুষারপাত ঘটছে কেন? কুন্তলা কি সেটা বুঝতে পারে!

যদি পারত, তাহলে কি পরশুদিন অমন ভ্রূভঙ্গি করে, দুর্বিনীত উচ্চারণে বলতে পারত যে, আপনি আপনার ছেলের স্বার্থ আর ভবিষ্যৎ নিয়েই চিন্তা করুন না... আমার কথা ভাববার জন্য আমার বাপ-দাদা আছে... দেখা যাক না কী হয়... ভাববেন না ফ্যামিলির বাকি সবাই দেশে আছে বলে তারা সব হেলপলেস আর কুয়োর ব্যাঙ... আপনাদের মতো হঠাৎ বড়লোকদের কীভাবে...।

আর শুনতে পারেননি, কিংবা শোনেননি দেবতোষ। সরে গিয়েছিলেন কুন্তলার সামনে থেকে। টের পাচ্ছিলেন, অপমানিত হওয়া কিংবা আত্মসম্মানহানির ওপরেও কিছু একটা তীব্র বোধ, যা প্রায় দহনের মতো, অন্তরে বাইরে ঝলসে দিচ্ছে তাঁকে।

ভাল ঘুম হয়নি সেদিন রাতে। অথচ গতকাল সকাল থেকে আবার থিতিয়েছিলেন দেবতোষ। যুক্তি-আবেগ-মন্তব্য-প্রতিক্রিয়া... সব কিছুকেই একটা পারম্পর্যে, সময় এবং পরিস্থিতির পটভূমিকায় বিচার বিবেচনা করার দরকার।

কনজারভেটরি থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে মনে মনে দেবতোষ বললেন, সহ্য, আরও সহ্য। আরও একটু তলিয়ে ভাবতে হবে।

কিন্তু একই সঙ্গে মনে পড়ে প্রথম দিনের কথাবার্তার সময়েই টিপলুর একটি বিপন্ন মন্তব্য, মানসিক ভাবে ও অসুস্থ নয় বাবা। ওর সমস্যা হচ্ছে...। কথাটা শেষ হয়নি।

নীলাভ আঁধার নামতে থাকা শীতল সন্ধ্যায় কনজারভেটরি থেকে শেষবার বাগানের দরজা বন্ধ করার জন্য বাইরে এলেন দেবতোষ। উদাস নির্জন প্রকৃতি নির্জনতর হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বাতাসের সঙ্গে। রঙিন পাতারা কাঁপছে ঝরার প্রতীক্ষায়। দেবতোষের মনে হয় বিপন্নতার রেশ ছড়িয়ে যাচ্ছে তাঁরও ভাবনার মধ্যে। আবার নানান প্রশ্নও তৈরি হচ্ছে।

২

বিছানা ছেড়ে না উঠেও দেবমাল্য বুঝে যায় পাশের ঘরে কুন্তলা তৈরি হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ও বেরিয়ে যাবে। কোথায় যাবে সেটাও জানা। আজ শনিবার, সাপ্তাহিক ছুটির প্রথম দিন, সুতরাং কিশলয় বাড়িতে থাকবে। কুন্তলা যাবে ওর দাদার বাড়িতেই।

পাঁচতলার ফ্ল্যাটে শনিবার মাঝসকালে শুয়ে শুয়ে দেবমাল্য ভাবে, খুবই সাধারণ আর স্বাভাবিক হতে পারত কুন্তলার এই যাওয়াটা। ছুটির দিন, আবহাওয়া ভাল। বিদেশবিভুঁই-এ চল্লিশ-বিয়াল্লিশ মাইল দূরত্বে ভাইবোন থাকলে, দেখা করতে যাওয়ার এর থেকে বড় সুযোগ আর কবে হয়!

কিন্তু আপাত তুচ্ছ আর অতি সাধারণ এই যাওয়ার ঘটনাটাকে কুন্তলা আসলে একটি নাটকীয় প্রতিবাদের রূপ দিতে চাইছে, দেবমাল্য জানে। অথচ এখনও ও পুরোপুরি বোঝে না, কার বিরুদ্ধে, কেন এই প্রতিবাদ! নিজের স্ত্রীকে কোনও ব্যাপারেই জোর করে ঠেকিয়ে রাখা কিংবা বাধা দেওয়ার প্রশ্ন উঠবে কেন, দেবমাল্যর তো সেটাই মাথায় আসে না। বারণ করতে পারে, অনুরোধ করতে পারে, মতপার্থক্য হলে বড়জোর কারণ দর্শাতে পারে এবং জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অনিবার্য ভাবে তাইতেই ফয়সালা হয়ে যাওয়ার কথা। একটু মান-অভিমানের রেশ তার পরে থাকতেও পারে। কিন্তু তাই বলে বাধা দেওয়া কিংবা জোর খাটানো এবং অপর পক্ষ থেকে প্রতিবাদস্বরূপ গৃহত্যাগ... নাহ, দেবমাল্য নিজের বোধ-রুচি-শিক্ষায় ঠিক এমন একটা পরিণতির ছবি কখনও দেখেনি।

বিগত দু বছরের বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতায় এখন দেবমাল্য অবশ্য অসম্মতির ইঙ্গিত জানানো কিংবা অনুরোধের ভাষা পালটে ফেলেছে। আর কুন্তলাও যেন কবে থেকে এই জীবনযাপনের ক্ষেত্রে একটা নিজস্ব আচরণবিধি গড়ে নিয়েছে। এই পরিস্থিতি, তার পরিণতি শেষ পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হবে কি না দেবমাল্য জানে না। কুন্তলাও সত্যি কী ভাবছে ও জানে না।

দেবমাল্য অবশ্য এটুকু জানে, কুন্তলার আজকের এই প্রতিবাদ, বাবা অর্থাৎ দেবতোষের একটি না-অনুরোধ, না-নির্দেশ গোছের বক্তব্যকে নস্যাৎ করার জন্য। দেবতোষ চেয়েছিলেন আজ ছুটির দিন বিকেল থেকে টিপলু-কুন্তলা ব্যাসিলডন-এর বাড়িতে এসে থাক। বাবা-মা দুজনেরই মনের কথা টের পায় দেবমাল্য। তাঁরা চান, মনোমালিন্য মতপার্থক্য যাই হোক, ওঁদের উপস্থিতিতে একটা স্বাভাবিক পরিবেশে ছেলে-বউ কিছু সময় কাটাক। যুক্তি-তর্ক, ভাষায়-শব্দে যে মানসিক আদানপ্রদান থমকে থাকে, নেহাত পরিবেশ পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে তা একটা সচল সোজা মাত্রা পেতেও পারে। টেলিফোন করে নয়, গতকাল দেবতোষ বিলারিকে এসে আজ যাওয়ার কথা বলে গিয়েছিলেন।

দেবমাল্য তখনই ভেবেছিল, ও কি যাবে! ভাবনার পুরোটাই ওর অভিজ্ঞতা প্রসূত।

সকাল সাড়ে দশটা এখন। ছুটির দিন বলেই একটা চুপচাপ ভাব হয়ে রয়েছে। অন্য দিন হলেও অবশ্য এমন কিছু শব্দাশব্দি, ব্যস্ততা টের পাওয়া যায় না ওদের এই পাঁচতলা ফ্ল্যাট থেকে। শুধু লিফটের দরজা খোলা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ আসে মাঝেমধ্যে। বিলারিকে জায়গাটা এমনিতেও তেমন ব্যস্ত, জনবহুল নয়। এসেক্স-এর একটি প্রান্তিক মফস্‌সল শহর বলা যেতে পারে। বছর দশেক আগেও ছিল প্রায় গ্রাম। এদেশের অন্যান্য গ্রামের মতোই নির্জন-ফাঁকা-পরিচ্ছন্ন-সবুজ অথচ জীবনযাপনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় এবং স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণও ছিল। এখনও আছে। কিন্তু ঘরবাড়ি বেড়েছে মানুষের চাহিদা মেটাতে। এমনকী তিন-চারটে মালটিস্টোরিড বাড়িও হয়ে গেল মাত্র কয়েক বছরে। পুরো যুক্তরাজ্য এখন যেন বাসস্থানের সুরাহা করার জন্য আকাশের দিকে হাত বাড়িয়েছে।

উইকএন্ডটা যে নষ্ট হবে, শুরু থেকেই টের পাচ্ছে দেবমাল্য। ভাবল, সোজা উঠে গিয়ে পাশের ঘরে কুন্তলার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। অবাক দৃষ্টিতে বিরক্তি মিশিয়ে জিজ্ঞেস করবে, কী ব্যাপার, কোথায় চললে?

কুন্তলা উত্তর দেবে না। যেমন গোছগাছ, সাজগোজ করছিল করে যাবে।

গলা একপর্দা চড়াবে দেবমাল্য। —কী জিজ্ঞেস করলাম শুনলে? সকালেবেলা উঠে যাচ্ছ কোথায়?

এবারও উত্তর দেবে না কুন্তলা। কিন্তু ব্যস্ততা দেখাবে, নড়াচড়া করবে ঘরের মধ্যে।

কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য আনবে দেবমাল্য। —কুন্তলা আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি অ্যান্ড আই এক্সপেক্ট অ্যান আনসার। ছুটির দিন সকালবেলা কিছু না বলেকয়ে কোথায় যাচ্ছ তুমি?

চোখ তুলে এবার একবার তাকাবে কুন্তলা। ওর চোখ বড়, টানা নয়, একটু গোল ধরনের। কিন্তু ইচ্ছে করলে ওই চোখে ও খুব সুন্দর করে তাকাতে পারে, আনুগত্য প্রীতি মেশাতে পারে। কিন্তু এখন ও তা করবে না। বরং ভ্রূ-তে একটা ভাঁজ ফেলে ইচ্ছে করে দৃষ্টিটা খর করবে। তারপর বলবে, তোমার সব কথারই জবাব দিতে হবে কেন?

এবার কী উত্তর দেবে দেবমাল্য! হ্যাঁ, ও বলতে পারে, কেন দেবে না? তুমি আমার স্ত্রী, সকালবেলা ছুটির দিন তুমি একা একা...।

ওকে শেষ করতে না দিয়েই কুন্তলা মাঝপথে বলবে, সো হোয়াট? স্ত্রী বলেই আমি বেরুতে গেলে তোমার পার্মিশান নিতে হবে!

কী, কী বলতে পারে এবার দেবমাল্য? ও বলবে, পার্মিশান তো নয়। আমি জিজ্ঞেস করছি; সেটাই তো স্বাভাবিক।

কুন্তলা গোছানো সারতে সারতে... বোধহয় নির্লিপ্ত ভাবে এবার বলবে, তোমার কাছে যেটা স্বাভাবিক, আমার কাছে তা না-ও হতে পারে।

দেবমাল্য ভীষণ রেগে যাবে এবার। তেরিয়া হয়ে কুন্তলার সামনে টানটান দাঁড়িয়ে কি বলতে পারবে না, স্বাভাবিক বলে কিছু আছে কি তোমার? একটা ছুটির দিন ঘুম থেকে উঠে, কাউকে কিছু না বলে বাড়ির বউ একা একা বেরিয়ে যাচ্ছে— এটা কি তোমার স্বাভাবিক আচরণ?

একসঙ্গে এতগুলো কথা স্পষ্ট করে কি বলতে পারবে না দেবমাল্য, নিজের বিয়ে করা বউকে!

যদি পারেও, তাহলে কী উত্তর দেবে কুন্তলা?

না, আগে ও কুটিল চোখে এবার তাকাবে। তারপর বলবে, কী? তুমি আমাকে বাধা দিচ্ছ? সামনে থেকে সরে যাও বলে দিচ্ছি।

না, সরব না। দেবমাল্যকে এটুকু বলতেই হবে। আগে তুমি আমার কথার জবাব দাও, নয়তো যেতে পারবে না।

তাই নাকি? দেখবে তবে! দাঁড়াও... বলতে বলতে ঘুরে যাবে কুন্তলা। কাচের গ্লাস কিংবা যা পাবে হাতের সামনে তক্ষুনি সেটা তুলে নিতে যাবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে ক্ষিপ্রহাতে দেবমাল্য ওর কবজিটা চেপে ধরতে... পারবে? পারবে কি? পারবে না?

নরম বিছানায় কম্বলের মধ্যে শুয়ে থেকে দেবমাল্য টের পায়, ওর বুকের মধ্যে ধক-ধক করছে। গরম লাগছে রীতিমত। রগের দুপাশে যেন ঘাম-ঘাম ভাব। না-না, ছি, একটা সুন্দর দিনের সকাল কি এভাবে শুরু হতে পারে!

কিন্তু আর কীভাবেই বা তাহলে...! একটা সুন্দর মিষ্টি গন্ধ আসছে ওর নাকে... কুন্তলা তো বেরুচ্ছেই।

পাশ ফিরে শুতেই দেবমাল্য দেখল, কুন্তলা এ ঘরে আসছে। ওর প্রসাধন, পোশাক সবই বেরিয়ে যাওয়ার মতো। ও রেডি।

একটা কালো রঙের ট্রাউজার্স পরেছে কুন্তলা, ওপরে গোলাপি কার্ডিগান। মাত্র কয়েক মাস আগেও কি সুন্দর ঘন চুল ছিল ওর। বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ একদিন লেইনডন-এর স্যালভাডোর সেলুনে গিয়ে ছেঁটে ফেলল। একেবারে বয়কাট করেনি, কিন্তু ঘাড় পর্যন্ত করে ফেলেছে। অবশ্য খারাপ দেখাচ্ছে না। ওর সাড়ে পাঁচ চেহারার সঙ্গে মানানসই-ই হয়েছে। না হওয়ার কিছু নেই। মাজা গায়ের রঙের সঙ্গে ওর চেহারা, ফিগার খারাপ তো না! ঠোঁট দুটো একটু পুরু, তা ছাড়া নাক-চোখ-মুখ ভালই। গায়ের রংটাও, বোঝা যায়, এদেশে আসার পরে খোলতাই, চকচকে হয়েছে। অ্যান্টিক্রিজ ক্রিমট্রিম মাখে, দুধের

সর-শশা-লেবু... আরও কীসব মিশিয়ে মাঝে মাঝে ফেসিয়াল-টেসিয়ালও করে। করারই তো কথা। এখনই সময়, বয়েস।

গোল ব্রাশ-এর মতন চিরুনি চুলের মধ্যে ঘুরিয়ে টানতে টানতে শোওয়ার ঘরে এল কুন্তলা। সঙ্গে মিষ্টি গন্ধ আর এখনও দেবমাল্যের কাছে সকালের ইচ্ছে জাগানো শরীরের আবেদন নিয়ে, যদিও ও নিজে নিস্পৃহ দেবমাল্য জানে। হয়তো সেইজন্যই দৃকপাতও করল না ওর দিকে। কিংবা এমনিও, এটাই কুন্তলার স্বাভাবিক বা বিচিত্র আচরণ। বালিশের তলায় দু-হাত ভাঁজ করে, মাথা হেলিয়ে, উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে দেবমাল্য। মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখছে। অনেক কিছু মিশ্র ভাবনার মধ্যেই বেশ টের পাচ্ছে, বিয়ে করা ঘরের বউ-এর সান্নিধ্য কামনাতেই শরীর জাগছে, পুরুষাঙ্গ টানটান হয়ে উঠছে এবং অনিবার্য টান পড়ছে। অথচ মাত্রই একটু নড়ে-চড়ে শোওয়া ছাড়া, বালিশে মুখ চেপে দু-একটা শব্দ ছাড়া কোনও ভাষা বেরুল না। বেরুতেই পারত, বেরুনোটাই স্বাভাবিক ছিল। নির্জন সকাল, ছুটির দিন, তাড়াহুড়ো নেই, মাত্র দুজন ফ্ল্যাটে, হাত বাড়িয়ে ওকে টেনে ধরলেই আকুলি-বিকুলি ইচ্ছেরা, ইচ্ছের হাত-মুখ-নাক ডুবে যেতে পারত কুন্তলার মুখে-বুকে-নাভিতে-জঙ্ঘায়, ওলট-পালট হতে পারত বিছানায়...।

কিন্তু দেবমাল্য জানে, কিচ্ছু হবে না। এই মুহূর্তে নিষেধের নিস্পৃহ পাঁচিল ওই যুবতীটিকে ঘিরে। জোর করা যায় না। যেত, যদি কুন্তলা সেটাকে কপট রাগের অছিলায় আশকারা দিত। তা ও দেবে না। নিজের মানসিক অবস্থানকে এসব সময়ে ও এমন একটা দুর্ভেদ্য খোপের মধ্যে আটকে রাখতে জানে, যা এমনকী স্বামীর কামনাকেও প্রবেশাধিকার দেয় না। অথচ সুস্থ স্বাভাবিক যুবক-যুবতীর সাম্প্রতিক দাম্পত্য জীবনে কখনও কখনও তেমনটাই কি অভিপ্রেত নয়! নিয়ম-নীতি-শৃঙ্খলা শিকেয় তুলে হঠাৎ কখনও দামাল হয়ে ওঠা!

দেবমাল্য জানত সেটাই স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই তেমন উদ্যোগ নিতেও দ্বিধা বোধ করেনি প্রথম প্রথম। কিন্তু কয়েকবারের পরে বুঝেছিল, কুন্তলা যে শুধু নিরুৎসাহী আর আবেগহীন কাঠিন্যে স্থির, তাই

না, সামান্য একটু মাত্রাহীনতায় ও কদর্য হয়ে উঠতেও দ্বিধা করবে না। বছরখানেক আগে একবার দুরন্ত আবেগ থেকে দেবমাল্যকে নিরস্ত করতে না পেরে কুন্তলা ওর কানের কাছে বলেছিল, স্টপ ইট টিপলু, ইউ হ্যাভ নট ম্যারেড আ হেলপলেস, সিলি বিচ! ডোন্ট বিহেভ লাইক আ ভাদ্দুরে কুত্তা।

ওই অবস্থাতেও একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি খেয়েছিল দেবমাল্য। থেমে গিয়েছিল। কথাটার অভিঘাতে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শান্ত, শিথিল। ঘৃণা, অনুশোচনায় মিলেমিশে সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত বোধ করেছিল। ছেড়ে দিয়েছিল কুন্তলাকে। হঠাৎ যেন একটা দুর্গন্ধের অনুভবে গা গুলিয়ে উঠেছিল। ধীরেসুস্থে নিজেকে সাব্যস্ত করে নিয়ে উঠে চলে গিয়েছিল কুন্তলা।

আশ্চর্য যে, এর পরে কুন্তলা ওই প্রসঙ্গে আর কথা বলেনি।

দেবমাল্য উত্থাপন করতে গিয়ে বুঝেছিল কুন্তলা এড়িয়ে যাচ্ছে। ওর স্বভাবও ঠিক তেমন নয় যে ব্যাপারটা নিয়ে পীড়াপীড়ি করবে। ক্রমশ বুঝে গিয়েছিল, সামান্যতম ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু ঘটলে কুন্তলার প্রতিক্রিয়া হয় তীব্র। অথচ ওর ইচ্ছা-আবেগ-চাহিদার কারণে অন্যের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ও কি একইরকম ভাবে সচেতন কিংবা স্পর্শকাতর! যদি হত, তাহলে হঠাৎ-হঠাৎ ওর নিজের ইচ্ছে আর উচ্ছ্বাস নিয়ে ...

উত্তরটা তেমন স্পষ্ট নয় দেবমাল্যর কাছে। কেননা, এখনও দু বছর না-হওয়া বিবাহিত জীবনে, দেশ থেকে বিয়ে করে নিয়ে আসা বউ-এর কোন ব্যাপারেই বা ও বাদ সাধতে পারে! কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল বেশ আগেই যে, আবেগ-উচ্ছ্বাসের ব্যাপারও দেবমাল্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে নিজের চেষ্টায়, অভিজ্ঞতায়। একই সঙ্গে অবশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠছে, পারিবারিক আর সামাজিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও কুন্তলার বৈরী আচরণ। নয়তো আজ ও বেরুত না।

মনে মনে ইচ্ছের জাল বুনতে বুনতে দেবমাল্য টের পায়, কুন্তলা আলমারি খুলছে। ওর টাকার দরকার।

সামান্য নৈঃশব্দ্যের পরে কানে এল কুন্তলার গলা। ও জানে, দেবমাল্য জেগে আছে।

কালকে যে ড্রয়ারের মধ্যে ক্যাশটাকা ছিল ... কোথায় গেল?

শুধু প্রশ্ন নয়, প্রশ্নের ধরনে, সুরে বিরক্তি মিশে আছে। সকালবেলার প্রথম কথা। কেমন একটা বিষণ্ণ, অবসাদের ভার অনুভূত হল দেবমাল্যর। একই প্রশ্ন কি একটু অন্যভাবে করা যেত না। যেত নিশ্চয়ই, কিন্তু কুন্তলা তা করবে না।

একটু গলা ঝেড়ে দেবমাল্য বলে, কালকে সুপারমার্কেটে বাজার করতে গিয়ে খরচ হয়েছে।

শুধু বাজার আর বাজার! দুটো মানুষের জন্য কতটুকু বাজার লাগে!

দেবমাল্য একই রকম ভাবে বলল, শুক্রবারেই মেইনলি বাজারে যাই ... যা যা লাগে দুজনের জন্য ...।

দুজন, না চারজন? -

কেন? চারজন হবে কোত্থেকে?

ও বাড়ির জন্য বাজার করে দিয়ে আসোনি?

একটা ঢোক গিলল দেবমাল্য। —ও বাড়ির জন্য বাজার বাবা-মা নিজেরাই করেন, তুমি জানো তো।

ড্রয়ার বন্ধ করার শব্দ পেল দেবমাল্য। একটু জোরেই। কুন্তলা বলল, হ্যাঁ জানি। কিন্তু সেটা যখন শুধু দুজনে থাকেন। বাড়িতে লোক আসার কথা থাকলে কে করে দিয়ে আসে তাও জানি।

ও বাড়িতে লোক আসছে তোমায় কে বলল?

সন্ধেবেলা তোমার বাবা এসেই তো বলে গেলেন। আজ বিকেলে যেতে বলেছেন আমাদের, খবরটা দিইনি?

ওহ আমাদের! সামান্য ঘুরে শুল দেবমাল্য। বলল, ও বাড়িতে বাবা-মার কাছে আমরা কি ... লোক?

তা ছাড়া আবার কী! শোওয়ার ঘরের ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসেছে কুন্তলা। চুলের ওপর ব্রাশ টানছে। বলল, আলাদা বাড়ি, আলাদা ফ্যামিলি ...

একটা প্রায় হাসির মতো শব্দ করে ফেলল দেবমাল্য। সেটাকে চাপা দেওয়ার জন্যই যেন আবার একটা হাই তুলল। প্রায় নিজের মনে বলার

মতো বলল, আলাদা বাড়ি, আলাদা ফ্যামিলি ... কী সব বলছ?

ঠিকই বলেছি। পাশ ফেরা অবস্থায় কুন্তলা বলে যায়, তোমাদের তো আর আমাদের কলকাতার বাড়ির মতন বাবা-কাকা-দাদা সবাইকে নিয়ে জয়েন্ট ফ্যামিলি নয় ... যার-যার, তার-তার।

কী বলতে চায় ও! দেবমাল্য অবাক হয়ে যায়। কুন্তলা কি সত্যি বাবা-মার কাছে গিয়ে একসঙ্গে থাকতে চায়? ওঁরা তো হাতে চাঁদ পাবেন তাহলে। মুখে যা-ই বলুন দেবতোষ, আসলে নিঃসঙ্গতা তো অনেক বেশি ওঁদের। ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা বাবা বেশি বলেন, টিপলুকেই মানসিক সমর্থন জানানোর জন্য। তা নয়তো অবসরপ্রাপ্ত দুটো মানুষ ওঁরা, থাকেন বিদেশবিভুঁই-এ। কত গাছপালা করবেন, কত টেলিভিশনে সন্ত্রাসের খবর, জি-টিভিতে হিন্দি সিনেমা আর বাংলাদেশি চ্যানেলে বোকা-বোকা বস্তাপচা অনুষ্ঠান আর সিরিয়াল দেখবেন! হ্যাঁ কাছেপিঠে বন্ধুবান্ধব, পরিচিত বঙ্গসন্তানেরাও আছেন, যাতায়াতও আছে। কিন্তু তাই বা আর কতটুকু! বয়েস তো তাঁদেরও বসে নেই।

এহেন পরিস্থিতিতে, একমাত্র ছেলে, ছেলের বউ যদি একসঙ্গে থাকে, এমনকী বউমা যদি সংসারের দায়িত্বও নিতে চায়, মাকে যতটা চেনে দেবমাল্য, তাইতে বুঝতে পারে, মা বর্তে যেত। কিন্তু কুন্তলা কি পারত? বাবা-মার সঙ্গে এক ছাদের তলায় থাকতে পারত? একমাত্র যে লোকের সঙ্গে ও রয়েছে, তাও আবার নিজের স্বামী, ও তো তার সঙ্গেই মানিয়ে থাকতে পারছে না। আর বাবা-মা একসঙ্গে না থাকলেও, এই প্রায় দু বছরের মধ্যে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, মনে তো হচ্ছে যাতায়াতটুকুও বন্ধ হতেই চলেছে।

আর ওদের বাড়ির যে জয়েন্ট ফ্যামিলির কথা বলছে কুন্তলা, দেবমাল্য খুব কম জানলেও, বিয়ের আগে একবার, বিয়ের সময় এবং পরে একবার, সবসুদ্ধ তিনবার গিয়েই বুঝে এসেছিল— বাইরে আর ভিতরে ওদের পারিবারিক, পারস্পরিক সম্পর্কের অনেকখানিই লোকদেখানো, ফোঁপরা। মাথা ঘামানোর আদৌ প্রয়োজন বোধ করেনি দেবমাল্য।

এখন অবশ্য মাঝে-মাঝে মনে হয়, অমন পারিবারিক অবস্থানই কি গভীর ছায়াপাত করেছে কুন্তলার জীবনে, ভাবনায়! কিন্তু সে কথা কি কখনও ওর সঙ্গে আলোচনা করা যাবে! আলোচনা করার মতো কোনও অবস্থাতেই তো আসতে চায় না কুন্তলা।

ওদের পরিবারের কথাটা তুলল না দেবমাল্য। একটু ঘুরিয়ে বলল, এ দেশে আমাদের তো জয়েন্ট ফ্যামিলি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বাবা-মার সঙ্গে আমরা তো থাকতেই পারি। তুমি বললেই পারি।

আমি বললেই! টেরচা চোখে একবার তাকিয়েই মুখ ফেরাল কুন্তলা। বলল, যে ইম্পর্টেন্সটা আমায় এখন দিতে চাইছ, সেটা প্রথম থেকে দাওনি তো?

অবাক হল দেবমাল্য। বলল, আমি কিংবা মা-বাবা ... কেউ তোমাকে কখনও অবহেলা করেছি?

তোমরা কে, কী করলে কিংবা করবে, তাই নিয়ে আমি বসে নেই।

ভাবনাটা আবার কেমন গুলিয়ে গেল দেবমাল্যর। কোত্থেকে, কী কথা!

তা সত্ত্বেও আগের কথার খেই ধরে বলল, তুমি তো কখনওই বলোনি আমরা একসঙ্গে থাকব কিংবা থাকতে পারি। এখনও যদি বল, তাহলে চল, যে কোনও দিন থেকে আমরা ব্যাসিলডন-এর বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারি।

আচ্ছা ... খুব সুবিধে হয় বুঝি তাহলে! এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল কুন্তলা। বলল, মায়ের খোকা হয়ে রইলে সারাদিন, আবার রাতে বউ নিয়ে ফুর্তি ... বেড়ে আরামের ব্যবস্থা!

দেবমাল্য না বলে পারল না, এসব কী বলছ তুমি!

অবাক হওয়ার কী হয়েছে? সেইটাই তো চাইছ তুমি। নিশ্চয়ই ও বাড়ি থেকে মন্ত্রণা আছে?

কে, কাকে মন্ত্রণা দেবে কুন্তলা? মাকে তো তুমি দেখেছ আমার থেকে আগে, মা কীরকম মহিলা ...।

চুপ করো তো, মুখ বিকৃত করে কুন্তলা বলল, সব মাস্টারনিরাই এক

একটা খচাটে আর ... থাক, বললাম না।

প্রায় অসহায়ের মতো দেবমাল্য বলল, প্লিজ, তুমি আর কিছু বোলো না। তোমার কথার কোনও সামঞ্জস্য নেই।

বলতে তো চাইনি, ঘাঁটালে কেন আমায়?

আমার ভুল হয়েছে কুন্তলা। একটা শ্বাস ফেলে, খালি গায়ের ওপর কম্বলটা টেনে নিয়ে উঠে বসল দেবমাল্য। মিনমিন করে বলল, একসঙ্গে থাকা, জয়েন্ট ফ্যামিলির কথা উঠল বলেই— তুমিই তুললে।

ধান্দাবাজ ফ্যামিলিতে ও কালচারটা থাকে না।

অল্প মুখ তুলে দেবমাল্য বলল, বিয়ের আগে যখন তোমায় দেখতে গিয়েছিলাম, তুমিই কিন্তু জিজ্ঞেস করেছিলে, আপনার আলাদা বাড়ি আছে লন্ডনে? আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম প্রশ্নটা শুনে।

কেন হয়েছিলে? আমাকে খুব ন্যাকাচৈতন মনে করেছিলে নিশ্চয়ই? হুঁ-হুঁ বাবা ... !

জানি না, আমি আর কিছু বুঝতে পারি না এখন।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত আচরণ করল কুন্তলা।

খাটের পাশ দিয়ে ঘুরে এসে সটান উঠে এল বিছানার ওপর। দেবমাল্যর গায়ের ওপর থেকে এক ঝটকায় কম্বলটা সরিয়ে দিয়ে, দুহাতে বেড় দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল, তারপর সাপটে চুমু খেতে লাগল ওকে। ভারসাম্য রাখতে না পেরে বিছানায় টাল খেয়ে পড়ল দেবমাল্য। উন্মত্ত আর আগ্রাসী চুম্বনের মধ্যে ওর একটা হাত টেনে নিয়ে কুন্তলা কার্ডিগানের নীচে ঢুকিয়ে দিল ডানদিকের স্তনে। দেবমাল্য পরাস্ত এবং সম্পূর্ণ হতচকিত, অথচ সেই বিফলতার মধ্যেই টের পাচ্ছে কুন্তলার পূর্ণ শরীর, সুগন্ধ আর চুম্বনের লালায়, পেষণে ওর শরীরের রসায়ন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে এবং জাগছে। আস্তে আস্তে কুন্তলা হাত বাড়াচ্ছে দেবমাল্যর তলপেট বেয়ে নীচের দিকে। রোমরাজির মাঝখান থেকে নরম মুঠিতে ধরে নিয়েছে ওর কঠিন আর গরম পুরুষাঙ্গ। তারপর চাপছে, নাড়ছে। চোখ বুজে আসছে দেবমাল্যর, আপনা আপনি হাত ক্রিয়াশীল হয়ে উঠছে, হাতড়াচ্ছে কুন্তলার ট্রাউজার্সের কাছে ...।

মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল কুন্তলা। রীতিমত শক্তি প্রয়োগ করেই দেবমাল্যকে ঠেলে সরিয়ে বিছানার ধারে চলে এল। কার্ডিগান টানতে টানতে নেমে পড়ল। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেবমাল্য অনুনয় করল, প্লিজ কুন্তলা ... এসো ... এসো ...। যেয়ো না, প্লিজ যেয়ো না!

ইশ্-স্ ... অত খায় না! বলতে বলতে ঘরের বাইরে চলে যাচ্ছে কুন্তলা।

প্রায় মরিয়া হয়ে দেবমাল্য ডাকল, কুন্তলা প্লিজ, যেয়ো না।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কুন্তলা আঙুল তুলল। —শাট আপ। চেঁচাবে না। আয়াম গোয়িং আউট।

একবার ভাবল দেবমাল্য, ছুটে গিয়ে জাপটে ধরে কুন্তলাকে। শক্তপোক্ত, জিম করা চেহারা ওর। ফর্সা, প্রায় ছ-ফুট লম্বা। শরীর ফুটছে। জোর করে চেপে ধরলে, কুন্তলার ছাড়ানোর সাধ্য নেই ওকে। বিয়ে করা বউ ... ধরতে তো পারেই! কার, কী বলার আছে!

কিছুই করতে পারে না দেবমাল্য। ক্রমশ শান্ত হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছে পাশের ঘরে কুন্তলার নড়াচড়ার শব্দ। একটু পরে বাথরুমের বেসিনে জল পড়ার আওয়াজ। আলমারি খোলা এবং বন্ধ হল। জুতো পরছে কুন্তলা। আবার সেই পারফিউমের সুগন্ধটা উড়ে আসছে এ ঘরে। ফ্ল্যাটের দরজা খোলা হল। বাইরে থেকে টানতেই খুট শব্দে লক্ হয়ে গেল। নৈঃশব্দ্যের হাওয়ায় ভাসছে শনিবারের সকাল। বিভ্রান্তি-হতাশা-ক্রোধ একসঙ্গে ছটফটিয়ে উঠতে উঠতেই জ্বালা করা চোখ দুটো চেপে কুঁচকে বন্ধ করে ফেলল দেবমাল্য। মেয়েটা কি পাগল, না শয়তান, না অ্যাবনরম্যাল ...! ভাবতে ভাবতে বালিশ চেপে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল দেবমাল্য। মুখ ঘষছে বালিশে। একইসঙ্গে নিতম্ব সচল হয়ে উঠছে বিছানার ফোম গদিতে, ক্রুদ্ধ আস্ফালন ছিঁড়ে দিতে চাইছে বিছানার কুশন।

গলে যাচ্ছে দেবমাল্য। হতাশা গ্লানি উষ্ণতায় নিজের মধ্যেই ভিজে যাচ্ছে নিজে, জ্যাবজেবে হয়ে যাচ্ছে বিছানার চাদর। শ্বাস পড়ছে জোরে

জোরে। একসময় সব কিছু জড়িয়েই নিথর হয়ে পড়ে রইল, অশান্তি আর অতৃপ্তির বোধ নিয়ে। ক্লান্ত লাগছে। অস্বস্তি আর ঘৃণা বোধ হচ্ছে স্খলনের পরে, তবু উঠতে ইচ্ছে করল না বিছানা ছেড়ে। নাকি পারল না।

কী করবে এখন দেবমাল্য! এ কী অদ্ভুত সামঞ্জস্যহীন, যুক্তিহীন আচরণ! সুস্থ-স্বাভাবিক কোনও মেয়ে, বউ যাই হোক না কেন, তার কাছ থেকে কি এমন অপ্রত্যাশিত, উদ্ভট ব্যবহার কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারে! তা ছাড়া কেনই বা! কুন্তলাকেও তো কেউ দেখে, কথা বলে, আলাপ করে কখনওই বলতে পারবে না এমন আশাতীত স্বভাবচরিত্রের হতে পারে মেয়েটা! বিয়ের আগে দেবমাল্যও তো কিছু বোঝেনি!

মাঝে মাঝে দেবমাল্যর এখন মনে হয়, ওর নিজেরই চাহিদা-ভাবনা-বোঝাবুঝিতে কোনও গণ্ডগোল আছে কি!

কোনও ব্যাপারেই কি ও বেশি বাড়াবাড়ি করেছে কুন্তলাকে নিয়ে? খুব বেশি আশা করেছে ওর কাছ থেকে? দাবিয়ে রেখেছে কিংবা ছেড়ে দিয়েছে! নিশ্চয়ই না। কেনই বা সেরকম করতে যাবে? ওর মানসিকতা যদি সেরকমই হত, তাহলে এই ভাবনাগুলোও তো আসত না। আসছে তার কারণই তো এই যে, ও একটা দিশাহারা অনিশ্চয়তা আর উৎকণ্ঠায় রয়েছে সারাক্ষণ কুন্তলাকে নিয়ে। এমনটা হওয়ার কি কথা ছিল!

বাবা-মার একমাত্র সন্তান অনেক সময় আত্মকেন্দ্রিক, অনুদার, ঘরকুনো হয় বলে শোনা যায়। কেননা মা, বাবা দুজনেরই অতিরিক্ত আর অপ্রয়োজনীয় মনোযোগের ফলে সন্তানটির স্বাভাবিক বিকাশ, মেলামেশা এমনকী দুষ্টুমিও ব্যাহত হয়। তার সঙ্গেই আবার জোটে বেশি বেশি প্রশ্রয়, অবস্থার তুলনায় বেশি একপেশে স্বাচ্ছন্দ্য, একইসঙ্গে সাবধানতাও। দেবমাল্যর ধারণা, এসব ভাবনার অনেকটাই পুরনো। শুধু তাই নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসূয়াপ্রসূত। অনেক স্বামী-স্ত্রীরই ইদানীং একটিই ছেলে অথবা মেয়ে এবং সেটা তাঁদের বাস্তব আর পারিবারিক বোধ থেকে। সেইসব ছেলেমেয়েরা যে খুব স্বার্থপর, একালষেঁড়ে, কুচুটে তা তো মনে হয় না দেবমাল্যর। বরং উলটোটাই দেখেছে বেশি। অভিভাবকদের একমাত্র সন্তান যথেষ্ট মিশুকে, খোলামেলা।

আর এসবের কারণই হচ্ছে আধুনিক বাবা-মাদের সচেতনতা। পুরনো ধ্যানধারণাগুলো সম্পর্কে তাঁরা ওয়াকিবহাল বলেই, ছোট থেকে সচেতন থাকেন ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ ভাবনাতেও। অবশ্যই এসব চিন্তার পিছনে একটি মধ্যবিত্ত রূপকল্পনা বিদ্যমান থাকে ; কিন্তু তাইতেই বা অসুবিধে, আপত্তির কী! শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্তরাই তো সমাজের প্রতিফলন ঘটায়, মূল্যবোধ ধরে রাখে, আশা-নিরাশার হদিশ দেয়।

দেবমাল্যদের ভাটপাড়ার বাড়ি বড় ছিল না। দাদু-ঠাকুমাকে আর তেমন মনে নেই ওর, কিন্তু দূর সম্পর্কের সেই বিধবা পিসিমাকে ওর এখনও মনে আছে। ওদের বাড়িতেই থাকতেন, ছোটখাটো সরল নিপাট ভালমানুষ, বুড়িয়ে গিয়েছিলেন অল্প বয়েসে, অথচ কী যে ভালবাসতেন দেবমাল্যকে! বাবা-মাও যথাসম্ভব যত্ন নিতেন ওঁদের রাঙাদির। আত্মীয়তার সূত্রে কত কাছের বা দূরের ছিলেন পিসিমা, সে কথা কারওর মনে ছিল না। পাড়াতেই সবাই জানত রাঙাদি অধ্যাপক দেবতোষ বাগচির দিদি।

দেবমাল্যর এখনও মনে আছে, ওর বছর দশেক বয়েস পর্যন্ত রাঙা পিসিমাই যেন ওর সমস্ত পৃথিবীটা অধিকার করে রেখেছিলেন। বাবা নৈহাটির বঙ্কিম কলেজের কেমিস্ট্রির লেকচারার, মা কমলা গার্লস স্কুলের টিচার তখনও। দেবমাল্যকে ব্যান্ডেলের ডন বস্কো স্কুলে ভর্তি করার কথা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি। ইংরেজি মিডিয়াম তো দূরের কথা, এমনকী ক্লাস টু-এর আগে দেবমাল্য স্কুলেই যায়নি। শিক্ষক-শিক্ষিকা বাবা-মায়ের ছেলে ছ-বছর পর্যন্ত স্কুলে যায় না, পাড়ায় নাকি সেটা ছিল আলোচনার বিষয়। বাবা-মা কান দেননি। ওর নিজের তো কোনও প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু নিয়ম করে দেবমাল্যকে পড়াতেন নির্মলা এবং পিসিমাও খানিকটা। যদিও পিসিমার কাছে টিপুর পড়ার চেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল গল্প শোনার। অথচ সাড়ে ছয় বছর বয়েসে, কয়েক মাস বাড়িয়েও যখন ও ভাটপাড়া স্কুলে ভর্তি হয়েছিল, মনে হয়েছিল, স্কুলের সব পড়া যেন ওর হয়ে বসে আছে। ক্লাস ফোর পর্যন্ত ও আর সেকেন্ড হয়নি স্কুলে। আর ফাইভ-এর পরীক্ষা দেওয়ার আগেই তো এদেশে।

আসলে রাঙা পিসিমার মৃত্যু যে শুধু টিপলুর কাছে, তাই নয়, বাবা-মার মনেও গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল এবং এখন ও বুঝতে পারে, ওই মৃত্যুও মাঝবয়েসে বাবার বিদেশে আসার চেষ্টা করার পিছনে একটা কারণ। দেবতোষ অবশ্য সেই আশির দশকের গোড়া থেকে কলেজের অধ্যাপনা, পরিবেশ নিয়েও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছিলেন। লেখালিখি চেষ্টাচরিত্র করছিলেন ইংল্যান্ডে আসার। পিসিমার মৃত্যু আরও ঠেলে দিয়েছিল। ও জানে, বাবার প্রায় বড়দাদার মতন শক্তিজেঠু এদেশে থাকতেন তখনও, তিনিই ওদের স্পনসর করেছিলেন।

এখনও সেই শক্তিজেঠু, জেঠিমা আর পাপাইদাদা-ই তো এদেশের পরমাত্মীয় ওদের। জেঠিমা-র রবীন্দ্রসংগীতের স্কুল আছে, যদিও খুব আরথ্রাইটিস-এ ভোগেন। শক্তিজেঠু রিটায়ার করেছেন। পাপাইদাদাও বিয়ে করে কেন্ট-এ থাকে।

কী দ্রুত যেন দিনগুলো কেটে গেল। দেবতোষকে বসে থাকতে হয়নি চাকরির জন্য। লন্ডনের বাইরে আসতে হয়েছিল বটে, কিন্তু ব্যাসিলডন-এ এসে দেবতোষ আর চাকরি পালটাতে চাননি। নির্মলাও কাজ পেয়েছিলেন স্থানীয় স্কুলে। আর তার পরেই শক্তিজেঠুর পরামর্শে বাড়ি কিনে ফেলেছিলেন বাবা। জেঠু বলেছিলেন, বাড়ি কেনা হচ্ছে এদেশের সবথেকে প্রফিটেবল ইনভেস্টমেন্ট, এবং মর্টগেজ দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্কগুলো বসে রয়েছে। কিন্তু বাবা-মার মাথায় তখন টিপলুর পড়াশুনো, ভবিষ্যৎই ছিল আসল ভাবনা।

উদ্বেগও যথেষ্ট ছিল। ভাটপাড়া স্কুল থেকে বাংলা মিডিয়ামে পড়ে আসা ছেলে কীভাবে সাহেবদের স্কুলে ম্যানেজ করবে! অথচ এখনও দেবমাল্যর মনে আছে, সেন্ট বিডস স্কুলে ভর্তি হয়ে ওর মানিয়ে নিতে এমন কিছুই অসুবিধে হয়নি। শুধু মাঝেমাঝে উত্তেজনায় ওর বাংলা কথা বেরিয়ে যেত। কিন্তু তাতেই বা কী! দু-একদিন ছেলেমেয়েরা তাই নিয়ে হাসাহাসি করতেই, ক্লাস টিচার মিসেস হ্যারিসন কয়েকজনকে এমন কড়কে দিয়েছিলেন যে আর কেউ ট্যাঁ ফো করেনি। তার পরের বছরই ও অবশ্য লেইনডন-এর গ্রামার স্কুলে চলে গিয়েছিল। কিন্তু

মিসেস হ্যারিসনের সঙ্গে এখনও মাঝেমধ্যে দেখা হয়, কথা হয়।

দেবমাল্য টের পায়, এগারো-বারো বছর বয়েস পর্যন্ত বাংলা পড়াটাই এখন যেন ওর পরমপ্রাপ্তি। কথাবার্তা বলাটা বাবা-মা সবসময়ই চালিয়ে গেছে বাড়িতে। কিন্তু লিখতে, পড়তে পারাটা ভাটপাড়া স্কুলে না পড়লে হত না। একই সঙ্গে দুটো ভাষায় কথা বলতে পারা, লিখতে পড়তে পারার কি কম সুবিধে! নির্মলা-দেবতোষ অবশ্য সবসময়েই বই এনে দিয়েছেন, বাংলা পড়তে উৎসাহ দিয়েছেন। আর ও-লেভেল পর্যন্ত পড়ার সময় ও তো নিয়মিত জেঠিমা-র 'ফাল্গুনী' গানের স্কুলেরও ছাত্র ছিল।

এখনও জেঠিমা বলেন, ছোটবেলায় এত ভাল গাইতিস ... ছেড়ে দিস না। যখন ইচ্ছে করবে আসিস। আরও বড় হলে বুঝবি, বিদেশবিভুঁই-এ নিজেদের গান-বাজনা, সংস্কৃতি আমাদের কীভাবে, কতখানি আশ্রয় দেয়।

বিয়ের পরে কুন্তলাকেও জেঠিমা বলেছিলেন, টিপলুকে ধরে নিয়ে চলে এসো তো যখন সময় পাবে। তুমি সদ্য সদ্য কলকাতা থেকে এসেছ ... এখন ঘরসংসার এদেশেই ... এলে আরও অনেকের সঙ্গেই দেখা হবে ... তারপর একটু একটু করে তোমরাই দায়িত্ব নেবে ...

কোথায়, কী! দেড় বছরের মধ্যে দু-তিনবারের বেশি শক্তিজেঠুর বাড়িতেই ও কুন্তলাকে নিয়ে যেতে পারেনি। আর শেষবার তো এমন এক সিন ক্রিয়েট করে এল যে, জেঠু-জেঠিমাই আরও কয়েকজন অতিথির সামনে চূড়ান্ত অপদস্থ হলেন। অথচ আভাসে ইঙ্গিতে খানিকটা কুন্তলার মানসিকতা আন্দাজ করেই, সেদিন প্রথম থেকে ওঁরা কিছুটা তোয়াজ করেই চলছিলেন ওকে। কিন্তু কলকাতা থেকে সদ্য বিয়ে হয়ে আসা, লেখাপড়া জানা কোনও বাঙালি মেয়ে যে অমন ভঙ্গি আর ভাষায় কথা বলতে পারে, দেখে আরও কয়েকজন বঙ্গসন্তানও বোধহয় সিঁটিয়ে গিয়েছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন তাঁরা, দেবতোষ বাগচী কোত্থেকে অমন একটি ছেলের বউ জোগাড় করে আনলেন!

না, মুখে কিংবা আচরণেও অবশ্য সে কথা বুঝতে দেননি কেউ।

কিন্তু যা বোঝার, তার আর বাকি ছিল না কিছুই। অথচ সেটা যে সঠিক কী, তা এখনও দেবমাল্য নিজেও তো জানে না। খুব অস্বস্তি আর লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলেন বাবা-মা। কিন্তু জেঠিমা নিজেই এত ভাল মানুষ, সেটা কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। মা-কে বলেছিলেন, তোমরা অত সংকোচ বোধ করছ কেন বলো তো! নতুন এসেছে এদেশে, ঘরবাড়ি-দেশ-বাবা-মা সব ছেড়ে ... ওর মনের অবস্থাটা একটু বুঝতে হবে না!

শক্তিজেঠুরা সেদিন আট-দশজনকে বাড়িতে ডেকেছিলেন। দুজন ডাক্তার আর তাঁদের স্ত্রীরাও ছিলেন। পাঞ্চজন্য বলে ডাক্তারটির স্ত্রী সোহিনীও ডাক্তার এবং ওরা দুজনেই বেশ ভাল গান করে। আর এক ডাক্তারের বউ রত্না খুব ভাল বাঙাল কথা বলতে পারে এবং হাসাতেও পারে খুব। দিব্যি গান-বাজনা, আড্ডা আর পান চলছিল। দেবমাল্যর ইচ্ছে থাকলেও মদ্যপান করতে পারছে না, কেননা, ওকে গাড়ি চালাতে হবে। বাবা-মাকে নামিয়ে ও আর কুন্তলা বিলারিকে ফিরে যাবে। এমন কিছু দূর নয় শক্তিজেঠুর বাড়ি, তাহলেও কোথায় পুলিশ ক্যামেরা নিয়ে ওঁত পেতে বসে থাকবে তার ঠিক কী! এমনিতেও বছরখানেক আগে দেবমাল্য স্পিডিং-এর জন্য একবার পয়েন্ট খেয়েছে এবং ষাট পাউন্ড জরিমানা দিয়েছে।

সাধারণত বাঙালিদের ঘরোয়া আড্ডায় মহিলারা শাড়ি পরে যেতেই পছন্দ করে। কিন্তু কুন্তলা পরেছিল জিনস আর একটা লোকাট টপ। একটু বেমানান দেখাচ্ছিল সেদিনের পরিবেশে, কিন্তু ওসব নিয়ে খুব বেশিক্ষণ কেউ মাথা ঘামায়নি। বরং ওসব নিয়ে এদেশে কাজ না করা বউরা স্বামী কাজে চলে যাওয়ার পরে টেলিফোনে খুব কথা চালাচালি করে। জেঠিমার বাড়িতে সেদিন তেমন কেউও ছিল না।

আড্ডার মধ্যে জেঠিমা-ই হঠাৎ বললেন, ও কুন্তলা, তোমার তো গলা শুনলেই মনে হয় গান জানো। একটা গাও না।

কুন্তলা বলল, না, এসব গানফান আমার আসে না।

জেঠিমা বললেন, তোমার যেরকম গান আসে তাই করো না। হিন্দি

গাইবে? এসো, আমি হারমোনিয়াম বাজিয়ে দিচ্ছি কেমন দ্যাখো।

কুন্তলা বলল, তার দরকার নেই, আপনারা যা করছেন তাই করুন।

জেঠিমা চেপে গেলেন। কিন্তু মা বললেন, মামণি একটা গাও না, তুমি তো বেশ গুনগুন করো।

হঠাৎ কুন্তলা বলল, পিরিত দেখিয়ে মামণি-মামণি করবেন না তো, আমার নামটা তো আপনার অজানা নয়!

মা একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন। চূড়ান্ত অপ্রতিভ ঘরের অন্য অতিথিরাও। মা চুপসে রইলেন।

জেঠিমা খুব দ্রুত সামাল দেওয়ার জন্য বললেন, আচ্ছা-আচ্ছা, থাক-থাক। শোনো, আমিই তোমাদের একটা পুরনো আধুনিক গান শোনাচ্ছি। কথাটা কার লেখা, কার সুর, কে বলতে পারে দেখি!

রবীন্দ্রসংগীতে সাধা গলা নিয়ে, জেঠিমা রীতিমত বৈঠকি চালে ধরলেন, পিয়াল বনের পাখি, জানি তুমি আসিবে না, তবু চেয়ে থাকি ...।

স্বপন সেনগুপ্ত বলে ডাক্তারটি তবলা বাজাল। খুব জমে গেল পরিবেশটা। গানের চলনটাই জমিয়ে দিল।

শেষ করে জেঠিমা বললেন, গানটার কথা হচ্ছে কাজী নজরুল-এর। কিন্তু এই মেজাজি সুরটা দিয়েছিলেন, আমাদের সবাইয়ের পরিচিত সাহিত্যিক সমরেশ বসু আর ওঁর স্ত্রী গৌরী বসু। এটা অনেকেই জানে না।

কুন্তলাকে একটু সহজ করার জন্যই জেঠিমা আবার বললেন, কী কুন্তলা, ভাল লাগল?

ঠোঁটে একটা মোচড় দিয়ে উঠে দাঁড়াল কুন্তলা। তারপর বলল, প্যানপেনে এসব বাংলা গান আর এই ফালতু আড্ডা ... সহ্য হয় না বাবা, বলতে বলতে ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আর শুধু যে ও নিজে বেরিয়ে গেল তাই নয়। জেঠু-জেঠিমার বাড়ির আড্ডাটাও সেদিন ও নষ্ট করে দিয়ে এসেছিল।

বাড়ি ফেরার পথে প্রথমে গুম হয়েছিল দেবমাল্য। পরে বাবা-মাকে নামিয়ে বিলারিকে যাওয়ার সময় না! বলে পারল না, কুন্তলা, তুমি অমন

ভাবে কথাগুলো না বললেও পারতে। পুরো অ্যাটমসফিয়ারটা নষ্ট হয়ে গেল।

কুন্তলার কোনও বিকার নেই। বলল, আমার তাতে বয়ে গ্যাছে। ওভাবে না বললে আরও দু ঘণ্টা দেরি হত আজ উঠতে।

তাতেই বা কী? কাল তো ছুটি। সাড়ে বারোটা এমন কিছু রাত নয় উইকএন্ড-এ। দেরি তো হবেই, সবাই জানে ...।

পরের কথাটা শুনে হাঁ হয়ে গেল দেবমাল্য। কুন্তলা বলেছিল, কিন্তু আমার যে আর দেরি সহ্য হচ্ছিল না ... আমার নতুন বিয়ে হয়েছে। বসে বসে ভাবছিলাম কখন বরের সঙ্গে ঘরে ঢুকব। সেইজন্যই তো ...।

দেবমাল্য অবাক, তাকিয়ে বলল, কী বলছ এসব! তোমার কি মাথায় ছিট আছে?

উহুঁ। কুন্তলা অবলীলায় বলল, আমার ইচ্ছের কোনও ইম্পর্টেন্স নেই?

দেবমাল্যর বিভ্রান্তি বেড়েই চলেছিল। অথচ যখন ও প্রথম কলকাতায় গিয়েছিল কুন্তলাকে দেখতে ...।

টেলিফোন বাজছে। শব্দটাতেই ভাবনার সুতোটা ছিঁড়ে গেল দেবমাল্যর। আর সেই মুহূর্তেই অনেকক্ষণ পরে আবার বিছানার মধ্যে অস্বস্তিকর অবস্থাটা সম্বন্ধে সচেতন হল। ইশ্, কী বিশ্রী একটা ব্যাপার ঘটিয়েছে। তবু হাত বাড়াল রিসিভারের জন্য।

কে হতে পারে! কুন্তলাই বোধহয়, কিংবা মা, নয়তো বাবা ... ভাবতে ভাবতেই গলা যথাসম্ভব পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, হ্যালো!

ঘুমোচ্ছিস নাকি রে? আমি মানস বলছি।

দ্রুত মানসের মুখটা ভেসে উঠতেই দেবমাল্য বলল, মানস আমি তোকে দশ মিনিটের মধ্যে রিংব্যাক করছি। বাড়িতে আছিস তো?

হ্যাঁ, ছুটির দিন, এর মধ্যে আর কোথায় যাব?

তাহলে একটু ওয়েট কর। পালাস না কোথাও। দরকার আছে। বাই।

টেলিফোন রেখে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল দেবমাল্য। আগে বাথরুমে গিয়ে স্নান করতে হবে।

৩

কিশলয় হিসেব করে দেখল, ঠিক সাড়ে ছ বছর হল ও ইংল্যান্ডে চলে এসেছে। দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেটা এখনও যে মাঝেমধ্যে মাথা চাড়া দিচ্ছে না, তা নয়। কিন্তু থাকা, না-থাকার পক্ষে আর বিপক্ষের যুক্তিগুলো যেন ক্রমশই বেশি ভাবনার দখল নিচ্ছে। এদেশ-ওদেশে থাকার সুবিধে অসুবিধেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়েই দেখছে, ভাবনাই সার। সিদ্ধান্ত পাকা হচ্ছে না।

প্রথমে এদেশে আসার সময় আরও অনেক ডাক্তারের মতন কিশলয়ও ভেবে এসেছিল, কাজ করবে, পড়াশুনা করবে, পরীক্ষা দেবে। তারপর পাশ করে, বিলেতের ডিগ্রি নিয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু ফিরে গিয়ে আর ওদের পার্কসার্কাস-এর বাড়িতে থাকবে না। টালিগঞ্জ কিংবা বাঁশদ্রোণী-বৈষ্ণবঘাটা এলাকায় ফ্ল্যাট কিনবে, ওদিকেই কোনও একটা জায়গায় চেম্বার ঠিক করে প্র্যাকটিস করবে। চেষ্টা করবে দু-একটা বেসরকারি চিকিৎসালয়ে অ্যাটাচমেন্ট জোগাড়ের, তারপর....

পরীক্ষাটা তেমন খুব হাতিঘোড়া বলে মনে হয়নি কিশলয়ের। কাজকর্মের সঙ্গে নিয়মিত পড়াশুনাটা অবশ্য চালাতে হয়েছিল। কিন্তু সত্যি বলতে কী, বিদিশাই তখন মেয়ে-সহ পুরো সংসারটার হাল ধরে রেখেছিল পুরো ছ বছর ধরে। এখন কিশলয় বুঝতে পারে, দেশে ফেরা, না-ফেরার সূক্ষ্ম আর আসল টানাপোড়েনটা শুরু হয়েছিল পাশ করার পর থেকেই। যদিও সচেতন ভাবে তখন সেটা মাথায় আসেনি। বরং মনে হয়েছিল, ফিরে যাওয়াটা যখন ঠিক করাই আছে, তখন আর কিছুদিন কাটিয়ে গেলেই বা ক্ষতি কী! এদেশের পরিবেশে কাজ করে কিছুটা অভিজ্ঞতা বাড়বে, রোজগারপত্র মোটামুটি খারাপ না। ঘোরা বেড়ানোর এমন সুযোগও দেশে ফিরে গেলে আর হবে না। একবার প্র্যাকটিস করতে নামলে, বিলেতের ডিগ্রি থাকলেও, কয়েক বছর মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে।

যুক্তি আর ভাবনার পিছনে মনের সায় থাকলে সেটাকেই সঠিক বলে

মনে হয়। বিদিশার মতামতের খুব একটা অতিরিক্ত গুরুত্ব না থাকলেও, ওর যে প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে, কিশলয়ের তা অনুমান করতে অসুবিধে হত না। কিশলয় এ দেশে আসার ছ-সাত মাস পরে তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে এসেছিল বিদিশা। আড়াই-তিন বছর দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছিল এবং স্বামীর পরীক্ষায় পাশ করাটা অবশ্যই নিশ্চিন্ত করেছিল ওকে। সুতরাং নির্দ্বিধায় ও দ্বিতীয়বারের জন্য গর্ভবতী হয়েছিল। আর তেমন অনিবার্য পরিস্থিতি না হলে, কোনও মেয়েই চাইবে না, সন্তানটি ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত ঠাঁইনাড়া হতে। বিশেষ করে ঠাঁইটি যদি আবার উন্নত পশ্চিমি দেশ হয়।

কিন্তু সন্তানের জন্মের পরে পরেই দেশে ফেরা যে আরও কঠিন, কিশলয়-বিদিশা বুঝেছিল তাদের ছেলে হওয়ার পরে। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা হয়— বিদেশে বসবাসের সময়টি দীর্ঘতর হয়েছিল। কিশলয়ের কাজের অসুবিধে ছিল না। সুতরাং কাজটি এদেশে রেখেই একবার ছুটিতে দেশে ঘুরে এসেছিল কিশলয় সপরিবারে। উদ্দেশ্য খুবই সনাতন যুক্তি নির্ভর। নতুন বাচ্চা বাড়ির লোকজনকে দেখিয়ে আনা এবং সেই সঙ্গে সরেজমিন পরিস্থিতিও আন্দাজ করে আসা। মানসিকতাটা এই, আজ না হোক কাল তো দেশে ফিরছেই। সুতরাং কয়েক বছরের অনুপস্থিতিজনিত তফাত, ফাঁকফোকরগুলো স্বচক্ষে দেখে, বুঝে আসা। তারপর আয়োজন তো আছেই।

আর একটা উদ্দেশ্যও ছিল ওই সময় কিশলয়ের দেশে যাওয়ার পিছনে। চার ভাইবোনের সব থেকে ছোট কুন্তলার বিয়ের সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল শীতের সময়। খবরাখবর ছিল কিশলয়ের কছে। তার কোনও উদ্যোগ বা পাত্র নির্বাচনের ব্যাপারে কোনও ভূমিকা না থাকলেও, কিশলয় জানত হবু-ভগ্নিপতিটি এদেশের বাসিন্দা। একটি বড় মাল্টিন্যাশানাল ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির রিসার্চ অফিসার। মলিকুলার বায়োলজি নিয়ে এদেশেই পড়াশুনা করেছে। দেবমাল্যর সঙ্গে তখনও চাক্ষুস দেখা হয়নি কিশলয়ের, কিন্তু টেলিফোনে কয়েকবার যোগাযোগ হয়েছিল। কথা হয়েছিল ওর বাবা-মার সঙ্গেও।

শুনেছিল, পাত্র নাকি নিজে দেখে কুন্তলাকে পছন্দ করে এসেছে।

কিশলয়ের আর কিছু বলার ছিল না। চার ভাইবোনের তৃতীয় সে, ওপরে দাদা তারপর দিদি আছে, মা-বাবা আছে। আছে এক ছাদের নীচে কাকার পরিবার। হাঁড়ি আলাদা কিন্তু বাড়ি এক। বাবার বদলির চাকরি, কাকার কাঠের ব্যবসা। জেলা মফস্‌সল ঘুরে এসে অবসর নেওয়ার কাছাকাছি দিবাকরের পোস্টিং এখন কলকাতার মধ্যে। টালিগঞ্জ থানার বড়বাবু দিবাকর রায়, অর্থাৎ ওসি। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ মহলে ঝানু, দুঁদে এ জাতীয় কয়েকটা বিশেষণের শিরোপা আছে দিবা রায়-এর নামের অনুষঙ্গে। দাদা কাঞ্চন মোটর ভেহিকেলস-এর চাকুরে। দিদির বাড়ি বোলপুর। জামাইবাবু বিশ্বভারতীর বিনয়ভবনে কৃষি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। কুন্তলা ছোট। তার পড়াশুনার বিষয় দু-একবার পরিবর্তিত হওয়ার পরে কিশলয় যখন ডাক্তারি পাশ করে, তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কুন্তলা বায়োকেমিস্ট্রি নিয়ে এম এসসি পড়ছিল।

মাথার ওপর অতগুলো মানুষ থাকায়, বোনের বিয়ের ব্যাপারে কিশলয়ের আর কী-ই বা বক্তব্য থাকতে পারে। কিন্তু বিয়ের কথা হওয়ার পরে, বিশেষ করে পাত্র এদেশের জানার পরে, বক্তব্য কিছু ছিল বিদিশার। বিদিশা পাশ করা নার্স। কিশলয়ের সঙ্গে ভালবাসার বিয়ে। পার্কসার্কাসের শ্বশুরবাড়িতে তার খুব একটা থাকার সুযোগ হয়নি, কিংবা সুযোগ থাকলেও চায়নি। যদিও বিদিশার নিজের কর্মক্ষেত্র ছিল কলকাতায়, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে। বিলেতে আসার আগে পর্যন্ত বিদিশা টাকি হাসপাতালের কোয়ার্টার্সে কিশলয়ের সঙ্গেই ছিল। স্বামী বিদেশে আসার তোড়জোড় করছে, সুতরাং চাকরির আগ্রহ তার কমে আসছিল। কিশলয় চলে আসার পরেও ছ সাত মাস সে পানিহাটিতে নিজেদের বাড়িতেই ছিল বাবা-মা-দাদার সঙ্গে। পার্কসার্কাসে শ্বশুরবাড়ির এদেশীয় অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গীয় পরিবেশে বিদিশা কখনওই স্বচ্ছন্দ বোধ করেনি। সম্ভবত ছোট ননদ কুন্তলার আচরণ এবং সংসারে হিসাব বহির্ভূত যথেষ্ট অর্থের আনাগোনাও সে খুব সহজভাবে গ্রহণ করেনি। ওর তথাকথিত বাঙাল মূল্যবোধে একটি জেদ বজায় ছিল

বরাবর। ও বাড়ির ঠুনকো, লোকদেখানো আভিজাত্যের তলায় তলায় আসলে যে একটি দুর্নীতির হাওয়া বইছে এবং তার মধ্যেই বাকি সকলের জেগে ঘুমনোগোছের সহাবস্থান, বিদিশা তা টের পেত। ওদের পানিহাটির বাড়ির অবস্থা নিম্ন না হলেও, শুধু মধবিত্তের চেয়ে বেশি কিছু নয়, কিন্তু কষ্টার্জিত একটি রুচি আছে সেখানে। সেই রুচির সঙ্গে মানানসই বিদিশার চেহারাটিও। মা-এর ধরন পেয়ে ওর গায়ের রং ফর্সা, বাবার আড়া পেয়ে দোহারা লম্বা। হাসপাতালের নার্সকুলের এসব মেয়েরাই যুবক হাউস সার্জেনদের নজরে পড়ে যায়। বিদিশাও কিশলয়ের নজরে পড়েছিল। বিলেতে আসার পরে অতিরিক্ত এবং অনিবার্য পালিশ লেগেছিল বিদিশার গায়ে।

কুন্তলার বিয়ের কথা পড়ে বিদিশা কিশলয়কে বলেছিল, তোমার বোন তাহলে এদেশেই বাস করতে আসছে?

কিশলয় খবর পেয়েছে সদ্য। চিঠি এসেছিল বাড়ি থেকে। এমন কিছু চিঠিচাপাটির, দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক তাদের বাড়িতে কখনওই নেই। আলেকালে যোগাযোগ, বিজয়া আর নববর্ষে রুটিন একটি চিঠি পাঠানোর মধ্যে ওদের পারিবারিক আদানপ্রদান সীমাবদ্ধ। তার মধ্যেই বাবার লেখা অতিরিক্ত চিঠিটি পড়তে পড়তে ভুরু কুঁচকে উঠেছিল কিশলয়ের। প্রশ্ন নিয়ে তাকিয়েছিল বিদিশা। পড়া শেষ করে কিশলয় অ্যারোগ্রামটা বাড়িয়ে দিয়েছিল বিদিশার দিকে। দ্রুত অথচ মনোযোগ দিয়েই চিঠি শেষ করেছিল বিদিশা। ফেরত দিতে গিয়ে ওই প্রশ্ন।

সঙ্গে সঙ্গে কোনও উত্তর দেয়নি কিশলয়। কিন্তু চিন্তাচ্ছন্ন ভুরু দুটি বাঁকাই ছিল। ভগ্নীর আসন্ন বিবাহের খবরে উৎফুল্ল হওয়ার কোনও চিহ্ন ফুটে ওঠেনি ওর মুখে। বিদিশার আপাতশান্ত প্রশ্নটার মধ্যেও যে তুষ্টির সুর নেই, বরং অপ্রত্যাশার সংশয় মিশে আছে, কিশলয় বুঝেছিল। বুঝেছিল তার কারণ, কেন আর কী জন্য বিদিশার এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রাথমিক প্রশ্ন, সেটা ওর পরিষ্কার জানা ছিল।

মাথায় ভাবনা রেখেই কিশলয় উত্তর দিয়েছিল, বাবার চিঠি পড়ে তো তাই মনে হচ্ছে। তবে...।

আবার তবে কী!

মানে.. বিয়ের কথাবার্তা হয়েছে ঠিকই.. এখনও মাস দুয়েক দেরি আছে।

মাস দুয়েক সময়টা আর এমন কী! বিদিশা বলেছিল, একটা বিয়ের জোগাড়ের জন্য ওটা তো মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট।

কে জানে তার মধ্যে আবার...।

কিছু হবে না। পড়লে না, ছেলের বাবা-মা গিয়েছিলেন আগে। এবার ছেলে একা গিয়ে, দেখে, সব কথাবার্তা ফাইনাল করে এসেছে।

হুঁ— বলতে বলতে মাথা নেড়েছিল কিশলয়। তারপর নিজের মধ্যে যেন কিছুটা সমর্থন পাওয়ার আশায় বলেছিল, ছেলে নিজে গিয়ে, দেখে যখন ঠিকঠাক করে এসেছে, তার মানে কুন্তলাকে পছন্দই হয়েছে। তারপর আর কী বলার আছে!

ছেলেকে কোলে তুলে নিতে নিতে আড়চোখে তাকিয়েছিল বিদিশা কিশলয়ের দিকে। বলেছিল, কুন্তলা তোমার বোন হলেও, ওর সম্বন্ধে বলার যে কিছু আছে, সেটা তো তোমার বিব্রত মুখ দেখেই মনে হচ্ছে। ঠিক না কথাটা? বাবার চিঠিতে তার কোনও উল্লেখ নেই কিন্তু।

বলার আছে মানে... মনে মনে যুক্তিসংগত কিছু একটা যেন হাতড়াচ্ছিল কিশলয়। বলল, ও একটু অ্যাবরাপ্ট আর খামখেয়ালি গোছের ছিল, কিন্তু বছর চারেকের মধ্যে আমরাই বা আর কতটুকু দেখেছি ওকে! মে বি শি ইজ চেঞ্জড নাউ।

বিদিশা বলল, তোমার পরীক্ষার আগে দেশ থেকে ঘুরে এলাম। কোথায়, কিছু চেঞ্জ হয়েছে বলে তো মনে হল না! সেই একইরকম... আত্মকেন্দ্রিক, কেয়ারলেস, বেপরোয়া-উদ্ধতভাব, কথাবার্তায় পোলাইটনেস নেই, ও যা বলবে তাই করতে হবে...।

বিদিশার কথার মধ্যেই কিশলয় বলল, বুঝলাম, কিন্তু এক একজন মানুষের মেন্টাল প্যাটার্ন তো এক একরকম হয়ই।

কিন্তু কুন্তলা তো নরম্যাল নয়। শি ইজ আ সাইকিয়াট্রিক কেস।

কী বলছ! ও পাগল?

সাইকিয়াট্রিক কেস মানেই যে তারা পাগল, তা তো নয়! তা আমি বলবই বা কেন?

তাহলে? একটু ভেবে নিয়ে কিশলয় বলে, কুন্তলাকে দেখতে শুনতে খারাপ না, পড়াশুনাও করছে। কারও মাথার গণ্ডগোল থাকলে সে একটা সায়ান্স সাবজেক্ট নিয়ে এম এসসি পড়তে পারে? তোমাকে তো পজিটিভ দিকগুলোও ভাবতে হবে। নেচারের প্রবলেম তো মানুষের থাকতেই পারে। আবার ঠিকও হয়ে যায়।

কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের সেগুলো একটু জানানোও উচিত। অ্যাটলিস্ট হিন্ট দেওয়া উচিত।

কী ভাবে?

সেটা তাঁদেরই ঠিক করা উচিত, যাঁরা মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন।

তুমি সমস্যাটাকে বেশি বড় করে দেখছ। বাড়িতে কারও অত তেমন মনে হয় না তো!

মনে হয় না তার কারণ... এখন কে-ই বা বাড়িতে ওকে রেকটিফাই করার চেষ্টা করবে। একটু থেমে বিদিশা বলল, একটা কথা বলব, যদি কিছু না মনে করো?

বল, না বলার কী আছে?

তোমাদের বাড়িতে যে বাঁকা পথে অনেক টাকা আসে... কোরাপটেড পরিবেশ, মারামারি, পলিটিকস...।

প্লিজ, তুমি আমাকে অনেক বার বলার চেষ্টা করেছ এসবগুলো।

সেটা মিথ্যে তো নয়। তোমার বাবার পুলিশের চাকরি, তোমার দাদার পার্টি করা, মোটর ভেহিকলস-এর কাজ, এমনকী কাকারও নর্থবেঙ্গল থেকে কাঠের আমদানি.. কুন্তলা তো এসব দেখতে দেখতেই বড় হয়েছে— সব কিছুতে কোরাপশন—

আমরা সবাই ওই বাড়ি থেকে বড় হয়েছি।

সেটা কি খুব হেলদি পরিবেশ? তুমি মোটামুটি হস্টেলে মানুষ। দিদির সংসারে সমস্যা হয় তুমি জানো, দাদার কথা আর তুলছি না। কুন্তলাই সব থেকে বেশি ওই এনভায়রনমেন্টে বড় হয়েছে। তার কি

কোনও এফেক্ট নেই?

তুমি কী সাজেস্ট করছ বলো তো?

আমি সাজেস্ট করার কে! কিন্তু কুন্তলাকে নিয়ে যে বাড়িতে সমস্যা হয়, হয়েছে... শুনেছিলাম কিছু থেরাপি-টেরাপিও হয়েছিল... এসবের একটা আন্দাজ দেওয়া উচিত বিয়ে-থাওয়ার আগে। তারা তো কিছুই জানে না, ওপর ওপর দেখে পছন্দ করেছে।

তার মধ্যেও তো একটা অ্যাসেসমেন্ট করেছেন তাঁরা। বাড়িতে গিয়েছেন, কথাবার্তা বলেছেন।

বছর পনেরোর ওপর যাঁরা এদেশে রয়েছেন, তাঁদের পক্ষে কি...?

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি যেন ওদের পক্ষ নিয়েই ব্যাপারটা বেশি ভাবছ। কুন্তলা তোমারও তো ননদ।

একটু ভাবতে ভাবতে বিদিশা বলে, আসলে আমিও তো অন্য ফ্যামিলির মেয়ে! শ্বশুরবাড়ির কতটুকুই বা দেখেছি। যা জানার বোঝার তোমার কাছ থেকেই অধিকাংশটা জেনেছি। ওঁদের দিকটা আমার একটু মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

কিশলয় বলেছিল, বিয়ে হওয়ার পরে অন্যরকম পরিবেশ, লোকজনদের সঙ্গে... ও কি আর সেরকমই থাকবে!

না-হলে কিন্তু তোমার একটা মরাল রেসপনসিবিলিটি থেকে যাবে।

কেন? কিশলয় ঘুরে তাকিয়েছিল বিদিশার দিকে। আমি কি বিয়ে দিচ্ছি? নাকি ঘটকালি করেছি?

বিদিশা বলেছিল, আমি জানি, ওঁরা কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখেই ইনিশিয়ালি ঠিক করেছিলেন, পরে দেখেও এসেছেন। তাহলেও তুমি এদেশে থাকো... এমন একটা কিছু দূরেও না। তার চেয়ে বড় কথা তুমি কুন্তলার দাদা, ডাক্তার।

তুমি কী বলছ, আমি তাহলে এখন ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, বোনের স্বভাব চরিত্রের ফিরিস্তি দেব?

সে ভাবে বলছি না..। বিদিশা নিজেও যেন পরামর্শ দিতে গিয়ে ইতস্তত করে। তারপর বলে, বাবা তো চিঠিতেই লিখেছেন তোমাকে

ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কথা বলতে। একদিন যাও তাহলে, আলাপ পরিচয় করে এসো। কথা প্রসঙ্গে যদি কিছু..।

যদি কিছু কী? বলব আমার বোন খ্যাপাটে? বদরাগী? এক্সেন্ট্রিক?

হয়তো কিছুই স্পেসিফিক্যালি তোমায় বলতে হবে না। আলাপ-পরিচয় আর কথা প্রসঙ্গে ওঁরাই তোমার কাছ্ থেকে যা যা জানার জেনে নেবেন। তা ছাড়া এদেশে বড় হওয়া ছেলের স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে তোমাদেরও তো ডিটেল জানা উচিত।

সেসব খোঁজখবর বাবা ভাল করে আগেই নিয়েছে। পুলিশ অফিসার তো!

বিদিশা মন্তব্য করল না।

একটু পরে বিদিশা বলল, তার মানে পাত্রটা যাতে হাতছাড়া না হয়ে যায়, সেইজন্যই বোধহয়...তোমাকে যোগাযোগ করতে বলেছেন।

কথাটা এড়াবার ভঙ্গিতে কিশলয় বলেছিল, আমাদের বাড়ির ব্যাপারে তুমি একটু বেশি ক্রিটিক্যাল। কিন্তু যে কোরাপশনের কথা তুমি আমাদের ফ্যামিলি সম্বন্ধে বলছ... অমন পরিবেশে আরও কত ছেলেমেয়ে দেশে মানুষ হচ্ছে বলো তো?

তার মানে? দেশের ছেলেমেয়েরা ভাল পরিবেশে মানুষ হচ্ছে না কোথাও? ওরকমটাই নরম্যাল?

তা বলছি না। কিন্তু কোরাপশনের ডেফিনিশনটা এক একজনের কাছে এক একরকম। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা... কুন্তলা তো আর কোরাপটেড মেয়ে নয়!

কিছুক্ষণ একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে বিদিশা একটা শ্বাস ফেলে বলেছিল, নাহ, ও ওই ফ্যামিলির শিকার।...কিন্তু যে ফ্যামিলিটার সঙ্গে এদেশে সম্বন্ধ হচ্ছে, তাদের মানসিকতার সঙ্গে না মিললে— তখন?

বিয়ের পরে সব মেয়েদেরই নতুন ফ্যামিলিতে মানিয়ে নিতে হয়। কিশলয় বলেছিল। সকলের তো তোমার মতন সুযোগ ঘটে না।

বিদিশা আস্তে আস্তে বলেছিল, না ঘটলে, আমি কতখানি মানিয়ে নিতে পারতাম...তা আর কে জানে!

কিশলয়-বিদিশার ঘরোয়া কথাবার্তা আর খুব বেশি গড়ায়নি। ফলাফলও এমন কিছু প্রভাবিত হয়নি। সুতরাং পরিবর্তনের কোনও প্রশ্ন ছিল না। দেবমাল্যদের বাড়িতে কিশলয়ের যাওয়া হয়নি, ওদের বিয়ের আগে। একটা সচেতন নেতিবাচক মন কাজ করেছিল কি তখন কিশলয়ের মনে! হতেও পারে।

বিদিশার মন্তব্য কিংবা সমালোচনার পিছনে যে একটা বাস্তববোধ ছিল কিশলয় তা জানত। আপাতত যেহেতু ওরাও এদেশে থাকে এবং বিয়ের পরে কুন্তলাও এদেশে থাকবে, সুতরাং যোগাযোগ একটা থাকবেই। সেটা স্বাভাবিক যেমন, তেমনই প্রবাসে একটি অতিরিক্ত প্রাপ্তিও বটে। কিন্তু বিদিশার ইঙ্গিত ছিল আর একটা বিপরীত সম্ভাবনার প্রতিও। ও মোটামুটি নিশ্চিত ছিল, কুন্তলার বিয়ে দিতে গিয়ে, পাত্রপক্ষের কাছে কোথাও একটু গোপনীয়তা রক্ষা করা হচ্ছে। এবং সেটা ও কুন্তলাকে দেখেছে এবং জানে বলেই। কিন্তু যদি কুন্তলার আচরণজনিত কারণে পরে কোনও সমস্যা দেখা দেয়, অবশ্যই তার একটা ঢেউ এসে পড়বে কিশলয়-বিদিশাদের ওপরেও। হয়তো কলকাতার তুলনায় সে ঢেউ-এর উচ্ছ্বাস এবং প্রভাব ওদের ওপরেই বেশি পড়বে। তখন কিশলয় কি সম্পূর্ণ তার দায় এড়াতে পারবে!

সবটাই যদি-র প্রশ্ন। নিজের মধ্যে একটা ইতিবাচক সম্ভাবনাকেই ধরে রাখতে চেয়েছিল কিশলয়। বিদিশার মনে একটা খিঁচ ছিল।

কিছুটা ব্যস্ততা আর ভবিষ্যৎ চিন্তাও তখন ক্রিয়াশীল ছিল কিশলয়ের মধ্যে। একটানা দু বছরের ওপর দেশে যাওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে অন্তত দুটি ঘটনার বিশেষ গুরুত্ব আছে। এক, পরীক্ষায় পাশ করা, দুই, তাদের একটি পুত্রসন্তান লাভ। বোনের বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়া এবং তোড়জোড় আর একটা কারণ তো বটেই। কিন্তু এ সবের ওপরেই কিশলয় যে-ব্যাপারটা বেশি ভাবছিল, সেটা তার নিজস্ব ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে প্রাথমিক আয়োজন এবং একটি স্বচ্ছ ধারণা এবার সে নিয়ে আসবে।

আজ প্রায় দু বছর পরেও কিশলয় ভাবছে, দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে এখনও তার ধারণা কি স্বচ্ছ?

সময় বসে থাকছে না। বসে থাকছে না বয়েসও।

তিন বছরের মেয়ে এদেশে এসেছিল, নয় পেরিয়ে গেছে। মেড-ইন-ইংল্যান্ড ছেলে আড়াই হতে চলল। আটত্রিশ হয়ে গেছে তার নিজেরও। একটি নিশ্চিন্ত গোছের মাঝারি সরকারি হাসপাতালের কাজে সে বহাল। এদেশে বসবাসের নিয়মকানুন অনুযায়ী আপাতত কিশলয় যে পর্বে এসে পৌঁছেছে, তাইতে স্থায়ী বাসিন্দার তকমা সে পেতেই পারে, এমনকী নাগরিকত্বও কিছু দিন পরে।

দেশে ফেরা, না-ফেরার ব্যাপারে বিদিশার একটি আপাত নির্লিপ্ত ভাব থাকলেও, পাল্লা কোন দিকে ভারী কিশলয় বুঝতে পারে। আবার এটাও জানে, দেড় বা পৌনে দু বছর ধরে কুন্তলার এদেশে এবং মোটামুটি কাছে বসবাস, ওকে কিছুটা উদ্বেগেও রেখেছে। অস্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি থেকে কিশলয় নিজেও কি পুরোপুরি মুক্ত?

দেবমাল্যদের সঙ্গে আপাতত কুটুম্বিতার যোগাযোগ বলতে কিশলয়-বিদিশাদের। বিয়ে হওয়ার মাস তিনেকের মধ্যে কুন্তলা ইংল্যান্ডে চলে এসেছে, তাও আজ দেড় বছর হল। খুব বেশি না হলেও এর মধ্যে তিন-চারবার ওঁদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। একবার দেবতোষ-নির্মলাও ইকেনহাম-এর বাড়িতে ঘুরে গেছেন। কিশলয়রা গেছে ওঁদের ব্যাসিলডন-এর বাড়িতে, দেবমাল্যর বিলারিকের ফ্ল্যাটেও। আর এই যাতায়াতের মধ্যে দিয়ে একটা ব্যাপার অন্তত কিশলয় বুঝেছে, পারিবারিক ভাবে দেবতোষরা কিছুটা নির্ঝঞ্ঝাট, মধ্যবিত্ত, নিরীহগোছের মানুষ। সাতে পাঁচে থাকেন না। ফুটানি নেই, খুব বেশি উচ্চাশা নেই, অথচ সচ্ছল শান্তিপূর্ণ পরিবার।

কিন্তু এমন একটা পরিবারেই পুত্রবধূ হয়ে এসে, কুন্তলা কি বেশ মানিয়ে-গুনিয়ে সবাইকে আপন করে নিয়ে রয়েছে?

না-থাকার যে-কোনও কারণ নেই, কিশলয় নিশ্চয়ই তা বোঝে। ও জানে, দেবতোষ-নির্মলার কোনও চাহিদা নেই ছেলে এবং ছেলের

বউ-এর কাছে। নিজেরা যেমন জীবনযাপন করেন, সেই অনুপাতে সচ্ছলতা এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে অবসরও নিয়েছেন। আত্মনির্ভরশীল শিক্ষিত ছেলে দেবমাল্যও। ভাল কাজ করে, মাঝেমধ্যে বিদেশ-টিদেশেও যায় কর্মসূত্রে। এর মধ্যে কুন্তলাকেও সঙ্গে নিয়ে বেলজিয়াম-ফ্রান্স-জার্মানি ঘুরে এসেছে।

অথচ এই সব কিছু সত্ত্বেও, দেবমাল্যদের পরিবারে কুন্তলাকে নিয়ে যে অসন্তোষ আর অশান্তির মেঘ ঘনিয়ে উঠেছে, বিদিশার মতন কিশলয়েরও তা না বোঝার কিছু নেই। আর পিছনের কারণ যে সম্পূর্ণভাবেই কুন্তলার আচার-ব্যবহার চাহিদা মানসিকতা, বেয়াড়া উন্নাসিকতা... মুখে এবং প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও কিশলয়ই তা সব থেকে ভাল জানে। কুন্তলা বয়েসে ওর থেকে বেশ কিছুটা ছোট হলেও বোনকে চেনে কিশলয়।

দেবমাল্যদের বাড়ি থেকে অবশ্য এখনও কেউ তেমন মুখ খোলেননি, অভিযোগও করেননি। একমাত্র বিগত কয়েক মাসে, হুটহাট কুন্তলার একা একা ইকেনহাম-এ চলে আসার পরে, দেবমাল্য টেলিফোন করে খবর নিয়েছে এবং তাইতেই অনিবার্য মন কষাকষির ইঙ্গিত দিয়ে ফেলেছে। তাও বোধহয় নেহাত থাকতে না পেরে এবং বিদেশবিভুঁই-এ কিছুটা দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের বশবর্তী হয়ে। দেবতোষ-নির্মলা এমনকী কোনও ইঙ্গিতও দেননি এ পর্যন্ত।

চাপা অন্যায়বোধের সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে এক ধরনের সম্ভাব্য ঝামেলা অশান্তিরও আশঙ্কা করে কিশলয়। অথচ সোচ্চার হওয়ার উপায় নেই। কুন্তলার সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করবে সেটা সম্ভব না। ওর ভূমিকা নিয়ে বিদিশার সঙ্গে আলোচনা করতেও বাধো-বাধো ঠেকে। কলকাতা থেকে বাড়ির লোকেরা প্রথম কয়েক মাসের পর থেকে যে একটু একটু করে নির্লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে, কিশলয় তা বোঝে। এমনিতেও বেশ একটা পারিবারিক বাঁধন না থাকলে, দেশের মানুষরা ক্রমশ বিদেশে থাকা আত্মীয়স্বজনদের ভুলে যেতেই অভ্যস্ত হন, একমাত্র তেমন কোনও প্রয়োজন উপস্থিত না হলে। নিজের অবস্থা কিছুটা ত্রিশঙ্কুগোছের মনে হয় কিশলয়ের।

তার মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও ফেলে রাখা যায় না আর। দেশে ফিরতে গেলে এর পরে আর হবে না। ডাক্তারি করার পরিবেশ এবং পরিস্থিতি দেশে অথবা কলকাতায় সুবিধের নয়, প্রতিযোগিতাও খুব তীব্র কিশলয় জানে। তা সত্ত্বেও কিছুটা অবলম্বন ও হয়তো পাবে। বাবা এবং দাদার প্রভাবে একটা শুরু করার মতন ঠাঁই ওর জুটে যাবে। সম্প্রতি অবসর নিলেও, পুলিশ মহলে দিবাকর রায়ের পরিচিতি এখনও নিশ্চয়ই মুছে যায়নি। আর একচ্ছত্র রাজনৈতিক দলের স্থানীয় 'দাদা' হিসেবে কাঞ্চন রায়কে পার্টি ঘাঁটায় না তার জঙ্গি ভূমিকার জন্যই। এখনকার দেশীয় রাজনীতিতে শ্রদ্ধেয়র চেয়ে শক্তিমানেরই তো কদর বেশি।

কিন্তু কিশলয়ের এই সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে বিদিশারও নিশ্চয়ই বক্তব্য আছে। অথচ সাংসারিক ভূমিকা পালন করেও, ও যে একটা সূক্ষ্ম দূরত্ব বজায় রেখে চলে, একমাত্র কিশলয়ই সব থেকে ভাল সেটা টের পায়।

বছর তিনেক আগে বিদিশার বাবা প্রয়াত হয়েছেন। পানিহাটির বাড়িতে মা আছেন। যদিও এখন তা দাদার সংসার কিন্তু মা সেখানে খুবই ভাল আছেন বিদিশা জানে। দুই মেয়ে দাদার। এমন কিছু বড় হয়নি এখনও, কিন্তু দুজনেই সুশ্রী এবং লেখাপড়ায় নাকি খুবই মেধাবী দুই বোন। বউদি সোদপুরের একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের অ্যাকাউন্ট্যান্ট, দাদা ব্যাঙ্কে চাকরি করে।

কিশলয় জানে, ওদের দুই বাড়ির মধ্যে কোনও দিনই তেমন গাঢ় আত্মীয়তা গড়ে ওঠেনি। তা না উঠুক কিন্তু এবার একটা পাকাপাকি বন্দোবস্তর জন্য বিদিশার সঙ্গে কথা বলা জরুরি হয়ে পড়েছে, সেটা কিছুদিন ধরেই মনে হচ্ছে কিশলয়ের।

ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে আগেই। একটু আগে মেয়েও শুয়ে পড়েছে তার ঘরে গিয়ে। খাওয়াদাওয়ার পরে দিনের মধ্যে এই সময়টুকুই যা কথাবার্তা বলার সুযোগ। মাঝেমাঝে একটু বেশি রাত পর্যন্ত টেলিভিশন দেখে বিদিশা। কিশলয় শুয়ে পড়ে। সকালে মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে ওকে

হাসপাতালে ঢুকতে হয় নটার মধ্যে। নিয়মমতো নাইট অনকলও করতে হয়।

বসার ঘরে ঢুকতে আজ বিদিশাই জিজ্ঞেস করল কিশলয়কে, তুমি কি শুয়ে পড়ছ?

ঘরের মধ্যে ধূমপানের নিয়ম প্রায় উঠে গেছে এদেশে। কিশলয় নিয়মিত ধূমপান করেও না। মাঝেমধ্যে সিগার ধরায়, যাকে বলে একটু রিল্যাক্স করার জন্য। সেটাও আজ নিভিয়ে, বাইরে ফেলে ঘরে এসেছিল। সোফায় বসতে বসতে বলল, নাহ কাল অত তাড়া নেই। তিন্নিরও হাফটার্ম চলছে, ধীরেসুস্থে যাব। রিমোট কন্ট্রোলে টেলিভিশনের শব্দ কমাতে কমাতে বিদিশা বলল, শনিবার কুন্তলা এসেছিল তোমায় তো বললাম।

হ্যাঁ, বলেছ। সোফার ওপর পা তুলে বসল কিশলয়। বলল, ডিটেলস কিছু শোনা হয়নি।

প্রতি পাঁচটার পরে একটা উইকএন্ড, অর্থাৎ শনি-রবি, হাসপাতালে অনকল থাকে কিশলয়। তিন দিন আগে ওর সেই উইকএন্ড অনকল ছিল। সেদিনই দুপুরে কুন্তলা এসেছিল এ বাড়িতে। এটা অবশ্য ওদের বাড়ি নয়, হাসপাতালের ভাড়া করা ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স। খাট আলমারি সোফা থেকে শুরু করে ফ্রিজ আভেন কুকার মায় অধিকাংশ বাসনপত্রও সব হাসপাতালের। সাড়ে চারশো পাউন্ড ভাড়া মাসে। দেশে ফিরে যাবে, কি যাবে না, এই অনিশ্চয়তার মধ্যে এখনও বাড়ি কেনেনি কিশলয়। অথচ একটা কিছু ঠিক করে ফেললে, বাড়ি কেনা, না-কেনার দ্বন্দ্বটাও থাকত না। আর কিনতেই যদি হয়, তা হলে ভাড়ার টাকাটা অন্তত মাসে মাসে মর্টগেজ শোধের কাজে লাগে। ভাবছিল, এসব নিয়ে কথা বলবে। কিন্তু বুঝতে পারে, বিদিশা কুন্তলার গত শনিবার আসা এবং ওর প্রসঙ্গেই কিছু কথা বলতে চায়। অপেক্ষা করল কিশলয়।

বিদিশা বলল, তোমার বিজি অনকল ছিল, তাই ওসব কথা আর তুলিনি।

কিশলয় জিজ্ঞেস করল, দেবমাল্য এসেছিল পরে? নাকি... কুন্তলা একাই আবার...?

ওকে শেষ করতে না দিয়ে বিদিশা বলল, দেবমাল্য যদি আসত, তা হলে তো সব ব্যাপারটা ঠিকই ছিল। কিন্তু এবারই দেখলাম, ও তো আসেইনি, সারাদিনের মধ্যে একবার টেলিফোনও করেনি। এমনকী এবার মাসিমা-মেসোমশাইও কোনও খোঁজ নেননি।

কতক্ষণ ছিল কুন্তলা?

একটা নাগাদ এল, শুয়ে-বসে টিভি দেখে কাটাল। সন্ধেবেলা হুট করেই আবার চলে গেল।

কোথায়? বিলারিকেই ফিরে গেল?

কী করে জানব?

তুমি জিজ্ঞেস করলে না একবার? উইকএন্ডে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট থাকে না ঠিকমতো, আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনও কম...।

বিদিশা একটু সময় নিয়ে বলল, ওকে কোনও কথা জিজ্ঞেস করা যায়? সাধারণ কথারও ও একটা ব্যাঁকা মানে ধরে। তুমি থাকলে জিজ্ঞেস করলে তবু ঠিক আছে। আমি জিজ্ঞেস করলেই বলত, তোমার সে খোঁজে কী দরকার? আগে এরকম হয়েছে বলেই আমি আর জিজ্ঞেস করি না।... এবার কিন্তু আমার টেনশন হচ্ছে। আমার পক্ষে ডিফিকাল্টও হচ্ছে।

•

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কিশলয় বলল, কেন এসেছিল... মানে কিছু আন্দাজ করতে পারলে? ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে কি না...

আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি। বিদিশা বলল, দুপুরে চিকেন স্যান্ডউইচ আর তরকারি গরম করে খেতে দিয়েছিলাম। খেতে খেতে নিজেই বলল, সন্ধেবেলা নাকি ব্যাসিলডন-এর বাড়িতে যাওয়ার জন্য শ্বশুরমশাই আগের দিন বলে গিয়েছিলেন। ওর সেটা পছন্দ নয়। বক্তব্য হচ্ছে ছুটির দিন সন্ধেবেলা বুড়ো-বুড়ির সঙ্গে বসে ভ্যাজর-ভ্যাজর করব? এদিকে ছেলেও যেতে চায়। তাই সবাইকে একসঙ্গে টাইট দেওয়ার জন্য ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

টাইট দেওয়ার জন্য মানে?

তোমার বোনকেই সে কথা জিজ্ঞেস কোরো।

দেবুর বাবা-মাকে তো সেরকম মনে হয় না, যে ওঁরা সবসময় ওদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখতে চাইবেন।

ওঁরা সেরকম চাইলে, বিয়ের আগে থাকতে ছেলের অন্য বাড়িতে থাকার কথা ভাবতেন না।

কিশলয় বলল, সেই তো। ওঁরা চান নিজেরা স্বাধীন ভাবে থাকবেন, দেবু-কুন্তলাও স্বাধীন ভাবে থাকুক।

তার মানে তো আর যাতায়াত দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া নয়। বিদিশা বলল। তা ছাড়া যেতে না চাইলে কিংবা না পারলে, মেসোমশাইকে সেটা জানিয়ে দেওয়ারই বা অসুবিধে কোথায়?

কী জানি! কিশলয় যেন আতান্তরে পড়ে গেল। একটু পরে বলল, ওঁরা কি বসে বসে খুব জ্ঞান দেন ওদের?

কখনওই ওঁদের সেরকম মনে হয়নি। গলার সুর পালটে বিদিশা আবার বলল, তা ছাড়া কুন্তলাকে তোমার সেরকম মেয়ে বলে কি মনে হয় যে অন্য কেউ কিছু বললে ও বসে বসে শুনবে!

তা হলে ওর সমস্যাটা কী? কোথায়?

এতক্ষণে বিদিশা ঘাড় ফিরিয়ে বেশ ভাল করে তাকাল কিশলয়ের দিকে।

এত দিন পরে জানতে চাইছ ওর সমস্যাটা কী আর কোথায়? সমস্যা যে ওকে নিয়ে আছে, সে কথা তো তোমরা অনেক দিন থেকেই জানতে।

জানতাম মানে...

কিশলয়ের আমতা আমতা ভাব দেখেই বিদিশা বলে, আসলে তোমরা বাড়িসুদ্ধু সবাই জেগে ঘুমোচ্ছিলে। এমনকী বিয়ের আগেও ওর সমস্যা নিয়ে তোমরা কেউ মাথা ঘামাওনি।

সেটা তো... আশা করা গিয়েছিল, বিয়ের পরে অন্য পরিবেশে সেগুলো কেটে যাবে।

কেন সেরকম আশা করা হয়েছিল? যে মেয়ে বাড়িতে নিজের পরিবেশে ঠিক থাকত না, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সে ভোল পালটে ফেলবে, এটা কেমন আশা করা?

তাই তো হয়। দায়দায়িত্ব ঘাড়ে পড়লে তখন বাধ্য হয়েই পালটায়।

এগুলো সব এসকেপিস্ট-এর মতো কথা। আসলে তোমাদের বাড়ি থেকে কেউ কোনও রেসপনসিবিলিটি নিতে চায়নি। বরং সব চুপচাপ চেপে গিয়ে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং দায়িত্বটা ফেলে দেওয়া হয়েছিল শ্বশুরবাড়ির ঘাড়ে। অ্যাজ ইফ বিয়ে তো হয়ে যাক, তারপর...।

তা কেন? ওঁরা তো দেখেশুনেই বিয়ে দিয়েছেন।

হ্যাঁ, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে, আর দু-এক সপ্তাহের জন্য দেশে গিয়ে আলাপ করে এলে, দেখাশোনা কতটা হয়, সেটা তোমার বাড়ির লোকেরা ভালই ক্যালকুলেট করেছিলেন।

কিন্তু নেগোসিয়েশন ম্যারেজে সে রকম চান্স তো সবসময়ই থাকে।

চান্স-এর কথাটা উঠত, যদি তোমরা কেউ না জানতে যে কুন্তলা হ্যাজ মেন্টাল অ্যান্ড বিহেভেরিয়াল প্রবলেম। কিন্তু সেটা তো সত্যি নয়। তোমরা সবাই সেটা জানতে। কলকাতায় সবাই চেপে গেলেও, আমি তোমাকে মনে করিয়েছিলাম, এদেশে কথা প্রসঙ্গে ওঁদের একটু হিন্ট দিতে। কিন্তু তখন তুমিও সেটা এড়িয়ে গিয়েছিলে।

আমি সেইসময় হিন্ট দিলেই বা আর কী লাভ হত!

উত্তেজনা এবং ক্ষোভে একসঙ্গে অনেক কথা এসে যাচ্ছিল বিদিশার। নিজেকে দ্রুত একটু গুছিয়ে নিয়ে বলল, আর কিছু না হোক, ওঁরা একটু ভাববার সুযোগ পেতেন। হয়তো তাইতে বিয়ে আটকাত না, কেননা, একবার মেয়ে পছন্দ হয়ে গেলে সাধারণত বিয়ে বন্ধ হয় না। কিন্তু ওঁরা কিছুটা মেন্টালি প্রিপেয়ারড থাকতেন, এদেশে কোনও সাইকিয়াট্রিস্ট-এর সঙ্গে কথাও বলতে পারতেন—

কিশলয় যেন চমকে উঠে বলল, কেন? সাইকিয়াট্রিস্ট কেন?

বিদিশা সঙ্গে সঙ্গে বলল, দেখছ, তুমি নিজে ডাক্তার হয়েও, কোনও সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখাবার ব্যাপারে কীরকম কুসংস্কারাচ্ছন্ন?

তা-তা নয়। কিন্তু কুন্তলা কি মানসিক রুগি?

শারীরিক ভাবে সুস্থ একটা মানুষ যখন ওরকম সামঞ্জস্যহীন উলটোপালটা কাজ করে, কথা বলে, বিহেভ করে, তখন তাকে আর কী বলবে!

সেটা ওর এক ধরনের অস্থিরতা।

এবং সেটা অ্যাবনরম্যাল, এবং মানসিক। তার জন্য চিকিৎসা কিংবা অ্যাডভাইস সাইকিয়াট্রিস্ট ছাড়া আর কে দেবে? অথচ আনফরচুনেটলি, আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ সাইকিয়াট্রিস্ট-এর কাছে দেখাতে যাওয়াটাকে একটা নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখে। তুমিও দেখছ। যেন সাইকিয়াট্রিস্ট-এর কাছে কাউকে দেখাতে নিয়ে যাওয়া মানেই, তার একটা পাগল বলে ছাপ পড়ে গেল। এর থেকে বড় অশিক্ষা আর কী!

কিশলয় কথা খুঁজে না পেয়ে বলল, তুমি কী বলছ, কুন্তলার মাথার দোষ আছে?

আমি কেন বলব? বিদিশা তাকাল ওর দিকে। বলল, সেটাও দরকার হলে সাইকিয়াট্রিস্ট-ই বলবেন।

কিন্তু ওর তো আর সব সেন্স, ইন্টেলিজেন্স, ওরিয়েন্টেশন... সবই ঠিক আছে।

ওপর ওপর সব তো ঠিকই আছে। কিন্তু কোথাও কিছু গণ্ডগোল আছে সেটাও কি অস্বীকার করা যায়? তা নইলে অনেক আগেই কলকাতায় ওকে কীসব থেরাপি-টেরাপি করানো হয়েছিল কেন?

সেটা জাস্ট... ওর মুড-টুডগুলো যাতে ঠিক থাকে—।

আসলে তোমরা কখনওই তলিয়ে ভাবোনি। সবাই চোখ বুজে ছিলে। আর ওপর থেকে যখন কিছু মনে হয় না, বোঝা যায় না, তখন যা হোক করে একটা বিয়ে দিয়ে ফেলতে পারলেই নিশ্চিন্ত। এনিওয়ঁে—।

কিশলয় ইতস্তত করে বলল, না... নিশ্চিন্তই বা হওয়া যাচ্ছে কোথায়!

আর একটা কথা কী জানো... বিদিশা নিজের কথার টানেই বলে চলল, দেবমাল্য, মাসিমা, মেসোমশায়ের কাছে... এমনকী পরে পরেও

যদি তোমরা একটু আধটু বলতে, তাহলে ওঁরা তোমাদের ফ্রড কিংবা ডিসঅনেস্ট ভাবতেন না।

কক্ষনও না। সেটা কখনওই ওঁদের ভাবা উচিত নয়।

সেটা তুমি বলছ... নিজের বোন, নিজের ফ্যামিলিকে কভার করার জন্য। কিন্তু অন্য একটা ফ্যামিলি থেকে আসা মানুষ হিসেবে আমি বলছি, ওঁদের কোনও দোষ দেওয়া যায় না।

কিছুটা যেন ঝিমিয়ে পড়ল কিশলয়। বিদিশা যে শুধু কুন্তলার কথা জানাচ্ছে তাই নয়, একই সঙ্গে অভিযুক্ত করছে ওকে এবং ওদের পরিবারকেও। আর করছে এই কারণে যে কুন্তলার বিবাহোত্তর যে পরিস্থিতি, তার ঝাপটা এসে লাগছে ওদের সংসারেও। অস্বীকারও করা যাচ্ছে না, এমন যে হতে পারে তার ইঙ্গিত দিয়েছিল বিদিশা কুন্তলার বিয়ের আয়োজনের সময়েই। একটা শীতল উৎকণ্ঠা অনুভূত হচ্ছে কিশলয়ের। বিদিশা কখনওই একটানা কুন্তলার এমন ইচ্ছামতো যাতায়াত এবং পরোক্ষভাবে সমর্থন পাওয়ার প্রচেষ্টা বরদাস্ত করবে না। কুন্তলার শ্বশুরবাড়িতে অবস্থার যদি অবনতি হয়, অদূর ভবিষ্যতে কিশলয়ের ভূমিকাই বা কী দাঁড়াবে! এদিকে দেশে ফিরে যাওয়া, নাকি বিদেশে থেকে যাওয়া, এই দোদুল্যমান মানসিকতা থেকেও উদ্ধার পাওয়া যাচ্ছে না।

হঠাৎ খেয়াল হয় কিশলয়ের অক্টোবরের শেষ দিক থেকে একঘণ্টা সময় পিছিয়ে গেছে এবং সেই হিসেবে এখন সময় রাত সাড়ে দশটা নয়, সাড়ে নটা।

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কিশলয়।

একটা টেলিফোন করে দেবমাল্যর সঙ্গে কথা বলার পক্ষে সাড়ে নটা কি খুব বেশি রাত!

হ্যান্ডসেট তুলে নিয়ে পাশের ঘরে গেল কিশলয়।

দেবতোষ যে ঠিক কাজ-পাগল মানুষ, তা নয়। কিন্তু তিনি উদ্যমী আর কর্মঠ পুরুষ।

প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠার পরে তাঁর কতকগুলো রুটিন কাজ থাকে। দেশে যত দিন ছিলেন, তখনও থাকত। কিন্তু এখন সেই রুটিনের পরিবর্তন হয়েছে প্রয়োজনের নিরিখে। দেশে হাতমুখ ধোওয়া, চা খাওয়া, বাথরুমের পরেই থাকত ছোট-বড় দুটি ব্যাগ নিয়ে বাজার যাওয়া। ছোটটি মাছ-মাংসের জন্য, বড়টা আনাজ তরকারির। অবশ্য প্রতিদিন বাজারে যাওয়াটা যত না কেনাকাটার জন্য, তার সঙ্গে সামাজিকতা, দুদণ্ড কারওর সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলা, পত্র-পত্রিকার স্টল-এ এক আধটা কেনা আর দু-চারটে উলটেপালটে দেখা, এসবও মিশে থাকত। বাজারে গেলেই যেন দেশের প্রাত্যহিক পরিস্থিতির একটা প্রতিফলন টের পাওয়া যেত। তা ছাড়া বিভিন্ন দোকানি-ফড়িয়া-ব্যাপারিদের সঙ্গেও একটা সম্পর্ক ছিল। দু-চার দিন অনুপস্থিত হলেই এ-ও-সে খোঁজ নিত, দাদাকে কয়েক দিন দেখিনি মনে হচ্ছে! এমন আন্তরিকতায় নিজের দেশে ছাড়া আর কোথাও কেউ বাজে না।

আজ এত বছর পরেও ওই আন্তরিকতার অভাবটুকু খুব অনুভব করেন দেবতোষ।

আবার অন্য এক ধরনের সম্পর্ক এদেশেও যে গড়ে ওঠেনি তা নয়। চেনাজানা হয়ে গেছে মিল্কম্যানের সঙ্গে, পোস্টম্যান-এর সঙ্গে, উইন্ডো ক্লিনার-এর সঙ্গে। ব্যস্ততার মধ্যে সবাই দেশের তুলনায় বেশি গতিতে ছুটলেও, কিছু বাক্য বিনিময় হয়, সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতাও যে হয় না, তা নয়। এদের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়ে যায় অনেকের সঙ্গে। অন্য দেশে, অন্য আবহাওয়া-সংস্কৃতির মধ্যে থাকলেও দেবতোষের মনে হয়, সব দেশে, সব কালে মানুষে-মানুষে একধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়ই। বিশেষ করে সাধারণ মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া, আনন্দ-হতাশা-ব্যর্থতা-বেদনা-প্রাপ্তি... সবের মধ্যে একটা সাযুজ্য আছে।

মানুষমাত্রই জীবনযাপনের ক্ষেত্রে এসবের মধ্যে দিয়ে যায়। হয়তো ঠোকাঠুকি লাগে, সরে সরে থাকে, আবার কাছেও এসে যায়। প্রথম প্রথম ইংল্যান্ডে এসে যেমন মনে হত, এরা সব সাদা রঙের সাহেব-মেম, আর আমরা সব 'কালুয়া', ওরা আমাদের ভাল চোখে দেখে না, আমরাও যেন সুযোগ পেলে ওদের সমালোচনা করতে ছাড়ি না, কবে থেকে চোখ মন এসব পার্থক্যগুলোকে কি মুছে দেয়নি! ওরা আর আমরা, ওদের আর আমাদের বিভেদগুলো মুছে গেল একটু একটু করে। কিংবা সয়ে গেল।

হ্যাঁ, নাড়ির টান বলে তা সত্ত্বেও একটা ব্যাপার থেকে যায়। কিন্তু সে টান তো নিজের দেশেও ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্য প্রদেশে কাজ করতে গেলে অনুভূত হয়। আর এমনও নয় যে ইচ্ছে করলেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটে চলে যাওয়া যায়। এদেশ থেকে বাড়ি যাওয়ার মতোই, ভারতের মধ্যে অন্য দূরের জায়গায় কাজ করলে, আয়োজন তো সেই একইরকম। ছুটি নেওয়া-রিজার্ভেশন-বাক্স গোছানো-ফেলে যাওয়া বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা-প্রতিবেশীকে হাত নেড়ে যাওয়া। এখানেও তাই। বরং ইদানীং দেবতোষের মনে হয়, এ দেশটায় জীবনযাপনের মধ্যে একটা ছন্দ আছে, নিয়ম আর ডিসিপ্লিন আছে! কলকাতায় গিয়ে যেন পদে পদে একটা অনিশ্চয়তার ভাব টের পান। হঠাৎ ট্রেন বন্ধ হয়ে যেতে পারে, এয়ারপোর্টে পৌঁছেই দেখলেন হয়তো সেদিন ট্যাক্সি ধর্মঘট, ব্যাঙ্ক-এ গিয়ে শুনলেন কর্মীদের আংশিক কর্মবিরতি, হাসপাতালে জরুরি বিভাগ ছাড়া রুগি ভর্তি বন্ধ, চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা আন্দোলন করছেন। স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। শিক্ষক বদলি রদ করার দাবিতে বিক্ষোভ হচ্ছে, এমনকী থানায় ধর্মঘট, ঘেরাও। কেন? পুলিশ ছিনতাইকারী মস্তানকে গ্রেপ্তার করেছে।

আবার কোনও কারণ, উপলক্ষ ছাড়াও হয়রানি পোয়াতে হয়। বছর দুয়েক আগে রাইটার্স থেকে নিজের আগেকার কাজকর্মের কিছু নথিপত্র আনতে গিয়েছিলেন দেবতোষ। খোঁজখবর নিয়েই গিয়েছিলেন। কার

কাছে যেতে হবে, তিনি বদলি হয়ে গেছেন কিনা, ছুটিতে আছেন কিনা— এসবও জেনে গিয়েছিলেন। বজ্রআঁটুনি আর ফস্কা গেরো-র ফ্যাস্তাকল পেরিয়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছেও কাজ হল না। ভদ্রলোক টেবিলে নেই। অপেক্ষা করলেন। আসছেন না। পাশের টেবিলের কলিগকে জিজ্ঞেস করলেন, অমুকবাবু কখন আসবেন কাইন্ডলি যদি...। উনি এসেছেন তো! না... মানে কখন পেতে পারি...। কলিগ এক ঝলক দেখে নিয়ে, উনি একটু কাজে বেরিয়েছেন। দেবতোষের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল, উনি এখানে কাজ করেন না? কলিগ আড়চোখে তাকিয়ে, এখানে কাজ করলেই কি বাকি সব কাজ মিটে যায়? অন্য দিন আসুন।

না, ঠিক এমন নিবিড়-দুর্বিনীত-অনিশ্চিত-অসহায়তার খপ্পরে এদেশে পড়তে হয় না। ভোগান্তির ব্যবস্থা করে একটি নির্লজ্জ পূর্ণচ্ছেদ বসিয়ে দিলেই হাত ধুয়ে ফেলা যাবে না। কৈফিয়ত দিতে হবে, বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। নাগরিক স্বার্থে, অপ্রত্যাশিত, কোনও দুর্ভোগ বা অঘটন ঘটলেও, ন্যূনতম পরিষেবা পাওয়া যে মানবিক অধিকার...। যাক।

প্রাত্যহিক সকালের কাজ সারতে সারতে ভাবনার দিক বদল করলেন দেবতোষ। মনে মনে নিজেকে একটু সমালোচনাও করলেন। এদেশে থাকতে থাকতে কি একটু বেশি অসহিষ্ণু আর ক্রিটিক্যাল হয়ে পড়েছেন নিজের দেশ সম্বন্ধে! হবে হয়তো! কলকাতা থেকে কোনও ব্যাপারে কথায় আর কাজে প্রত্যাশা পূরণ না হলে, এমনধারা ভাবনা মাথায় আসে। একটু আগেই নিয়মিত আটটায় ডাকে আসা চিঠিপত্রগুলোয় চোখ বুলোতে গিয়ে দেখলেন, নাহ্, ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশনের কাগজ আজও আসেনি। মাস কয়েক আগেই এসে যাওয়া কথা। কলকাতা থেকে চিঠিপত্র আসতে সময় তো লাগতেই পারে। অপেক্ষা করেছিলেন অনেক দিন, এল না।

এ দেশে চলে আসার পরেও ভাটপাড়ার বাড়ি রেখে দিয়েছিলেন কয়েক বছর। আস্তে আস্তে বুঝতে পারছিলেন, মফস্‌সলে পাড়ার মধ্যে বাড়ি অমন জনহীন,তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে থাকলে বেশিদিন রাখা যাবে না। জাঠতুতো ভাই প্রবীর সপ্তায় সপ্তায় এসে দেখাশুনা করে যায় বলে

জানেন, কিন্তু কতটা নিয়মিত তাতে সন্দেহ আছে। বছরান্তে একবার গিয়ে দেখেন, পলেস্তারা খসেছে, উই ধরছে, ঝোপজঙ্গলে ভরে উঠেছে বাগান, নিম-জামরুল আর কাঁঠালগাছের ফলমূল তো দূরের কথা, ডালপালাও এ-ও-সে কেটে নিয়ে গেছে। তাই হওয়ার কথা। ক্রমশ অন্য ভয়ও ঢুকল। কবে লাল ঝান্ডা না গেড়ে দিয়ে যায় পার্টির সমাজরক্ষকরা! আবার মনে মনে বলেন, মানুষ যেমন ঘরবাড়িতে থাকতে চায়, ঘরবাড়িও মানুষ চায়। বিক্রি করে দেওয়াই সাব্যস্ত করলেন। স্মৃতি-সেন্টিমেন্ট-উটকো লোকের পরামর্শ, ধান্দাবাজি তো থাকবেই। তবু সিদ্ধান্তটা নিজের অবস্থার বিচারে নিজেই নিয়েছিলেন দেবতোষ। প্রবীরই কিনে নিল। দাঁও মারল বেশ ভালই। তাহলেও জাঠতুতো ভাই, ইচ্ছে করলে কখনও যাওয়া যাবে। খেপে-খেপে টাকাটাও মিটিয়েছিল।

ভাবনা-চিন্তা করে, টাকা জমিয়ে, জায়গা বুঝে শেষ পর্যন্ত কলকাতার ফ্ল্যাট কেনা হল... তাও নয়-নয় করে চার বছর তো পার হয়ে গেল। সবরকম বিবেচনার পরে, লেক গার্ডেন্স আর যোধপুর পার্ক-এর মধ্যবর্তী হরিপদ দত্ত লেন-এর বাড়িটা ঠিক করেছিলেন। বেশি বড় বাড়ি না, চারতলা, আটখানা ফ্ল্যাট, বড় রাস্তা থেকে একটু ভিতরে। আবার হাঁটা রাস্তার মধ্যে আনোয়ার শা রোড, যাদবপুর থানা, উলটোদিকে গল্ফগ্রিন। বাজার-ব্যাঙ্ক-ওষুধের দোকান-পোস্ট অফিস-যানবাহন-গাড়ির গ্যারাজ মোটামুটি আওতার মধ্যে।

আরও দু-একটা কারণ ছিল ওই বাড়িতে ফ্ল্যাট কেনার পিছনে। প্রোমোটার তানাজী ছেলেটা নিজে সিভিল ইঞ্জিনিয়র, পাপিয়ার বরের চেনাজানা। আশা করা যায়, ও বাড়ি 'কুন্ডলিয়া' হবে না। রড-বালি-সিমেন্টের অনুপাত আর পরিমাণটা ঠিক থাকবে। সবই হয়ে গেল, কন্ট্রাক্ট, টাকাপয়সা মেটানো, পছন্দের টাইলস, ফিটিংস। এক লেখিকাসহ অন্য আবাসিক-মালিকরাও ভাল। মধ্যবিত্ত, আলাপি। টিপলুর বিয়ের আগের বছর জিনিসপত্র কেনাকাটা করে তেরাত্তির থেকে এসেছিলেন। পরের বার ভাল করে গোছালেন, যতটা বছরে দু-

তিনমাস থাকার জন্য উপযুক্ত। ছেলের বিয়েও দিলেন ও বাড়ি থেকে। গেল বার আরও কিছু কাজ করিয়েছেন। কোর্টে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, তার নানা ফর্মালিটিজ। কোর্ট-উকিল-সার্চ-দলিল... বেয়াইমশাই লোক ঠিক করে দিলেন। দেবতোষ টাকা জমা দিয়ে এলেন, কাজও হয়ে গেল। শুধু রেজিস্ট্রেশনের কাগজ হাতে আসতে আসতে ফেরার সময় হয়ে গেল। উকিল পার্থসারথি বলেছিল, চিন্তা নেই, টাকা জমা দেওয়ার রিসিট আছে আপনার কাছে... তা ছাড়া আপনার বেয়াই আছেন এখানে, এসব কাগজপত্র তৈরি হতে সময় লাগে। কালেক্ট করে পাঠিয়ে দেব, আপনাকে আর কোনও টাকাপয়সা দিতে হবে না। নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এসেছিলেন দেবতোষ। এখনও সব ঠিকই আছে খবর পান, মাঝেমধ্যে খবর নেন-ও। তাহলেও রেজিস্ট্রেশনের কাজগটাই বা আসবে না কেন! উদ্বেগ নেই, তবু সকালে ডাক আসার পরে একবার মনে পড়ে এবং বিরক্ত বোধ করেন। অন্যান্য কাগজপত্র, চিঠি, এমনকী দেশ পত্রিকাটাও তো ডাকে বেশ নিয়মিত পৌঁছে যায়। তার মানে পাঠিয়ে দিতেই গাফিলতি।

যাকগে, না এলেই বা আর কী করবেন! এমনিতেও কলকাতা যাওয়ার সময় হয়ে আসছে। টিকিটের জন্য দীপ্তি চ্যাটার্জিকে টেলিফোন করতে হবে। একটু শপ-অ্যারাউন্ড করেও দেখতে হবে, কোন এয়ারলাইন্স কেমন দাম চাইছে। সবাই তো ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে দামটা বেশ বাড়িয়ে দেয়। কলকাতা যাওয়ার জন্যই যত ঝামেলা, তিন-চারটের বেশি চয়েস নেই। দিল্লি-মুম্বাইতে গাদাগাদা প্লেন যাচ্ছে, প্যাসেঞ্জারের অভাব নেই। অথচ কলকাতাকে কি পূর্ব ভারতের মুখ্য আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বানানো যেত না। পশ্চিমবঙ্গ-বিহার-ঝাড়খণ্ড-ওড়িশা ছাড়াও অসম-মেঘালয়-মণিপুর-নাগাল্যান্ড, এমনকী সিকিম-ভূটান-নেপাল ভারতের অঙ্গরাজ্য হলেও, সুযোগসুবিধে বাড়ালে যাত্রী কম হত না, ফ্লাইটও বাড়ত, প্রতিযোগিতাও হত। এখনও তো প্রতিবার কলকাতায় নেমে মনে হয় যাত্রীর তুলনায় প্রচুর অবাঞ্ছিত কর্মী, বুকে একটা করে তকমা ঝুলিয়ে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াচ্ছে কত জন। কাজ

নেই, অথচ মুখে একটা সিরিয়াস ভাব করে, পরিচ্ছন্ন আর ঠান্ডা এয়ারপোর্টে এদিক ওদিক যাতায়াত করছে। কটাই বা আন্তর্জাতিক উড়ান বা অবতরণ থাকে কলকাতা থেকে!

যাক বাবা, এসব মনের কথা মনেই থাক। কার্পেটের ওপর ঝিঁঝিপোকার ডাকের মতো হুভার টানতে টানতে দেবতোষ ভাবেন, প্রবাসী লোকজন দেশে গিয়ে, নিজের চোখে পড়া অসঙ্গতির কথা বললে, দেশের লোকেরা খুব ভাল মনে তা নেয় না। যে বলে, মনে মনে তাকে গালাগাল দেয়। ভাবে, শালা বিদেশে থেকে খুব ফুটানি মারছে। নিজে সুখে আছে, এখানে এসে সমালোচনা করছে আর জ্ঞান দিচ্ছে।

অথচ ব্যাপারটা কি সত্যি তাই? প্রবাসীরা সকলে এসকেপিস্ট? হিপোক্রিট? দেশ ছেড়ে বিদেশে থাকা যে এক ধরনের কৃচ্ছ্রসাধনও বটে, এভাবেও কি ভাবা যায় না! এর মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক ভারসাম্য, লেনদেনও কি থাকে না? যারা বিদেশে থাকে, তাদের সকলের কি পলায়নী মনোবৃত্তি? অবশ্য কত জনেরই বা সেই সুযোগ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, উদ্যম আছে! তা ছাড়া, এক দিক দিয়ে জীবনযাপন যে কতখানি কঠিন এদেশে, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ নিজেকে করতে হয়, এটাও কি দেশের সবাই বোঝে! এই যে প্রৌঢ় বয়স পার করে, অবসরপ্রাপ্ত দেবতোষ এখন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন (আসলে তো তাই!), তাঁরই মতন একজন কেউ কি দেশে এটা ভাবতে পারেন? এখানে না করলে, আর কেউ করে দেবে না।

নাহ, পক্ষে এবং বিপক্ষে নানান যুক্তি-তর্ক মাথায় আসছে এবং তার মধ্যে মনে হয় কেউ দরজায় নক করছে।

হুভার মেশিনের প্লাগ খুলে, দরজা খুলতে গেলেন দেবতোষ। ঠিক তো, বাগান পরিষ্কার করতে আসার কথা ছিল স্টুয়ার্টের। কাঁটায়-কাঁটায় সাড়ে আটটায় এসেছে। দরজা খুললেন দেবতোষ।

গুড মর্নিং স্টুয়ার্ট। অনেকক্ষণ দরজা নক করছিলে কি?

ওহ নো। স্টুয়ার্ট হেসে বলল, আমি তো জানি, তুমি হুভার করো এসময়। বেল বাজালে শুনতে পাবে না, তাই নক করেছি। একবারই করেছি।

তুমি বাগানে যাবে তো? পিছনের দরজা খুলে দিই?

ইয়েস প্লিজ। গ্যারাজ ডোর-ও খুলে দাও। গ্রাস-মোয়ার নেব। আজ ওয়েদারটা ভাল, এর পরে কবে আর ঘাস কাটা যাবে জানি না, যতটা পারি আজ বাগান পরিষ্কার করে, ঘাসও ছেঁটে দিই। ...বাই দ্য ওয়ে, তোমার গ্রাস-মোয়ার-এ পেট্রল আছে তো?

ইতস্তত করলেন দেবতোষ। কবে নিজে শেষ লন-মোয়ার ব্যবহার করেছেন মনে নেই। বললেন, গুড কোয়েশ্চেন, আই ডোন্ট রিমেমবার... হাসল স্টুয়ার্ট। —ডোন্ট ওয়রি। আমি একটা ক্যান-এ দু-লিটার পেট্রল নিয়েই এসেছি... নয়তো আমাকেই তো আবার...।

ওহ, সো কাইন্ড অব য়্যু স্টুয়ার্ট... ঘুরে ওপাশে এসো, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি।

এপাশের দরজা বন্ধ করতে করতে দেবতোষ শুনলেন, স্টুয়ার্টের মোবাইল বাজছে। বুঝলেন স্টুয়ার্ট আজ ব্যস্ত, আবহাওয়া ভাল দেখে অন্য কেউ যোগাযোগ করছে বাগান পরিষ্কার করাবার জন্য। দেখতে-দেখতে শীত এসে যাবে, প্রায় মাস চারেক আর বাগানে কাজ করা যাবে না। এদিকে এখনই ঝরা পাতা ডাঁই হয়ে রয়েছে যাদের বাগানে বড় বড় গাছ আছে। এ মাসের মধ্যেই একমাত্র পাইন ছাড়া, বার্চ-ওক-চেরি-আপেল... প্রত্যেকটা গাছই একেবারে ন্যাড়া, নিষ্পত্র হয়ে যাবে। শীর্ণ শাখাগুলো ঊর্ধ্বমুখী হয়ে কনকনে হাওয়ায় কাঁপবে, তুষারপাতে ঠায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকবে, উড়ো বৃষ্টিতে ভিজবে। ঝরা পাতা এখনই তুলে না ফেললে, ভিজে পচে বাগান আরও নোংরা করবে। বাগানে কাজ করা, পরিষ্কার করার মাত্র আর কদিনই সময়।

গ্যারাজ আর বাগানের দরজা খুলে দিলেন দেবতোষ। সপ্তাহের মাঝামাঝি আজ, পাড়াটা নিঝুম হয়ে রয়েছে। কখনও এক আধটা গাড়ি যাওয়ার কিংবা ঝুপ শব্দে দরজা বন্ধ হওয়ার ছাড়া কোনও শব্দ নেই। ঠান্ডাও পড়ছে বেশ, মাঝেমাঝে রাতের শিশির ভোরে ফ্রস্ট হয়ে জমে যাচ্ছে। আজ রোদ উঠেছে বলেই জায়গায়-জায়গায় সাদা ফ্রস্ট এখন গলে যাচ্ছে। এর পরে শুকিয়েও যাবে।

গ্যারাজ থেকে গ্রাস-মোয়ার বার করতে করতে স্টুয়ার্ট জিজ্ঞেস করল, তুমি ইন্ডিয়া যাচ্ছ কবে?

দেবতোষ বললেন, দিন ঠিক করিনি, তবে মিড-ডিসেম্বরই হবে।

মনে করে এবার বাগান আর গ্যারাজের চাবি দিয়ে যেও। বেশি স্নো পড়লে অ্যাটলিস্ট আমি এসে দেখে যাব পাইপ লাইনগুলো ঠিক আছে কিনা।

সে আমার আগেই মনে হয়েছে এবার। দেবতোষ বললেন। আমি তোমাকে একটা বাড়ির চাবিও দিয়ে যাব।

হ্যাঁ, আর আমি এসে রাইস অ্যান্ড কারি বানিয়ে খাব।

নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল স্টুয়ার্ট।

দেবতোষও হেসে বললেন, তা খেয়ো। কিন্তু কারিটা বানাবে কে? তুমি, না তোমার মিসেস!

স্টুয়ার্ট মুখ তুলে বলল, তুমি জানো না, এর মধ্যে কবে একদিন আমার বউ এসে মিসেস ব্যাগ্‌সি-র কাছ থেকে কারির রেসিপি লিখে নিয়ে গিয়েছিল। শি ট্রায়েড অ্যাট হোম অ্যান্ড ইট ওয়াজ ডেলিশিয়াস।

দেবতোষ বললেন, এখন তো সুপারমার্কেটগুলোতেও রেডিমেড কারি পাওয়া যায়।

ও নো, স্টুয়ার্ট বলল, ওগুলো সুইটিশ, তোমাদের প্রিপারেশনের মতো টেস্টি হয় না। ...একটু হেসে স্টুয়ার্ট আবার বলল, মিসেস ব্যাগ্‌সি জানেন তো, আমি আজ কাজ করতে আসছি!

হেসে ফেললেন দেবতোষও। স্টুয়ার্ট কাজ করতে এলেই নির্মলা ওকে কিছু-না-কিছু খাবার দেন। আর এ বাড়িতে যাই দেওয়া হোক না কেন, স্টুয়ার্টের কাছে তা ফ্যান্টাস্টিক, সুপার্ব। খেয়ে ওর মুখ আলো হয়ে যায়, এমনকী একটু ঝাল লাগলেও। ঘণ্টা হিসেবে পয়সা পাওয়ার ওপরে, ওইটুকু অতিরিক্তের লোভেই স্টুয়ার্ট দেবতোষের বাড়ির কাজে কখনও কামাই করে না। বললেই চলে আসে।

দেবতোষ বললেন, ডোন্ট ওয়রি, ও একটু পরেই নীচে আসবে।

ঘরে ফিরে এলেন দেবতোষ। সময়ের একটা হিসেব আছে। বাকি

টুকটাক কাজ সেরে নিতে হবে। একবার ব্যাঙ্কে যেতে হবে। পেনশন-এর টাকা জমা পড়া আর নিয়মিত খরচের অধিকাংশ আপনা আপনি চলে। ডাইরেক্ট ডেবিট আছে ইলেকট্রিসিটি-গ্যাস-জল-কাউন্সিল ট্যাক্স কাটার জন্য; মাসে মাসে স্টেটমেন্ট পাঠিয়ে দেয় বাড়িতে। তাহলেও মাঝেমধ্যে খুচরো চেক পান দেবতোষ। কলেজ থেকে অবসর নিলেও, অনেক দিন কাজ করার সুবাদে, ডিপার্টমেন্টে বিশেষ কোনও কাজ— ল্যাবরেটরি উন্নয়ন, জুনিয়র টিচারদের ট্রেনিং, এগজামিনেশন কন্ডাক্ট করা... এসব বিষয়ে দেবতোষের অভিজ্ঞতার জন্য মাঝেমধ্যে ডাকে। সম্মানদক্ষিণাও পান। সেই চেকগুলো আলাদা জমা দিতে যেতে হয়। একবার গাড়ির গ্যারাজে যেতে হবে। উইন্টার চেক-এর জন্য ডেট নিয়ে আসবেন। আর বেরুলেই ছোটখাটো কেনাকাটা থাকে।

নটা নাগাদ নির্মলাও নেমে আসেন। দেবতোষ যতক্ষণ নীচে কাজ করেন, উনি ওপরে গোছগাছ করেন; একেবারে নিত্যদিনের পুজো, ঠাকুরকে জল দেওয়া সেরে নামেন। রান্নাঘরে হালকা ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে টিভিতে খবর শোনেন, দরকারি কথাবার্তাও হয়। যেদিন নির্মলা কাউন্সিলে যান, দেবতোষ ব্রেকফাস্ট খেয়ে রান্নার আয়োজনও করে ফেলেন নিজে নিজে।

ঘড়ি দেখলেন। পৌনে নটা। খালি দুধের বোতল বার করে দিয়ে ভর্তিটা তুলে আনতে আনতে শুনলেন টেলিফোন বাজছে। এ সময়ে কার ফোন! সবাই তো কাজের পথে। রান্নাঘর থেকেই রিসিভার তুলে ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসলেন। —হ্যালো!

বাবা, টিপলু বলছি।

আজকাল টিপলুর ফোন এলে, বিশেষ করে একটু অভাবিত সময়ে, প্রথমেই যেন একটা মৃদু ঝাঁকানি টের পান দেবতোষ। গলার স্বরে, কথায় সেটা চেপে রাখারই চেষ্টা করেন। কিন্তু সূক্ষ্ম উৎকণ্ঠা অনুভব করেন মনের মধ্যে। বললেন, ওহ তুই? সকালে ফোন করছিস যে! অফিসে যাসনি?

অফিস থেকেই বলছি।

এত তাড়াতাড়ি? তোর তো পৌঁছতেই সওয়া নটা বেজে যায়।

যেত। আজকাল ঘুম ভেঙে গেলে আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়ি। একটা নতুন প্রজেক্ট-এর কাজও...।

বাধা দিয়ে দেবতোষ বললেন, নতুন কাজের জন্যই... নাকি বাড়িতে থাকতে চাস না বলে?

একটা হাসির মতো শব্দ শুনলেন দেবতোষ। দেবমাল্য বলল, এই... মানে... দুটোর জন্যই।

সামান্য এইটুকু কথা আর শব্দের মধ্যেই দেবতোষ টের পান বুকের মধ্যে যেন একটা হিমেল স্পর্শ। ছেলেটা শান্তিতে নেই।

তার মধ্যেই দেবমাল্য আবার বলে, বাড়ি থেকে তো ফ্রি-লি টেলিফোনেও কথা বলতে পারি না।

একটা দীর্ঘশ্বাস এসে যাচ্ছিল দেবতোষের। চেপে রেখে বললেন, কেন, কুন্তলা রাগ করে?

ও যে কী করে, করবে, রাগ না ভয়, নাকি সন্দেহ, ইনসিকিউরিটি... কিছু আর বুঝি না মনে হয়। এনিওয়ে... তোমরা ঠিক আছ?

হ্যাঁ... আছি আর কী। শনিবার তো আসতে পারলি না।

নাহ কী করে আর আসব! ও তো বেরিয়ে গেল... তোমায় ফোন করে জানানোর পরে বাড়িতে ছিলাম। কোথায় গ্যাছে, কখন আসবে কিছুই বলে যায়নি। এখন রাস্তাঘাট চিনেটিনে গ্যাছে, তাহলেও টেনশন তো হয়ই, তারপর উ‌ইকএন্ড।

দেবতোষ বললেন, তা তো হবেই। ও কিশলয়ের বাড়িতে গিয়েছিল তো?

হ্যাঁ, তা ছাড়া আর কোথায় যাবে!

তারপর? কিশলয় এসে পৌঁছে দিয়ে গেল?

না-না কিশলয়দার উইকএন্ড অনকল ছিল। সন্ধেবেলা ও নিজেই একবার আন্ডারগ্রাউন্ড পালটে, লেইনডন থেকে ট্যাক্সি নিয়ে ফিরেছে।

তোকে টেলিফোন করেনি ওদের বাড়ি থেকে?

নাহ। আর করলেও, আমি ঠিক করেছিলাম ওকে আনতে যাব না।

না-না টিপু, ওভাবে ভাবিস না। নিজের আসল মনোভাব গোপন রেখেই দেবতোষ বললেন, হাজার হোক ও তোর বউ তো, রাগারাগি উলটোপালটা যাই বলুক.... ওর সিচুয়েশন, মনের অবস্থা, দেশ ছেড়ে আসা... এগুলোও ভাববি তো!

আর কত দিন বাবা? এই ডিসেম্বরে দুবছর হবে আমাদের বিয়ে... দেড় বছর হল ও চলে এসেছে। প্রথম একটা বছর আমি তো তোমাদের প্রায় কিছুই জানতে দিইনি।

সব বুঝলাম। কিন্তু একটা বিবাহিত জীবনযাপনের ক্ষেত্রে দেড় দুবছর সময়টা কিছুই না। কত কিছুর সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে হয় বলতো? নতুন জীবন, নতুন লোকজন এসব তো আছেই, ওকে তার ওপর অ্যাডজাস্ট করতে হচ্ছে এই নতুন দেশের সঙ্গেও, এদেশের ভাষা ওয়েদার...।

বাবা, আমি কি এগুলো মাথায় রাখি না? নাকি প্রথম থেকে রাখিনি?

রাখিস যদি, তাহলে আর এত অল্পে আপসেট হচ্ছিস কেন?

অল্প! হতাশার অনুভূতিটা ওই একটা শব্দেই ঝরে পড়ল দেবমাল্যর কণ্ঠ থেকে। একটু থেমে বলল, তোমাদের বোঝানো খুব ডিফিকাল্ট আমার পক্ষে। সবটা তোমাদের বোঝা হয়তো সম্ভবও না। একসঙ্গে জীবনযাপন না করলে...।

দেবতোষ বললেন, পুরোটা না বুঝলেও, আন্দাজ তো খানিকটা আমরাও পাচ্ছি। কিন্তু রেস্টলেস হয়ে পড়লে...।

আমার অ্যাবসলুটলি কোনওই স্বাধীনতা নেই বাবা।

সেটা স্বাধীনতা নিয়ে এখন বেশি ভাবছিস তাই বেশি মনে হচ্ছে। কোনও অবস্থাতেই পুরো স্বাধীন আমরা কেউ নই।

তাও মানছি। কিন্তু নিজের অস্তিত্বটা আমাকে তো অনুভব করতে হবে! কুন্তলার যেন সেটাতেও আপত্তি। নিজের সব ইচ্ছে-আনন্দ-রুচি-এক্সপেক্টেশন...কোনও মানুষ কি ছেড়ে দিয়ে টিকতে পারে?

দেবতোষ যেন কথা খোঁজেন। বললেন, মানিয়ে নেওয়ার জন্য সেটা নাহয় কিছুদিন চেষ্টা করা যায়, কিন্তু ওর ইচ্ছে অনুযায়ী চললেও ও কি ঠিক থাকে?

কী বলব বলো! মাঝেমাঝে মনে হয় ওর নিজেরও... কথা-কাজ-প্ল্যান-প্রোগ্রামের কোনও ঠিক নেই।

তুই কিন্তু একবার আমায় বলেছিলি, মানসিকভাবে ও অসুস্থ নয়। কিন্তু নিজের অ্যাকটিভিটিজ, ডিসিশনের ব্যাপারে যে কিছু ঠিক করতে পারে না, কিংবা ঠিক রাখতে পারে না, সে কি তাহলে মানসিকভাবে পুরো সুস্থ?

নিজস্ব ভাবনাচিন্তার ব্যাপারে ওর তো কোনও গণ্ডগোল নেই বাবা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ওর ডিসিশনগুলো খুব দ্রুত পালটে যেতে পারে। শি ইজ এক্সট্রিমলি আনপ্রেডিক্টেবল, আবার একগুঁয়ে।

দেবতোষ হঠাৎই একটু সচেতন হয়ে বললেন, হ্যাঁরে, তুই যে অফিস থেকে এতক্ষণ... বাংলায় কথা বলে যাচ্ছিস... তোর কলিগ কিংবা অন্য স্টাফ...?

না-না কোনও অসুবিধে নেই, দেবমাল্য বলল, সে খেয়াল আমার আছে। আমি আমার নিজের রুম থেকে কথা বলছি। তোমাদের তো সেটাও ঠিক করে বলা হয়নি, আমি একটা প্রোমোশন পেয়েছি। অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে অ্যাসোসিয়েট রিসার্চ অফিসার হয়েছি। যাই হোক...।

একটু থেমে দেবমাল্য আবার বলল, শোনো বাবা, যে জন্য টেলিফোন করেছিলাম, সেটাই তো বলা হল না। আমাকে কিশলয়দা সেদিন রাতে টেলিফোন করেছিল।

কবে?

গত সপ্তায় কুন্তলা ওদের ওখানে গিয়েছিল শনিবার। সেই উইকএন্ড-এ কিশলয়দা অনকল ছিল, ওর সঙ্গে দেখা হয়নি, বোধহয় সেই জন্য ফিরেও এসেছিল। মনে হয়, বিদিশাবউদির কাছে কিছু শুনেটুনে একটু রাতের দিকেই কিশলয়দা ফোন করেছিল।

তার মানে চার-পাঁচদিন আগে?

হ্যাঁ, গত বেস্পতিবার।

কী বলছে কিশলয়-বিদিশা? বুঝতে পারছে বোন এরকম অ্যাবনরম্যালি বিহেভ করছে। তোর প্রবলেম হচ্ছে, আমাদের টেনশন হচ্ছে...?

বুঝতে না পারার আর কী আছে? কয়েকবারই তো হুটহাট ওদের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে বিদিশাবউদি ওর একা একা ওরকম যাতায়াত শুধু যে পছন্দ করছে না, তাই নয়। বোধহয় আর টলারেট করতেও চাইছে না।

সেটাই তো স্বাভাবিক। ননদ হোক, আর যেই হোক, সকলেরই নিজস্ব জীবনযাপন আছে, কাজেরও শেষ নেই এদেশে, তার ওপর দুটো বাচ্চা। ছেলেটা তো ছোটই এখনও। তা ছাড়া বিদিশা মেয়েটাকেও যেটুকু দেখেছি, মেয়েটার ভ্যালুজ আছে। একটা সুদিং পার্সোনালিটিও আছে।

দেবমাল্য বলল, কিশলয়দার কথা শুনেই মনে হল, বিদিশাবউদি ওকে এমন কিছু বলেছে যাতে ওর-ও এখন একটু অশান্তি হয়েছে। আমি খুব বেশিক্ষণ কথা বলতে পারিনি, কেননা কুন্তলাও ছিল বাড়িতে। ও টিভিতে সিনেমা দেখছিল, তাই আমি কিচেন থেকে খানিকক্ষণ কথা বলেছি।

দেবতোষ জিগ্যেস করলেন, কিশলয় কী বলছে, বোনের এরকম ব্যবহার অনুচিত... কিংবা ও কথা বলবে কুন্তলার সঙ্গে?

আরও একধাপ এগিয়ে কথা বলেছে কিশলয়দা। দেবমাল্য বলল, একটা হিন্ট পেলাম ওর কথায়, কুন্তলা নাকি বরাবরই কিছুটা মুডি, একটু এক্সেন্ট্রিক, দুমদাম কথা বলে দেয়... অথচ পড়াশুনায় ভাল...।

দীর্ঘশ্বাসটা চাপতে পারলেন না দেবতোষ। মাঝখানে বলে উঠলেন, ঘুণাক্ষরে কেউ এসব কথা উচ্চারণ পর্যন্ত করেনি—

আরও শোনো, ওর নাকি বিহেভেরিয়াল থেরাপিও হয়েছে কলকাতায় কোনও সাইকোলজিস্ট-এর কাছে।

এসবের একটু কিছু জানাল না আগে? কী কপাল! কিন্তু এখন কী বলছে কিশলয়? কিছুটা অস্থিরতা চাপতে পারলেন না দেবতোষ। বললেন, এখন কি ওর চিকিৎসা করাবার কথা বলছে? সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে হবে?

স্পষ্ট করে কিছু বলেনি, বা সাজেস্ট করেনি। আর আমিও বেশি

খুঁটিনাটি জানতে চাইনি। কিন্তু যা যা বলল তার থেকে আমি একটা পরিষ্কার আন্দাজ পাচ্ছিলাম যে ওকে নিয়ে সমস্যা আগেও হয়েছে। কিন্তু তার কতখানি মেন্টাল, আর কতখানি নেহাতই ওর পার্সোনালিটি, বিহেভিয়ার কিংবা এনভায়রনমেন্টের জন্য... সেটা বুঝতে পারছি না।

দেবতোষ বললেন, শোন টিপলু, ওভাবে নিজে নিজে আন্দাজ করে আর লাভ নেই। ওকে ঠিকমতো এক্সপার্টের কাছে দেখানোটা এখন আমাদেরই দায়িত্ব এবং আমার তো মনে হচ্ছে সাইকিয়াট্রিস্ট-এর সঙ্গেই—।

তোমাকে সেই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম, দেবমাল্য বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, একটা সুযোগও হয়েছে।

চেনাজানা কাউকে পেয়েছিস?

হ্যাঁ, আমার সেই ছোটবেলার বন্ধু মানসকে মনে আছে? ভাটপাড়ারই ছেলে, মানস ভটচায, গতবার পুজোর সময় উইম্বলডন পার্ক-এ দেখা হল, আলাপ-পরিচয় বেরুল, বছর চারেক এদেশে এসেছে, ডাক্তার... মনে পড়ছে?

হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে... ওই তো মণীশ ভট্টাচার্যর ছেলে... ওরা আবার লতায়-পাতায় শক্তিদারও আত্মীয়... ও কি সাইকিয়াট্রিস্ট?

হ্যাঁ, ও তো সেন্ট জর্জেস হসপিটালে সাইকিয়াট্রির সিনিয়র রেজিস্ট্রার। মাঝেমধ্যেই আমাদের টেলিফোনে আড্ডা হয়। কয়েকবার দেখাও হয়েছে। গত শনিবারেই হঠাৎ ও টেলিফোন করেছিল। খুব করে যেতে বলেছে একদিন। ভাবছি একদিন উইকডে-তে যাব।

কিছু বলেছিস নাকি কুন্তলা সম্বন্ধে?

না। একটু বুঝেশুনে নিয়ে তারপর ভাবছি... কুন্তলাকে কারও কাছে দেখাতে নিয়ে যাওয়াও তো মুশকিল, বিশেষ করে সে আবার যদি সাইকিয়াট্রিস্ট হয়। দেখি, আগে মানসের সঙ্গে কথা বলব।

চিন্তাচ্ছন্ন গলায় দেবতোষ বললেন, দ্যাখ। বাড়ির বউ, ব্যাপারটা ডেলিকেট। কনফিডেনশিয়ালিটি রাখাটা...।

ওটা নিয়ে ভেবো না। কনফিডেনশিয়ালিটি রাখা এখানে ডাক্তারদের রেসপনসিবিলিটি।

এমনিতে কুন্তলা আছে কেমন?

চুপচাপ আছে। ওর ইচ্ছের ব্যাপারে আমি তো কোনও বাধা দিই না... নিজেই বলছে এখন পিএইচ ডি-টা শুরু করবে। আর টিভি দেখছে, গান শুনছে। দু-তিনটে বন্ধু আছে এদেশে... টেলিফোনে কথাটথা বলে... এই আর কী...।

ঠিক আছে। বুঝেশুনে চলিস, কী আর বলব! এদিকে আসতে চাইলে নিয়ে আসিস।

হঠাৎ কিছু মনে পড়ার মতো দেবতোষ বললেন, ও হ্যাঁ...শক্তিদা-বন্দনাদি একদিন যেতে বলছেন তোদের সুদ্ধ। বন্দনাদির ভাই এসেছে আমেরিকা থেকে ফ্যামিলি নিয়ে, একটা গেট টুগেদার-এর জন্য বলছিলেন... পারবি আসতে?

মনে হয় পারব। আমি জেঠিমাকে একটা টেলিফোন করে নেব। ছাড়লাম এখন।

দেবতোষ উঠলেন না। টেলিফোন ছেড়ে ডাইনিং টেবিলেই বসে রইলেন। স্টুয়ার্ট বাগানে কাজ করছে। নির্মলাও নেমে এসেছেন টের পেয়েছেন। সাধারণত টেলিফোনে কথা বললে, নির্মলা ধারেকাছে আসেন না। তবে বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই বাপ-ছেলে কথা বলছে।

চা-এর কেটলির স্যুইচ অন করে বললেন, এখন বুঝি কিশলয় বলছে, মামণিকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাতে?

দেবতোষ ধীরেসুস্থে বললেন, হাবভাবে বলেছে নিশ্চয়ই, স্পষ্ট করে কি আর বলতে পারে!

তঞ্চকতা করলে স্পষ্টবাদী হবে কী করে! এখন তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, দিবাকরবাবুরা মেয়েকে পার করার জন্য আমাদের সঙ্গে ছলনা করেছেন, সাতকাহন করে অনেক কথাই বলেছিলেন, কিন্তু গণ্ডগোলের বিষয় একটিবারের জন্যও উত্থাপন করেননি।

দেবতোষ বললেন, ওসব কথা আর উত্থাপন করে লাভ নেই। কুন্তলা

এখন বাড়ির বউ, এই পরিবারভুক্ত। ওপর দিকে মুখ করে থুতু ফেললে নিজের গায়ে এসে পড়ার মতন, ওর নিন্দেমন্দ, সমালোচনা করলে আমাদেরই ক্ষতি।

সে আমিও বুঝি। কিন্তু মেয়ের ভবিষ্যতের কথাটা ভেবে, ওঁরা এমনকী পরেও তো আমাদের একটু আভাস দিতে পারতেন... এটুকুই বলার। আসলে কী জানো, এটা আমাদেরও অনভিজ্ঞতা.. কী জানি একটু তাড়াহুড়োও হয়েছিল কি না। পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন পড়ে কতটুকু বা বোঝা যায়? তার ওপর আমরা থাকি এদেশে। পাঁচজনের কাছে যে খোঁজখবর নেব সে উপায়ও ছিল না।

নির্মলা সামান্য অসহিষ্ণু হয়েই বললেন, দেশের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেব, এই ভাবনাটাই বোধহয় ভুল ছিল।

ছেলে কিংবা মেয়ে বলে তো কথা নয়, দেবতোষ বললেন। দেশের অনেক বাবা-মা, এদেশে ভাল পাত্র দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়ে রীতিমত ফেঁসে গেছেন, তাও শুনেছি। গুনলে হয়তো দেখবে সেই সংখ্যাটাই বেশি। এদেশে থাকা সব ছেলেই কি সুপাত্র? অথচ বিশেষ করে একটু উচ্চ মধ্যবিত্তরা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্যই বেশি করে বিদেশে থাকা ছেলে খোঁজেন। গণ্ডগোলে পড়লে হাত কামড়ানো ছাড়া তাঁদের তো কিছুই করার থাকে না। টিপলুর জন্য তবু তো আমরা আছি।

দেবতোষকে চায়ের মগ দিতে দিতে নির্মলা বললেন, সেই... কপাল ছাড়া আর কী!

চা-এ চুমুক দিলেন দেবতোষ। বললেন, যে কোনও বিয়েতেই কিছুটা ঝুঁকি থাকে, সম্বন্ধ করে দেওয়ায় ঝুঁকিটা আর একটু বেশি। আর আমাদের ধ্যানধারণায় বিয়ের কনসেপ্টটাও... কী জানি... জগদ্দল পাথরের মতন যেন একটা সম্পর্কের ভার...।

ও আবার কী কথা! নির্মলা মাঝখানে বলে উঠলেন। বিবাহিত সম্পর্ক ভার হবে কেন! উভয়পক্ষ থেকে অ্যাডজাস্ট করতে করতেই সেটা মধুর হয়ে ওঠে। তাই হয়ে আসছে চিরকাল।

হলে তো ভালই। কিন্তু না হলে? সয়ে সয়ে আজীবন কি চলা যায়? গেলেও তার থেকে বড় ক্ষতি বা ডিজাস্টার আর কী? তা ছাড়া এখনকার ছেলে বা মেয়ে কেউ কি সেটা মেনে নেবে? নাকি নিচ্ছে?

তার মানে কি তুমি লিভ টুগেদার সাপোর্ট করছ?

আমি সাপোর্ট করার বা অ্যান্টি করার কে? তবে চোখের সামনে অনেক বিয়ের পরিণতিই তো দেখছি... দেখতে দেখতেই এসব ভাবনা আসে। এদেশে তো ছিলই, এখন আমাদের দেশও তেমন আর পিছিয়ে নেই।

নির্মলা একেবারে রায় দেওয়ার মতন বললেন, লিভ টুগেদারের মতন খারাপ আর কিছু হয় না। ছিঃ। তারপর আবার যদি বিয়ে-থা ছাড়াই ছেলেপুলে হতে শুরু করে—

কীই বা এসে গেল, যদি সমাজ আর দেশ সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে?

তুমি দয়া করে থামাবে ওসব কথাগুলো? নির্মলা বসেছিলেন, উঠে পড়লেন। বললেন, তুমি টিভিতে শোনো না, এদেশেও এখন ম্যারেজ, ফ্যামিলি ভ্যালুজ এ সবের ওপর কীরকম জোর দিচ্ছে!

দেবতোষ বললেন, দিলেই তো হবে না, বাস্তবে কী ঘটছে সেটাই দেখতে হবে। আসলে বিয়ে-সম্পর্ক-সেক্স-ছেলেপুলে... এসব জড়িয়ে থাকা বিষয়গুলো নিয়েই এখন নতুন নতুন প্রশ্ন উঠছে।

আমি ওসব শুনতে চাই না। বিয়ে মানে বিয়েই, তার থেকে সম্পর্ক-প্রেম-ফ্যামিলি... মরছি এখন নিজের জ্বালায়... তার ওপর উনি...।

নির্মলা চটি ফটফট করতে করতে উঠেই গেলেন এবং বেরিয়ে গেলেন রান্নাঘর থেকে।

দেবতোষ বুঝতে পারেন নির্মলা রুষ্ট হয়েছেন। ছেলের মা হিসেবে তাঁর মনের ওপর কতখানি চাপ পড়ছে তাও বোঝেন। বিয়ের অনুষঙ্গেই নিশ্চয়ই কত প্রত্যাশার ছবি এঁকে রেখে দিয়েছিলেন মনে মনে। ভাবছেন হয়তো ধূসর হয়ে যাচ্ছে সেই সব কাল্পনিক ছবি। তার চেয়ে বড় কথা, চোখের সামনে সন্তানের মনোবেদনা, কষ্ট, দেখার মতো শাস্তি বাবা-মা-এর আর কিছুতে হয় না। অসহায় আর চাপা অস্থিরতায় দেবতোষ

নিজেও কি বিদীর্ণ হচ্ছেন না!

আপনা থেকে দুর্ভাবনার গভীর কালো মেঘ যেন গ্রাস করে দেবতোষকে।

কী করবে এরপরে টিপলু! সাইকিয়াট্রিস্টকে দেখিয়ে ওষুধপত্র, কাউন্সেলিং এসব কবলেই কি মেয়েটা সম্পূর্ণ শুধরে যাবে! সেই সব ওষুধপত্রের আবার কীরকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তাই বা কে জানে! তারপরে ছেলেপুলে হওয়ার প্রশ্ন আছে। মাথার দোষটোষ তো শুনেছেন বংশানুক্রমেও আসতে পারে। আবার নতুন বিয়ের পরে এরকম মানসিক চাপ সহ্য করতে করতে শেষ পর্যন্ত টিপলুই কিছু একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে না তো? নিজের ছেলে বলে নয়, কিন্তু যতটা সব মিলিয়ে বোঝেন, মানুষ হিসেবে ওকে তো বেশ খোলামেলা, মিশুকে, পাঁচজনকে নিয়ে চলার মতন বলেই মনে হয়। কোনও দিনই কারও কাছ থেকে অভিযোগ শুনতে হয়নি টিপলুর জন্য, বরং প্রশংসাই শুনেছেন চেনা পরিচিতদের কাছ থেকে। এদেশে আসার পর থেকেও পেরেন্টস-টিচারস মিটিংয়ে সবসময় ওর আচার-ব্যবহার. মেশামেশি, পড়াশুনো-খেলাধুলো-মানিয়ে চলা... এসব নিয়ে টিচাররা খুবই ভাল রিপোর্ট দিয়েছেন, প্রশংসা করেছেন।

দেবতোষ ভাবেন, হৃদয়বান আর ভাল ছেলেটার কপালেই ভাগ্যদেবীর এমন কোপ পড়ল!

নাহ ঠিক ভাগ্যের ওপর ব্যাপারটা ছেড়েই কি দেওয়া যায়? শেষ পর্যন্ত কী হবে, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে জানেন না, তাহলেও এমন একটা অবস্থায় বসে বসে শুধু ভাবলেই তো চলবে না। আর কিছু না হোক, টিপলুকে মানসিক সমর্থন দেওয়ার জন্যও তাঁদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। বিদেশবিভুঁই বলে তাঁরা তো আর জলে পড়ে নেই। তা ছাড়া আর একটা ব্যাপারও ভাববার। কুন্তলার মানসিকতা, আচরণ নিয়ে সমস্যা হলেও, সে মেয়েটা তো বাইরের কেউ না এখন। কথা বলা, যোগাযোগ, আলোচনার দরকার ওর সঙ্গেও।

রান্নাঘরের চেয়ার-টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন দেবতোষ।

স্নেহ যে নিম্নগামী এটা প্রতিদিন টের পান দেবতোষ। কিন্তু তিনি তো যুক্তিবাদী মানুষও। বেশি আবেগ নিয়ে চললে, শুধু তিনি একা নন, এ পরিবারের আর কেউও যে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাবে না, সেটাও তাঁকে মাথায় রাখতে হয়। মাস দেড়েকের মধ্যে কলকাতা যাওয়ার কথা, তার আগে নানান গোছগাছ আছে। একটু একটু করে সেইসব প্রস্তুতির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন দেবতোষ।

তিনচার দিনের মধ্যে একবার ঘুরে গেল কুন্তলা আর দেবমাল্যও। নাহ, ততটা খারাপ মনে হল না তো দুজনকে! কোথাও একটু উন্নাসিক ভাব থাকলেও, নির্মলার সঙ্গেও খানিকক্ষণ বকর বকর করল কুন্তলা। পিএইচ ডি করার জন্য ইউনিভার্সিটিতে নাম রেজিস্ট্রি করিয়েছে, সে কথাও বলল। কিছুটা হাসিখুশি হয়ে ঘুরেও এল শক্তিদা-বন্দনাদির বাড়ি থেকে।

টিপলু কি এর মধ্যে ওকে দেখিয়ে এনেছে সেই সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধুর কাছে?

থাক, খবরা‌খবর জানার জন্যে তাড়াহুড়ো করলেন না দেবতোষ। সময়মতো টিপলুই যা বলার বলবে। মনে মনে শুধু ঠিক করে রাখলেন, কলকাতায় গিয়ে কুন্তলার বাবা-মার সঙ্গেও কথাবার্তা বলতে হবে। সমস্যা কিছু থাকলে, এবার তাঁকেই উদ্যোগ নিতে হবে ঠিকঠাক সব জানার জন্য। ও বাড়ির মেয়ে হলেও, কুন্তলা তো এ বাড়িরই বউ।

৫

উইম্বলডন পার্ক পর্যন্ত দিব্যি গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে গেল দেবমাল্য। কিন্তু আসল ঝামেলাটা যে তারপরে সেটাও জানা ছিল। তা হলেও আশা করেছিল দু-একবার এ রাস্তা ও রাস্তা করলেই মানসের বাড়ির ডার্নসফোর্ড অ্যাভেনিউ পেয়ে যাবে। নাহ মিনিট পনেরো ঘোরাঘুরির

পরেই টের পেয়ে গেল ও প্রায় একই জায়গায় চক্কর মারছে। লন্ডনের সাউথ ওয়েস্টের দিকে এটাই অসুবিধে। রেসিডেন্ট এরিয়াগুলোয় কাছাকাছির মধ্যে এত রাস্তা আর এত বাড়ি, মাঝেমধ্যে খুঁজে পেতে রীতিমত নাকাল হতে হয়।

মোবাইল থেকে টেলিফোন করে ডিরেকশনটা নিয়ে নেবে কী? মানসের নম্বরটা স্টোর করা আছে।

সেটাও ঠিক মনঃপূত হল না। আঠারো বছর এদেশে থেকে, প্রায় নিজের অফিস পাড়ার কাছাকাছি একটা ঠিকানা খুঁজে পাবে না দেবমাল্য!

লন্ডনের এ-টু-জেডটা তো পিছনের সিটেই পড়ে আছে। কিন্তু পাতা খুঁজে বার করতে করতে সময়টা ঠিক রাখতে পারবে কী? যদিও মানস বলেছে রবিবার বিকেলে ও বাড়ি থেকে বেরুবে না, তাহলেও দেরি করে পৌঁছলে দেবমাল্যর নিজেরই লজ্জা করবে। আড্ডা মারতেই যাওয়া, তবু, প্রয়োজনের ভাবনায় একটু সচেতনতা কি মনে মনে নেই?

নিউজ লেটারের দোকানটার সামনেই দাঁড়াল দেবমাল্য। গুজরাতি মালিক দম্পতি এক মিনিটেই পার্ক-এর গা ঘেঁষা রাস্তাটা শুধু চিনিয়ে দিলেন তাই নয়, বাঙালি ডাক্তারবাবুকে চেনেন বলেও জানালেন। দেবমাল্য বুঝল, নভেম্বর মাসে এই বিকেল চারটের মধ্যে আলো নিভু নিভু হয়ে এসেছে তাই রাস্তার নামটা মিস করেছে। নয়তো ও মানসের বাড়ির নাকের ডগাতেই ঘোরাফেরা করছে।

গাড়ি দাঁড় করাতেই, সেমি ডিট্যাচড বাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এল মানস।

আয়। কাছে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছিলি তো?

রিমোট কন্ট্রোলে গাড়ি বন্ধ করে দেবমাল্য বলল, বেশিক্ষণ নয়। তুই যদি পার্ক-এর গেট ছেড়ে ডানদিকের প্রথম রাস্তা বলতিস, তাহলে একবারেই পৌঁছে যেতাম... এনিওয়ে সামনের দোকানটায় জিজ্ঞেস করতেই...

হ্যাঁ ঠিক আছে। কিন্তু তুই একা নাকি? বউকে আনিসনি?

বউদের কি আনব বললেই আনা যায় রে? জুতো খুলতে খুলতে দেবমাল্য বলল, ওদের অনেক ফ্যাকড়া আছে। কখন ফিরব, কোনও অকেশন আছে কি না, আর কেউ আসছে কি না...।

ওকে থামিয়ে দিয়ে মানস বলল, তুই বললি না, কিছু নেই, স্রেফ আড্ডা মারতে যাচ্ছি খানিকক্ষণ।

বলেছি। তার পরেও না এলে কী করব?

না কি আমি আলাদা করে বলিনি তাই এল না?

মনে হয় না। ভেতরের ঘরে যেতে যেতে দেবমাল্য বলল, বাদ দে। ওটা এমন কিছু ভাববার ব্যাপার না।

মানস বলল, ওকে কি মাসিমা-মেসোমশায়ের কাছে রেখে এলি?

না। বাড়িতেই আছে ইউ সি এল-এ নাম লিখিয়েছে তো... কাগজপত্র ঘাঁটছে। এতদিনে বোধহয় একটু চাড় হয়েছে...।

সোফায় বসতে বসতে মানস বলল, হ্যাঁরে টিপলু, কুন্তলা তোর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ঠিক জানে তো? মানে আমরা সেই ছোটবেলার ভাটপাড়া স্কুল থেকে...।

সবই জানে। দেবমাল্য বলল, তোর মনে নেই, ওই তো ব্যাসিলডনে পুজোর সময় কতক্ষণ গল্প হল?

ঠিক, ঠিক। মানস বলল, কিন্তু তার একটু পরেই তো তোরা বেরিয়ে গেলি... বোধহয় খাওয়া-দাওয়াও করিসনি, তাই না?

আমি খেয়েছিলাম। ও না খেয়ে ফিরে গিয়েছিল।

মানস বলল, হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে। কুন্তলা খুব চটেছিল তোর ওপরে। কেননা, তুই খিচুড়ি খেতে খেতে... ওই আমেরিকা থেকে আসা বন্দনামাসির ভাইঝি না কে মেয়েটার সঙ্গে খুব ফ্লার্ট করছিলি—সেই দেখে...।

ধ্যাৎ... একদম বাজে কথা। আমি বরং কুন্তলার জন্যই ওই ভদ্রমহিলার কাছে খোঁজখবর নিচ্ছিলাম—।

সে তুমি শালা যা-ই বলো... আমারও তো সাইকিয়াট্রিস্ট-এর চোখ, তোমার গদগদ ভাব আমি ঠিকই দেখেছিলাম।

পায়ের ওপর পা তুলে দেবমাল্য বলল, হ্যাঁরে মানস, সাইকিয়াট্রিস্টরা তো মনের কারবারি, তোরা আবার চোখ দিয়েও সবকিছু গিলে খাস বুঝি?

মানস সেলার খুলতে খুলতে বলল, জানিস না? আইজ ক্যাননট সি, হোয়াট মাইন্ড ডাজনট নো! প্রথমে আমি মন দিয়ে বুঝেছি, তারপর চোখ দিয়েও দেখেছি।

দেবমাল্য বলল, তোরা তো ডেঞ্জারাস লোক রে! মানুষের মনে মনে কী ঘটছে সব টের পেয়ে যাস?

অত সহজ নয় ব্যাপারটা। তবে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যাটিচুড, মুভমেন্ট... এসব থেকে মনের এবং ভাবনার অনেক হদিশ পাওয়া যায়, এবং তার জন্য সাইকিয়াট্রিস্ট হওয়ারও দরকার হয় না। একটু ভাল করে খেয়াল করলেই বোঝা যায়। কথাটা থামিয়েই মানস আবার বলল, তোর যে সেদিন ওই মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে বেশ ভাল লাগছিল, আমি সেটা শুধু খেয়াল করেই বুঝে ফেলেছিলাম। ঠিক না?

দেবমাল্য বলল, শুধু আমি কেন? তৃষার সঙ্গে সেদিন যাদেরই আলাপ হয়েছিল, কথা বলছিল, তাদেরই ওকে ভাল লেগেছিল। একটা সুদিং আর চার্মিং পার্সোনালিটি আছে ভদ্রমহিলার।

অন্যদের কথা জানি না। মানস বলল। তবে তোর মুগ্ধতা আর লজ্জা লজ্জা ভাবটা আমার নজরে পড়েছিল। কুন্তলা অবশ্য সেইজন্যই খেপেছিল কি না... জানি না। কেননা, ও বোধহয় আগে থেকেই একটু রেস্টলেস ছিল সেদিন। ...যাক গে, কী নিবি বল?

দেবমাল্য ওর দিকে তাকিয়ে বলল, কী নেব মানে? আমি তো গাড়ি চালাচ্ছি। একটা সফট কিছু দে। ...কিন্তু তোর বউ-ছেলে কোথায়?

ওরা সিনেমায় গ্যাছে। এখানে কাছেই একটা হল-এ সপ্তায় তিনদিন নতুন-পুরনো ইন্ডিয়ান সিনেমা দেখায়। আজ তপন সিংহ-র সাগিনা মাহাতো দেখাচ্ছে শুনেই ঋতু ছেলেকে নিয়ে ছুটেছে।

আমার জন্যই তোর যাওয়াটা আটকে গেল নাকি?

আরে না। মানস বলল, রোববার বিকেলে এমনিতেই আমার কোথাও

বেরুতে ইচ্ছে করে না। আর সিনেমা হল-এ তো পারতপক্ষে যাই না। তা ছাড়া সোমবারের কাজের প্রস্তুতি থাকে... সকাল সকাল বেরুতে হয়।

তোর বউ রাগ করে না?

নাহ। ও জানে, কয়েক মাসের মধ্যে আমার কনসালট্যান্ট হওয়ার কথা, এখনও রীতিমত বইপত্র নাড়ানাড়ি করতে হয়। আর আজকে তো তুই আসবি জেনেই গ্যাছে... বেশ নিশ্চিন্ত মনেই গ্যাছে। বোস, তোর জন্য ফ্রুটজুস নিয়ে আসি। আর কিছু খাবি?

বসার ঘরের এধার ওধার চোখ বুলোতে বুলোতে দেবমাল্য বলল, না। ইচ্ছে করলে পরে বলব। তুই এসে বোস আগে।

আসছি, বলে বাইরে যেতে গিয়েও দাঁড়াল মানস। দরজার সামনে থেকে বলল, টিপলু, তুই কিন্তু রাতে খেয়ে যাবি। ঋতু ইলিশ-পোলাও করেছে আজ... আরও কী সব যেন... দরকার হলে কুন্তলাকে আগে থাকতে বলে দে।

প্রায় মাসখানেক আগে থাকতেই দেবমাল্য আসছে-আসবে করছিল মানসের কাছে। একেবারে ছোটবেলার পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা আর আড্ডার আকর্ষণ তো ছিলই। আগ্রহটা বেড়েছিল, যখন জানতে পারে, মানস সেন্ট জর্জেস হাসপাতালের সাইকিয়াট্রি ডিপার্টমেন্টের ডাক্তার। ও যে শুধু এম আর সি সাইক পাশ করেছে তাই নয়, খুব শিগ্‌গির কনসালট্যান্ট হবে, সেটাও জেনেছিল দেবমাল্য। আর জেনেছিল এমন একটা সময়ে, যখন সত্যি সত্যি ও কুন্তলার জন্য প্রায় হন্যে হয়ে একজন সাইকিয়াট্রিস্ট-এর খোঁজ করছিল। দুটো মিলিয়ে হাতে যেন চাঁদ পেয়েছিল দেবমাল্য।

কয়েকটা সপ্তাহ কেটে গেল মাঝখানে। আতিশয্য কাটিয়ে একটু বাস্তব ভাবনার দরকার ছিল। মানস সেই ভাটপাড়ার স্কুলের বন্ধু হলেও, মাঝখানে বহুদিনের বিচ্ছিন্নতায় এখন কার কী অবস্থান, ভূমিকা, পরিচিতি, মানসিকতা... এ সবই নতুন করে বোঝা এবং পরিমাপের প্রয়োজন ছিল। মানস অবশ্য গত বছরেই সেই উইম্বলডন পার্ক-এর

পুজোর সময় দেখা হওয়া থেকে খুবই আন্তরিকতায় বেজেছিল। জড়িয়ে ধরে, তুই-তোকারি করেই কথাবার্তা শুরু করেছিল প্রথম থেকে। ঋতুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। দেবমাল্যকে পেয়ে, ও যেন নিজের ছোটবেলা-ঘরবাড়ি-স্কুল এই সবকেই ফিরে পেয়েছিল সেদিন। যদিও বাড়িতে আসা হয়নি এর আগে, কিন্তু যোগাযোগটা আর বিচ্ছিন্ন হয়নি। মাঝেমধ্যে দেখাসাক্ষাৎও হয়ে যাচ্ছিল কোনও অনুষ্ঠানে, কিংবা পুজোয়, কিংবা নাটকে। কয়েকদিন দেখা না হলেই কথা হয় টেলিফোনে।

সব প্রবাসীদের মধ্যে অল্পবিস্তর নিঃসঙ্গতার অনুভব আছে। আবার তাকে ঢেকে রাখার প্রবণতাও আছে। আসলে নিঃসঙ্গতা কিংবা মনোকষ্টের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ার অর্থই যেন সেটা সপ্রতিভ জীবনযাপনের পরিপন্থী। একটা আপাত ব্যস্ত, দৌড়ঝাঁপ করা, ঝকঝকে জীবনধারণের ঠাট বাঁচিয়ে রাখার প্রতিযোগিতা চলে অধিকাংশ উন্নত দেশের প্রবাসীদের মধ্যে। যেন সবাই নীরবে আর একজনের কাছে প্রমাণ করে চলেছে, আমি তোমার থেকে ব্যস্ত, অর্থাৎ আমি আর একটু উন্নত। আর এই মানসিকতা থেকেই, কোথায় যেন এক ধরনের হাস্যকর গোপনীয়তা লালন করে যায় প্রবাসীরা।

মানসের সঙ্গে অনেক দিন পরে যোগাযোগ হওয়ার পরেই দেবমাল্য বুঝেছিল, মানুষ হিসেবে ওর কোনও লোক দেখানো ভড়ং-টড়ং নেই। কাজ-বয়স-জীবিকা-পরিচিতি... সব দিক দিয়েই ওরা অনেক পথ পেরিয়ে এসেছে, যার যার জীবনযাপনের অবলম্বন, পদ্ধতি-প্রক্রিয়াও ভিন্ন। তা সত্ত্বেও ছোটবেলার সেই নিবিড় পরিচিতি-সম্পর্ক-বন্ধুত্ব কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম বাঁধনের সেতু হয়ে বেঁচে আছে দুজনের মধ্যে।

কিংবা হয়তো কিছুই ছিল না। বহু কাল পরে দেখা হওয়ার আবেগ, স্মৃতি, চাপা পড়ে থাকা অভাববোধের অনুভূতিই কাছাকাছি এনে দিয়েছিল দুজনকে। কোনও প্রতিযোগিতা কিংবা তুলনার প্রশ্নই ওঠেনি। দেবমাল্য-মানস কোনও নতুন ভূমিকা, আড়ম্বর ছাড়াই আবার ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। অথচ তখনও দেবমাল্যর মাথায় আসেনি, কুন্তলাকে-নিয়ে যে সমস্যা ক্রমশই ঘনিয়ে উঠেছে ওর ব্যক্তিগত জীবনে, ওদের

পারিবারিক পরিস্থিতিতে, একমাত্র মানসের সঙ্গেই তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা, কথাবার্তা বলা যায়। আসলে প্রথম দিকে বন্ধুর জীবিকা নিয়ে সচেতন হওয়ার কথাটাই তো দেবমাল্যের মাথায় আসেনি।

মানসের বাড়ির বসার ঘরে একা একা দেবমাল্যর মনে হল, আরও আগেই কি মানসের কাছে কুন্তলার আচার-আচরণ, মানসিকতা নিয়ে অকপট আলোচনা করলে ভাল হত!

কিন্তু সুযোগটাই বা হল কোথায়!

গত মাসের সেই দিনটায় প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছিল দেবমাল্য ঠিকই। একই সঙ্গে অসহায়তা-অস্থিরতা মিলেমিশে, কিছুটা নিজের ওপরেও ঘৃণা, হতাশায় ভেবেছিল, তখনই ছুটে আসবে মানসের কাছে, বিশেষ করে ওর টেলিফোনটা পাওয়ার পরে। কিন্তু কীভাবে যেন স্নান সেরে, জামাকাপড় পরতে পরতেই আবার নিয়ন্ত্রণে বেঁধেছিল নিজেকে। না, কুন্তলার মনের অস্বাভাবিকতা নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না, মানসের কাছে খোলাখুলি বলা এবং আলোচনার জন্যও কোনও বাধা অনুভূত হয়নি। কিন্তু আড়ষ্টতা তৈরি হয়েছিল নিজেরই ভাবনা, নাকি সংস্কারের জন্য! ঘরের বউ-এর জন্য সরাসরি মনোরোগ চিকিৎসার দ্বারস্থ হওয়ার জন্যই কি সেই সংস্কার? সচেতনতা?

পুজো এসে গিয়েছিল তার মধ্যে। হয়তো ভালই হয়েছিল। নিজের সিদ্ধান্ত আর ভাবনার কাছে স্বাক্ষরিত হওয়ার জন্য বোধহয় এই কয়েকটা সপ্তাহের প্রয়োজনও ছিল। একটু অনুমতি আর মানসিক সমর্থনের দরকার ছিল দেবতোষের কাছ থেকে।

মানস কি কিছু আন্দাজ করছে?

বিগত কয়েক মাসের কথাবার্তা, গল্প করার মধ্যে কুন্তলা সম্পর্কে কোনও আভাস-ইঙ্গিত কি ওকে দেয়নি দেবমাল্য! হয়তো দেবে বলে দেয়নি। কিন্তু কখনও কথাচ্ছলে কিছু কি প্রকাশ হয়ে পড়েনি! একটা অস্থির দোলাচল তো চলতেই থাকে কুন্তলাকে নিয়ে। ও কখন কি রকম ব্যবহার করবে তার তো কোনও কিছুই ঠিক নেই। প্রায় দুবছর ধরে এত কাছাকাছি থেকেও দেবমাল্যের এই বিভ্রান্তিটুকু কাটেনি যে ওর কি সত্যি

কোনও মস্তিষ্ক-বিকৃতি আছে, না কি পুরোটাই একটা তাৎক্ষণিক মুড-এর ওঠানামা! এবং তা থেকেই অদ্ভুত, অনিয়ন্ত্রিত আচরণ করা এবং ইচ্ছেমতো মন্তব্যও করে ফেলা! কিন্তু সেইটাই তো মনের অস্বাভাবিকতা।

একটা মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের মোটামুটি শিক্ষিত মেয়ের এমন অস্বাভাবিকতা থাকবেই বা কেন?

এতদিনের মধ্যে, মাত্র সেই তিন-চার সপ্তাহ আগে রাত্তিরে টেলিফোন করে কিশলয় বলেছিল, আসলে... মানে... কুন্তলা বাড়ির সকলের ছোট তো... হয়তো কিছুটা প্রশ্রয় আর অ্যাফ্লুয়েন্স-এর মধ্যে মানুষ হয়েছে বলেই...।

দেবমাল্যর আর কিছু শোনার মতন মানসিকতা ছিল না সে রাতে। শ্যালকের কথাগুলো ওর মনে হয়েছিল, নেহাতই সাফাই গাওয়ার মতো এবং হয়তো কিছুটা নিজেকেও সুরক্ষিত রাখার অভিপ্রায়। ওর কথার মাঝখানেই দেবমাল্য বলেছিল, দেখুন কিশলয়দা, কীসের থেকে কী হয়েছে, আমরা জানি না, বুঝিনি, জানার কথাও না। কিন্তু এই প্রায় দু বছর আমাদের বিয়ে হওয়ার পরে, নিশ্চয়ই আপনারাও টের পাচ্ছেন, আমাদের সম্পর্কের কোনও উন্নতি হয়নি। বরং অবনতি হয়ে চলেছে দিনকে দিন। আর তার ফলাফল শুধু আমি না, ভোগ করতে হচ্ছে আমার বাবা-মাকেও।

অত্যন্ত স্বার্থপরের মতো একটা মন্তব্য করেছিল কিশলয় এর পরে। বলেছিল, তোমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে এখানে আবার বাবা-মাকে জড়াচ্ছ কেন? তাতে আরও জটিলতাই বাড়বে।

মানে! প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল দেবমাল্য। —আমাদের সম্পর্কের মধ্যে বাবা-মাকে আলাদা করে জড়াতে হবে কেন? প্রথম থেকে এই সম্পর্কের সমস্ত উদ্যোগটাই তো নিয়েছেন আমার বাবা-মা।

আরে নেগোসিয়েশন ম্যারেজে তাই তো হয়... সব ফ্যামিলিতেই। কিন্তু ম্যারেড লাইফে তার পরেও যদি বাবা-মা কনস্ট্যান্টলি ইন্টারফিয়ার করতে থাকেন...।

আপনি ভুল করছেন, দেবমাল্য বলে উঠেছিল, আমার বাবা-মাকে আপনি চেনেন না।

হ্যাঁ, সে তো ঠিকই—।

তাহলে আমার বাবা-মা সম্পর্কে ওরকম কমেন্টই বা আপনি করছেন কী করে!

করছি... তার কারণ, কুন্তলার কাছ থেকে শুনে যেরকম মনে হয়...।

শুনুন কিশলয়দা, কুন্তলার কাছ থেকে শুনে, আমাদের ফ্যামিলি কিংবা আমার বাবা-মার সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়, সেটা জানতে আমি আদৌ আগ্রহী নই, কেননা, কুন্তলার আচার আচরণ, কথাবার্তা, অ্যাকটিভিটিজ কোনও কিছুই যে স্বাভাবিক আর সুস্থ নয়, সেটা এই দু বছরে শুধু আমরা নই, আমাদের কাছেপিঠের সবাইও বুঝতে পেরেছেন।

সামান্য একটু মোলায়েম হওয়ার চেষ্টা করে কিশলয় বলেছিল, শোনো দেবু, আউট অব এক্সাইটমেন্ট তুমি বোধহয় এখন একটু বেশি রিয়্যাক্ট করছ। আমি তো তোমাকে বলেইছি, কুন্তলার একটু মুড-সুইং হয়, দ্যাট ডাজনট মিন—।

এ কথাটা কিন্তু আপনারা ঘুণাক্ষরেও আগে উত্থাপন করেননি। এখন আপনি একটু একটু করে বলছেন— মুড সুইং... ওর বিহেভেরিয়াল থেরাপি হয়েছিল... এটসেটরা।

এসব তো হয়েই থাকে, কিন্তু তার মানে সে অস্বাভাবিক, তা তো নয়!

দেবমাল্য এর পরে বলেছিল, আমি কুন্তলা সম্পর্কে আপনাদের এতদিন কিছুই জানাতে চাইনি নিজের থেকে। আমার ধারণা নিজের বোনের মানসিকতা সম্পর্কে আপনি অনেক বেশি জানেন। নিশ্চয়ই বিদিশা বউদিও ওকে চেনেন ভাল করে। আমরা এসব কিছুই জানতাম না, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, আপনারা প্রথম থেকেই...।

ওকে আর বলতে না দিয়ে কিশলয় বলেছিল, নিজের ওয়াইফকে তোমারই তো গড়েপিটে নিতে হবে... আর হেলপ-এর দরকার হলে এদেশে তো কাউন্সেলিং ইত্যাদিরও অভাব নেই...।

কী করতে হবে তা আমি জানি, কিশলয়দা। দেবমাল্য বলেছিল। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখবেন, কুন্তলার এবং আপনাদের ফ্যামিলির দোষ ঢাকতে গিয়ে, আপনারা আমার বাবা-মার সম্পর্কে উলটোপালটা কমেন্ট করলে লাভ কিছু হবে না। আমরা এদেশের সিটিজেন, এখনও এদেশে আইনকানুন আছে। দরকার বুঝলে আমরা ব্যবস্থা নেব।

আচ্ছা-আচ্ছা ঠিক আছে, কিশলয় বলেছিল, তুমি একটু ঠান্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভাবো... লাইফে কত রকমই তো...।

দেবমাল্য বুঝেছিল, ক্ষোভ, রাগ, বঞ্চনা, সব কিছু অতিক্রম করে, নিজের ওপর হতাশাটাই যেন বড় বেশি করে বাজছিল। ইতিমধ্যে কুন্তলা ফিরে এসেছিল সেদিন রাতে। নিজেকে দেবমাল্য একটা শান্ত খোলসের মধ্যে ঢেকে রেখেছিল আপ্রাণ চেষ্টায়। আর দু-এক দিনের মধ্যে একটু আশ্চর্য হয়েই লক্ষ করেছিল, কুন্তলা বাড়াবাড়ি কিছু করছে না। বরং একটু যেন আপসের ভাষা আর ভঙ্গি ফুটে উঠতে শুরু করেছিল ওর দিনযাপনে। এমনকী ব্যাসিলডন-এ ঘুরে আসার ইচ্ছেটাও ছিল ওর।

ব্যাপারটা যে দীর্ঘস্থায়ী হবে না, দেবমাল্য অভিজ্ঞতাবশতই সেটা ধরে নিয়েছিল। যথারীতি হয়ওনি। শক্তি জেঠু আর জেঠিমার বাড়ির গেট টুগেদারের দিনই ও টের পেয়েছিল, তৃষাকে কুন্তলা একেবারেই সহ্য করতে পারছে না। কিছু করার ছিল না। মানসের সঙ্গে পরামর্শ আর ওর উপদেশ মতো চলা ছাড়া আর কোনও পন্থা ওর মাথায় আসছিল না।

কিছুটা ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে মানস বলল, কী রে, খুব বোরড হচ্ছিস তো?

দেবমাল্য ঠিক খেয়াল করেনি কতক্ষণ সময় একা বসেছিল। বলল, না তো! অবশ্য এখন তুই জিগ্যেস করায় মনে হচ্ছে... তুই বোধহয় বাইরে গিয়েছিলি?

মিটমিট করে হাসল মানস। বলল, তোকে তালা বন্ধ করে রেখে, আমি কর্নারশপ থেকে ঘুরে এলাম।

তাই নাকি? কেন?

ফ্রিজ খুলে দেখি ফ্রুটজুস নেই। তোরও দেখলাম বেশ মগ্নভাব। টুক করে বেরিয়ে, নিয়ে চলে এলাম। নে, ধর।

সামান্য সংকোচ মিশে গেল দেবমাল্যর হাসিতে। মানসের হাত থেকে গ্লাস নিয়ে বলল, ওপর থেকে হয়তো মগ্নভাবটা তুই খেয়াল করেছিস, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি বেশ রেস্টলেস হয়ে রয়েছি।

তাও জানি। মানস বলল। নিজের গ্লাসে নিয়ে আসা বরফের ওপর খানিকটা মল্ট হুইস্কি ঢেলে নিয়ে বলল, সাইকিয়াট্রি প্র্যাকটিস করতে করতে এটা বোধহয় অভ্যাস হয়ে যায়। আমাদের কিচেন থেকে এ ঘরের খানিকটা দেখা যায়। সেখান থেকে তোকে লক্ষ করছিলাম। অ্যাপারেন্টলি তুই বেশ গুম হয়ে বসে থাকলেও, তোর বডি ল্যাঙ্গুয়েজে ভাবনার রিফ্লেকশন ছিল।

কৌতূহলী দেবমাল্য জিগ্যেস করল, যেমন?

গ্লাসে চুমুক দিল মানস। বলল, তোর ভাবনার মধ্যে ওয়ারিজ-অ্যাংজাইটিজ বোঝা যাচ্ছিল... হাতের আঙুল মটকাচ্ছিলি, পায়ের পাতা নাচাচ্ছিলি বারবার, ঘাড় উঁচুনিচু করছিলি, জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিচ্ছিলি... ঠিক না?

তুই বলছিস বলে, এখন মনে হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু তখন আমি কনশাস ছিলাম না।

মাথা নাড়ল মানস। বলল, আমার একটু বুঝতে সুবিধেও হয়েছে। কী বল তো?

দেবমাল্য সামান্য হেসে বলল, তুই বোধহয় অ্যান্টিসিপেট করেছিলি, আমি কোনও বিষয় নিয়ে তোর সঙ্গে কথা বলব?

এগজ্যাক্টলি। এমনকী কোন বিষয়ে, সেটার সম্বন্ধেও আমি অলমোস্ট সার্টেন।

হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে হাসল মানস। বলল, সেটা তোর মুখ দিয়ে বেরনোটাই ভাল... কেননা ব্যাপারটা ডেলিকেট তো! কিন্তু সেটা কথা না। কথা হচ্ছে, তুই শালা আমাকেই যে টেনশনে রেখে দিয়েছিল এত দিন ধরে, সেটা কি ভেবেছিস কোনও দিন?

তোকে টেনশনে রেখে দিয়েছি?

অফকোর্স! নিজে থেকে স্পষ্ট করে কিছু বলছিস না। এদিকে কেসটা বুঝতে পারলেও, আমিও জিগ্যেস করতে পারছি না.... টেনশন হবে না?

তুই কী বুঝতে পারছিলি?

তোর লাইফ হেল হয়ে রয়েছে। একা তোর না, মাসিমা-মেসোমশায়েরও। তাই তো?

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল দেবমাল্য। —হ্যাঁ। কুন্তলাকে নিয়ে আমাদের সকলেরই মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা।

অ্যায়! গ্লাসে চুমুক দিয়ে সামনের টেবিলে নামিয়ে রাখল মানস। বলল, একমাত্র নামটা করছিলি না, কিন্তু হাবভাবে, ইঙ্গিতে তোদের ফ্যামিলিতে যে একটি ডিজাস্টার ঘটে গ্যাছে, সেটা তো তুই অনেক আগেই জানিয়ে দিয়েছিলি। এদিকে ব্যাপারটা এতই পার্সোনাল... আমি যতই তোর ছোটবেলার বন্ধু হই, তুই নিজে থেকে না বললে কি জিগ্যেস করতে পারি?

তোকে বলছি-বলব করতে করতেই খানিকটা সময় চলে গেছে... তা ছাড়া বুঝতে পারছিস তো, ইস্যুটাই এমন...।

দুজনেই চুপ হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। পাঁচটার মধ্যে গাঢ় অন্ধকার নেমেছে উইম্বলডন এলাকায়। রবিবার বলেই অন্য দিনের তুলনায় বেশি চুপচাপ। বোঝা যাচ্ছে বাইরে কনকনে ঠান্ডার সঙ্গে হিমেল হাওয়া বইছে।

মানস বলল, শুধু তুই আর আমি দুজনে কথা বলব বলেই, আমি আজ আর কোনও প্রোগ্রাম রাখিনি।

দেবমাল্য বলল, সে কি রে, ঋতুকেও কি সেইজন্যই সিনেমায় পাঠিয়েছিস? আমি আসব বলে?

ঋতুকে আমার কোথাও পাঠাতে হয় না। ওর পায়ের তলায় সরষে। বেরনোর জন্য কোনও একটা ছুতো পেলেই ও খুশি। একা বেরুতে পারলে আরও খুশি। আমার পুরো অপোজিট। আমার একটু বাড়িতে বসে আড্ডা মারতে পারলে...।

আড়চোখে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে একটি নিবিড় সুখী মানুষকে দেখছিল দেবমাল্য।

ওর তুলনায় একটু ছোটখাটোর দিকেই চেহারা মানসের। ফর্সা, চোখে চশমা, পুরুষ্ট গোঁফ। মুখের মধ্যে একটা সরল, আন্তরিক ভাব আছে মানসের, অথচ বুদ্ধিদীপ্ত, সেটা ওর কথাবার্তা শুনলেই বোঝা যায়। বয়সে দেবমাল্যর থেকে দু-এক বছরের বড়ই হবে মানস, কেননা দেবমাল্য স্কুলে ভর্তি হয়েছিল পরে। তা হলেও, একত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে ইংল্যান্ডে এসেও ও যেন জীবনটাকে কিছুটা গোছ করে নিতে পেরেছে। কে জানে, বোধহয় এদেশে চলে এসেছে বলেই পেরেছে। ভাটপাড়া কিংবা কলকাতাতে থাকলে কি পারত! বিশেষ করে ডাক্তারি জীবিকায় এখনও পর্যন্ত দেশে বিশ্বাস অর্জনের সূচকই যেন বাইফোকাল চশমা, দামি গাড়ি, চৌখশ কথাবার্তা। একমাত্র চুলটাই ইদানীং আর কারও পাকে না। কিন্তু চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের নীচে অন্তত ভাল ডাক্তার বলে কে-ই বা পাত্তা পায়!

আসলে অভিজ্ঞতার নামে, ডাক্তারি জীবিকায় বয়সের প্রতি আমাদের দেশে এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত নির্ভরশীলতার প্রবণতা আছে। আগে আরও বেশি ছিল, ইদানীং কমলেও, ব্যাপারটা আছে। এখনও অনেক বয়স্ক চিকিৎসক, যাঁদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত বদলে যাওয়া চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোনওই সম্পর্ক নেই, দিব্যি চুটিয়ে প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সেটা একমাত্র সম্ভব হয় তাঁদের বয়স্ক ভাবমূর্তির প্রতি কিছু মানুষের অন্ধভক্তির জন্য।

মানসকে দেখে দেবমাল্যর ভালই লাগে। এ দেশ তারুণ্যের মেধাকে স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করে না। মাত্র বছর চারেক এদেশে এসে মানস যে শুধু উইম্বলডনে বাড়ি কিনেছে, গাড়ি তো আছেই, তাই নয়, দু-এক বছরের মধ্যে ও যে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবেই কাজ করবে, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। আপাতত মানস সেন্ট জর্জেস হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগের সিনিয়র রেজিস্ট্রার, যার অর্থ ও বিশেষজ্ঞ হওয়ার পথেই পা রেখেছে।

মানসের কথাতেই চমক ভাঙে দেবমাল্যর।

শোন টিপলু, কাজের কথা বল, গ্লাসে চুমুক দিয়ে ও নিজেই আবার বলল, তোর আর কুন্তলার বিষয়ে আমি ন্যাচারালি খুব বেশি কিছু জানি না, আমাকে কেউ কিছু বলেওনি। যা এবং যেটুকু আমি বুঝেছি, সেটা খাপছাড়া ভাবে তোরই কিছু কথা, মন্তব্য এসব শুনে। আমার মনে হয়েছে, তুই বিয়ের পর থেকেই একটা ডিফিকাল্ট স্টেজের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিস, বোধহয় অনেকটাই কনফিউজড এবং আমার কাছ থেকে বোথ বন্ধু এবং সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে খানিকটা পরামর্শ এবং সাপোর্ট চাইছিস। ঠিক বলছি তো?

দেবমাল্য মাথা নাড়ল। —একদম ঠিক বলেছিস। সত্যি বলতে কী, এত বছর পরে আবার তোর সঙ্গে দেখা হওয়ায় এবং বিশেষ করে তোর প্রফেশন, সাবজেক্ট এসব জানার পরে, আমি একটা দারুণ ভরসা পেয়েছি। নয়তো এই বিয়ের পর থেকে আমি যে কী মানসিক অবস্থার মধ্যে কাটাচ্ছি... শুধু আমিই বা কেন, মা-বাবারও যা অবস্থা...।

খানিকটা আমি আন্দাজ করতে পারছি, মানস বলল, তবে একটা কথা তোকে বলে রাখি, আমার হেলপ বা সাজেশন শেষ পর্যন্ত কোনও কাজে লাগবে কি না জানি না। কিন্তু একটা ব্যাপারে তুই বা তোরা নিশ্চিন্ত থাকিস, আমি অফিশিয়ালি বা আনঅফিশিয়ালি যেভাবেই তোকে সাপোর্ট দিই না কেন, কনফিডেনশিয়ালিটি-র ব্যাপারে চিন্তা করিস না। কেননা, ব্যাপারটা সিরিয়াস আর ডেলিকেট তো বটেই, তা ছাড়া এটা আমার প্রোফেশনাল এথিকস।

আমি সেটা জানি মানস, দেবমাল্য বলল, ইনফ্যাক্ট সেই জন্য আমি এখনও কারও সঙ্গেই আমাদের ব্যাপার নিয়ে কোনও কথা বলিনি। অফকোর্স বাবা-মা জানে, তোর সঙ্গে আলোচনা করব।

একটু চুপ করে থেকে মানস বলল, এক কাজ কর টিপলু, তুই আগে আমাকে একেবারে তোর বিয়ের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে... কুন্তলাদের বাড়ি, ওদের ফ্যামিলি... মানে যতটা জানিস... সেখান থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত সিকোয়েন্স অব ইভেন্টস, তোদের কনজুগাল রিলেশনশিপ,

অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক, তোদের কাজ, প্ল্যানিং... ইত্যাদি ইত্যাদি যতটা ফ্র্যাঙ্কলি পারিস আমায় গুছিয়ে বল তো। মাঝখানে আমার কিছু জানার দরকার হলে, আমি ইন্টারাপ্ট করব। আদারওয়াইজ তুই যতটা ডিটেল পারিস, বল। হেজিটেট করিস না...। দাঁড়া... একটু রি-ফিল নিয়ে বসি...।

চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় যে কোথা দিয়ে কেটে গেছে দেবমাল্য টের পেল না। ও-ই বক্তা, মাঝখানে মাত্র দু-তিনবারের বেশি মানস ওকে থামায়নি, তাও নেহাত কয়েক সেকেন্ডের জন্য। শুধু পৌনে ছ-টা নাগাদ নির্জনতাকে আরও গভীর করেই যখন ও থামল, তখনই মনে মনে টের পেল, নিজেকে প্রকাশ করার জন্য সম্ভবত বেশ কিছু দিন ধরেই একটা নীরব প্রস্তুতি চলছিল ভিতরে ভিতরে। কে জানে, হয়তো এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই সেই প্রস্তুতি। একই সঙ্গে খেয়াল করল, মানসও ততখানি আগ্রহ নিয়েই ওর কথা শুনেছে, যতখানি ও আশা করেছিল এবং কোনও সময়েই সমস্ত ব্যাপারটার গুরুত্বকে ও হালকা ভাবে ধরার কিংবা বোঝার চেষ্টা করেনি। ওর ছোটখাটো মন্তব্য থেকেই সেটা মনে হচ্ছিল।

নিজের মধ্যে ভার নামার তুষ্টি অনুভব করল দেবমাল্য।

ফলের রসের তলানিটুকু গলায় ঢেলে বলল, তোর কাছে আমার গোপন করার কিছু আছে বলে একবারও মনে হয়নি। তা সত্ত্বেও, আর যদি কিছু তোর জানার থাকে, জিগ্যেস কর... যে কোনও ব্যাপারেই... আমি উত্তর দেব। অবভিয়াসলি তারপর জানতে চাইব, তুই এখন কী সাজেস্ট করিস।

সেটা পরের কথা। কিছুটা চিন্তাচ্ছন্ন গম্ভীর মুখে মানস বলল। তারপরেও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মনে মনে নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল। আরও একটু পরে বলল, দ্যাখ টিপলু, এতক্ষণ তোর কাছ থেকে যা শুনলাম, তাইতে আমি কুন্তলা সম্বন্ধে, ওঁদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড-রিলেশনশিপ, ওর আপব্রিংগিং-লেখাপড়া-কালচার... এমনকী টেম্পারামেন্ট সম্বন্ধেও বেশ খানিকটা আন্দাজ পেয়েছি। কিন্তু... ডোন্ট টেক মি রং, এই সব ভার্শানগুলোই কিন্তু তোর। তোরই

ইনফরমেশন অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট। আমি বলছি না তোর ইনফরমেশনগুলো ভুল। কিন্তু একজন সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে আমায় যখন এরকম একটা পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কিছু সাজেস্ট করতে হবে, কিংবা কমেন্ট করতে হবে, তখন কিন্তু আমায় কুন্তলার ভার্শানগুলোও শুনতে হবে, আলাদা করে ওকেও জাজ করতে হবে। অ্যাপারেন্টলি ওর যেসব আচার ব্যবহারগুলোকে অ্যাবনরম্যাল বলে মনে হচ্ছে, আমার জানতে হবে, ও কেন সেরকম করছে!

গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনতে শুনতে দেবমাল্য বলল, হ্যাঁ, সে তো ঠিকই।

মানস বলল, আমায় বুঝতে হবে, ও কি সত্যি সত্যি দীর্ঘকালীন কোনও একটা সাবকনশাস... অর্থাৎ অবচেতন মনের ব্যাধিতে ভুগছে, যার সিম্পটমগুলো ওইরকম অস্বাভাবিক আচরণের মধ্য দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে, না কি ওগুলো নেহাতই ওর পার্সোনালিটির এক্সপ্রেশন! ওর কনফিউজড আইডেন্টিটি অ্যাবাউট হারসেলফ অ্যান্ড আদারস? সেলফিশনেস, জেলাসি? হীনমন্যতা? ইনঅ্যাডিকোয়েট সেলফ-রেসপেক্ট, ফ্রাস্ট্রেশন, চাপা রাগ, কম সহ্যশক্তি? ...অর্থাৎ আমাদের সাইকিয়াট্রি-র ভাষায় যেটাকে বলি, মেন্টাল স্টেট অ্যাসেসমেন্ট, আমায় সেটা করতে হবে। কেননা, মনের রোগ বা পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার... বাংলায় যেটাকে ব্যক্তিত্বের গণ্ডগোল বলতে পারিস... দুটোর মধ্যে তফাত যেরকম আছে, আবার একটা সাযুজ্যও আছে। সেটা হচ্ছে, মন বা মানসিকতা থেকেই দুটোর উৎপত্তি। কিন্তু যেগুলোকে আমরা স্পেসিফিক্যালি মনের অসুখ বলি, সেগুলো অচেতন বা অবচেতন মনের অনিয়ন্ত্রিত প্রকাশ, আউটবার্স্ট। অনেক সময়েই সেগুলো যুক্তিহীন, উদ্ভট, ধাঁধার মতন, এমনকী অর্থহীন। কিন্তু পার্সোনালিটি প্রবলেম হচ্ছে আরোপিত, খুব সূক্ষ্ম অথচ একটা ইচ্ছাকৃত অনিয়ন্ত্রণ সেক্ষেত্রেও থাকে, কেননা, প্রতিটি পদে সেখানে একটু করে ইগো স্যাটিসফ্যাকশন হয়। আর ইগোটা কীরকম বল তো? কোনও কাজে না লাগলেও, ওটা যেন বিনাশহীন অস্তিত্বের মতন মনের মধ্যে

ঢুকে বসে থাকে। যারা পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারে ভোগে, তারা কখনও জেনে আবার কখনও না জেনেও, ওই ইগোর হাতের পুতুল হয়ে থাকে।

মানস থামল। বোধহয় এক টানা বেশ কিছু কথা বলার পরে দম নিতে চাইল। সেইসঙ্গেই কিছুটা ওর জটিল বক্তব্যের প্রতিক্রিয়াও দেখতে চাইল দেবমাল্যর ওপর। তারপর সামান্য হেসে বলল, হ্যাঁরে, কিছু বোঝাতে পারলাম, নাকি তোর কনফিউশন বাড়াচ্ছি?

ধীরেসুস্থে ঘাড় নেড়ে দেবমাল্য বলল, একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি— তুই মেন্টাল হেলথ ইলনেস আর পার্সোন্যালিটি ডিসঅর্ডার— এই দুটোর মধ্যে যে ডিফারেন্স আছে, সেটা বলতে চাইছিস। সম্ভবত বলছিস, মনের অসুখটা অরগ্যানিক... ব্রেন-এর কোনও গণ্ডগোল থেকে হয় বা হতে পারে, কিন্তু পার্সোন্যালিটি ডিসঅর্ডারটা অ্যাকোয়ার্ড। এনভায়রনমেন্ট-ফ্যামিলি-সোসাইটি... এই সব থেকে একটু একটু করে প্রভাবিত হতে হতে...।

ভেরি গুড, ভেরি গুড, বলতে বলতে হাত তুলে দেবমাল্যকে থামিয়ে দিল মানস। বলল, ওতেই হবে। এর মধ্যে আরও অজস্র জটিলতা আছে, কিংবা বলতে পারিস আরও নানান ফ্যাক্টর আছে, কিন্তু বেসিক ব্যাপারটা তুই ঠিকই ধরেছিস। শুধু আর একটা কথা বলি— অনেক সময়ই মনের অসুখ আর পার্সোন্যালিটি প্রবলেম আবার মেশামিশি হয়েও থাকে। আর সেক্ষেত্রে আমাদের কাজটা হয়ে ওঠে কঠিনতর। কিন্তু সেসব বাদ দে। আমি তো তোকে সাইকিয়াট্রি পড়াতে বসিনি! সেটা সম্ভবও না।

দেবমাল্য মন্তব্য করল, খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু।

মানস নিজের কথার টানেই বলে চলল, শোন, এখন যেটা করতে হবে, আমায় কুন্তলার সঙ্গে কথা বলতে হবে। যদি রাজি থাকে, তাহলে ওর দাদা-বউদির সঙ্গেও কথা বলব। কেননা আমাকে ওর মেন্টাল স্টেট অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে টু কাম টু আ ডায়াগনসিস। কিন্তু সেটাতে ও কি রাজি হবে? কিংবা সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাবার ব্যাপারে তোদেরও কোনও...

আমাদের দিক থেকে যে কোনও রিজার্ভেশন বা সংস্কার নেই, সেটা তো বুঝতেই পারছিস। দেবমাল্য বলল। তাহলে তোর সঙ্গে কথাই হত না।

নিশ্চয়ই মাসিমা-মেসোমশায়েরও তাই মত?

ওহ ইয়েস। দেবমাল্য বলল, কেননা তুই বুঝতে পারছিস তো... এই বিয়ের পর থেকে আমাদের ফ্যামিলি স্টেবিলিটি কী বিশ্রীভাবে ড্যামেজ হয়েছে, আর কী চূড়ান্ত অশান্তি ঢুকে গেছে সবার মনে! আমাদের এবং বিশেষ করে আমার সিচুয়েশন তো ডেসপ্যারেট এখন। প্রায় দু বছর ধরে আমি যে জীবনযাপনটা করে যাচ্ছি... এভাবে আর পারব না। তুই বিশ্বাস কর মানস, আয়াম গোয়িং টু বি রুইনড, অ্যাট দ্য সেইম টাইম... আওয়ার রিলেশনশিপ ইজ রুইনিং বাবা-মা টু-উ!

সামান্য ইতস্তত করে মানস বলল, একটা কথা জিগ্যেস করছি... অলদো আ বিট আর্লি, তুই কি শেষ পর্যন্ত কোনও একটা ফার্ম ডিসিশন নেওয়ার জন্য মেন্টালি প্রিপেয়ারড? আই মিন, সেপারেশন, ডিভোর্স এসবের কথাও ভেবেছিস?

সামান্য একটু ভাবল দেবমাল্য। তারপর বলল, দ্যাখ মানস, ভাবিনি বললে ভুল বলা হয়। পৌনে দু বছরের মধ্যে বেশ কয়েকবারই ভাঙাভাঙির কথা মনে এসেছে। কিন্তু এর পিছনে বাধা-ভয়-সংস্কার যা-ই বলিস না কেন, সেটাও একই সঙ্গে বার বার মনে এসেছে। আসলে... এমন একটা পরিস্থিতি কিংবা সম্ভাবনার মুখোমুখি যে হতে হবে, সেটাই তো কখনও মাথায় ছিল না। আমাদের ফ্যামিলি কিংবা কালচারেও তো এসব ব্যাপারগুলো এখনও জলভাত হয়ে যায়নি।

তার মানে, তোর মধ্যে এখনও বেশ টানাপোড়েন আছে, তাই তো?

ঠিক তাই। একবার মনে হচ্ছে, জীবনে এত বড় একটা ডিজাস্টার সামলাতে পারব কি না, কিন্তু তারপরেই আবার কুন্তলার... কী বলব, উন্নাসিক-ইররেশনাল-সেলফিশ-এক্সেন্ট্রিক বিহেভিয়ার-এ মনে হয়... ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। এস্‌পার-ওস্‌পার যা হোক কিছু একটা হয়ে যাক।

একটু চুপ করে থেকে মানস বলল, তোর কী মনে হয়, কুন্তলাকে আমি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলে ও আসবে?

আসলে ওর টেম্পারামেন্ট এত আনপ্রেডিক্টেবল...! একটু ভেবে নিয়ে দেবমাল্য আবার বলল, তবে এবার অন্তত ওকে আমি এমনভাবে বলব, দরকার হলে ওর দাদাকে দিয়েও বলাব, যাতে আসে। কিন্তু কথা হচ্ছে, ও কীরকম অ্যাটিচ্যুড নিয়ে আসবে...!

সেটা তুই আমার ওপর ছেড়ে দে। মানস বলল। তবে একটা কথা বলে রাখি, কোনও কিছুই হাইড করার দরকার নেই। তুই ওকে স্পষ্ট করেই বলবি, তোদের রিলেশনশিপের ব্যাপারে য়্যু নিড সাইকিয়াট্রিস্ট'স অ্যাডভাইস। তার পরে সাইকোথেরাপি বা ম্যারেজ কাউন্সেলিং কিংবা কম্যুনিটি সাপোর্ট বা সোশ্যাল সিকিউরিটি— যা দরকার হয় করা যাবে। কিন্তু ও যেন জেনে বুঝেই আসে যে যেভাবে তোদের জীবনযাপন চলছে, সেভাবে আর চলবে না। অ্যাটলিস্ট তুই সেটা আর চাইছিস না।

দেবমাল্য বলল, হ্যাঁ, ওকে আমি ক্লিয়ারকাট সব বলব বলেই ঠিক করে রেখেছি।

শুধু বলবি তাই নয়, মানস বলল, মেন্টালি প্রিপেয়ারড থাকবি ওর রিয়্যাকশনের জন্যও।

ওর কীরকম রিয়্যাকশন হবে বলে তুই অ্যান্টিসিপেট করছিস?

একটু হেসে মানস বলল, সাইকিয়াট্রিস্টরা অ্যান্টিসিপেট করে না, অ্যাসেস করে। বাট এনি ওয়ে।...তোকে বলতে আপত্তি নেই, এর আগে মাত্র যে এক-দুবার তোদের দেখেছি, তারপর আজকে যতখানি ডিটেল তোর কাছে শুনলাম, সব মিলিয়ে এটা কুন্তলার পার্সোনালিটি প্রবলেম বলেই আমার মনে হচ্ছে। কিন্তু তার মানে ভাবিস না, অসুখ হিসেবে এটা কোনও অরগ্যানিক মেন্টাল হেলথ ইলনেস থেকে কম সিরিয়াস কিছু। বরং মাঝে মাঝে শত চেষ্টাতেও এ রোগ সারে না... একটু ভাল হয়েও আবার ফিরে আসে। ওই যে ইগো-র কথা বললাম না... ওর তো ধ্বংস নেই।

দেবমাল্যর মুখ দেখেই মানস আবার বলল, তবে ডিসাপয়েন্টেড হোস না এখনই। পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার বহু রকমের হয়। আইডেন্টিফাই করতে হবে, ওরটা কী টাইপের। সঙ্গে আর কোনও প্রবলেম আছে কি না... তারপর ভাবতে হবে কী ধরনের ম্যানেজমেন্ট হবে। এদেশে অন্তত ব্যবস্থার অভাব নেই।

খাওয়া-দাওয়া সেরে দশটার আগেই মানসের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল দেবমাল্য। ঋতু ফিরে এসেছিল আটটা নাগাদ। তেমন ঘরোয়াভাবে কোনওদিন দেখা হয়নি ওর সঙ্গে, নেহাত মৌখিক আলাপ ছিল। অথচ আজ ছেলেকে নিয়ে ঋতু ফিরে আসার পর থেকে বার বারই ওর মনে হচ্ছিল, কেমন দিব্যি মানিয়ে নিয়ে সংসার করছে মেয়েটা! ওদের উপস্থিতির পর থেকেই যেন মানসের বাড়ির দীর্ঘক্ষণের সিরিয়াস আর নির্জনতার পরিবেশটা কেটে গিয়েছিল। তিন বছরের ছেলেটাও যেমন মিষ্টি, তেমনই সপ্রতিভ এই বয়সে।

এম-টুয়েন্টিফাইভ ধরে, ডার্টফোর্ড টানেল পার হয়ে ফিরে আসতে আসতে হঠাৎই আজ কেমন একটা অবসাদই যেন ঘিরে ধরল দেবমাল্যকে। অনুভূতিটা যে আগে থাকতেই একটু একটু করে মনের দখল নিচ্ছিল ও জানত। একটু সচেতনভাবেই চেপে রাখার চেষ্টা করছিল। কে জানে, তার মধ্যেই মানস টের পেয়েছিল কি না!

চলে আসার আগে মানসের মন্তব্যটা এখন আর একবার মনে পড়ল গাড়ি চালাতে চালাতে।

দরজার কাছে এগিয়ে দিতে এসে মানস বলেছিল, তুই কিন্তু বেশ ভালই ডিপ্রেশনে ভুগছিস... আমি জানি, সেটা নরম্যাল-ও। কিন্তু টিপলু, একটা কথা মনে রাখিস, তুই কিংবা তোরা তো কোনও অন্যায় করিসনি। কুন্তলার প্রবলেমটা ওদের বাড়ি থেকে তোদের বিয়ের আগে চেপে গেলেও, তোরা একটা পজিটিভ অ্যাটিচ্যুড নিয়ে সেটা সলভ করতে চাইছিস। এর থেকে ভাল হিউম্যান রিয়্যাকশন আর কী হয়! ভোগান্তি হচ্ছে জানি, কিন্তু সেটা নিয়েই ডুবে থাকিস না।...ইচ্ছে হলেই টেলিফোন করিস... ইট উইল বি সর্টেড আউট।

মাথা নেড়ে বন্ধুর হাত ধরেছিল দেবমাল্য।

মানস তখনই আবার বলেছিল, ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনে নিজেকে স্টেডি রাখতে পারলেই জানবি, য়্যু উইল উইন। ...খুব জ্ঞান দিলাম... সাবধানে গাড়ি চালাস। গুড নাইট।

অক্টোবরের শেষ দিকে লন্ডনের আকাশ পরিষ্কারই রয়েছে। তা সত্ত্বেও হঠাৎ-হঠাৎ মোটরওয়ের ওপব ঘন কুয়াশা, যাকে বলে, প্যাচি ফগ নেমে এসে মাঝেমাঝে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। সাবধানে গাড়ি চালাতে চালাতেই মানসের শেষ কথাটা আবার মনে পড়ল দেবমাল্যর। কথাটার সত্যি একটা জোর আছে। কিন্তু এরকম অবস্থায় নিজেকে স্টেডি রাখতে পারাটাও...।

সওয়া এগারোটার মধ্যে বিলারিকে পৌঁছে গেল দেবমাল্য। গাড়ি পার্ক করে লিফট-এ পাঁচতলায় উঠে এল, ক্রমশই মানসিক প্রস্তুতিটা ঝালিয়ে নিচ্ছিল, কুন্তলার সঙ্গে সহানুভূতি নিয়েই অকপট হতে হবে।

কিন্তু চাবি ঘুরিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকতে ঢুকতেই ও বুঝে গেল, কুন্তলা বাড়িতে নেই। বেরিয়ে গেছে।

৬

কিশলয় কিছুটা অস্থিরভাবে দেবতোষকে বলল, মেসোমশাই, কুন্তলা আমার বোন হলেও... আপনি বুঝতে পারছেন তো ওর সঙ্গে আমার দশ বছরের ওপর বয়েসের ডিফারেন্স।

দেবতোষ বললেন, হ্যাঁ সে তো আমি জানিই। তাহলেও...।

কিশলয় ওঁকে শেষ করতে না দিয়েই বলল, আর একটা কী ব্যাপার জানেন, ও যখন স্কুলে পড়ে আমি তখন থেকেই বাড়িছাড়া। আমি বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজের ছাত্র, হস্টেলে থাকতাম। সুতরাং ওর বড় হয়ে ওঠাটা অলমোস্ট আমার অ্যাবসেন্সেই হয়েছে।

সেটাও তো আমার না বোঝার কোনও কারণ নেই কিশলয়।

কিন্তু আপনি তো তা সত্ত্বেও আমাকে অ্যাকিউজ করছেন...

আরে না-না-না, ছি-ছি, রীতিমত ব্যস্ত হয়ে দেবতোষ বলে উঠলেন, তুমি আমায় ভুল বুঝছ কিশলয়। আমি তোমায় অ্যাকিউজ করছি না। ইনফ্যাক্ট কাউকেই কোনও রকম ভাবে দোষ দেওয়াটা আমার উদ্দেশ্য নয়।

কিশলয় বলল, কিন্তু আপনি তো এইমাত্রই বললেন... আমরা ওর জন্য কোনও রেসপন্সিবিলিটি নিচ্ছি না...। এ কথার মানে তো ইনডাইরেক্টলি শুধু আমাকেই না, আমাদের ফ্যামিলিকেই আপনি অ্যাকিউজ করছেন।

শোনো কিশলয়, দেবতোষ বললেন, তোমরা কিংবা তুমি মামণির জন্য কোনও রেসপন্সিবিলিটি নিচ্ছ না, এ কথা যদি আমি বলতাম, তাহলে তুমি যা বলছ, মানেটা তাই দাঁড়াত। কিন্তু আমি কি সে কথা বলেছি? এইরকম একটা স্ট্রেসফুল স্টেজে আমি সে কথা বলবই বা কেন! এমনকী তুমি যেটা আমাদের-তোমাদের বলে আলাদা আলাদা করে ভাবছ... আমি কিন্তু সেটাও মিন করিনি।

কিন্তু আপনিই তো বার বার রেসপন্সিবিলিটির কথাটা তুলছেন।

হ্যাঁ তুলেছি। তার কারণ সত্যিই তো এখন একটা অন্যরকম দায়িত্ব এসে পড়েছে। কিন্তু সেটা যে শুধু তোমার কিংবা তোমাদের ফ্যামিলির অথবা তার জন্য আমি কাউকে দোষারোপ করছি তা তো নয়। বরং এরকম একটা·সিচুয়েশনে আমাদের সকলেরই কিছু রেসপন্সিবিলিটি আছে এবং কীভাবে সেটা শেয়ার করতে পারি, সে কথাই আমি বলেছি। তুমি অহেতুক সেটা নিজের ঘাড়ে টেনে নিচ্ছ কেন?

কিশলয় বলল, আসলে মেসোমশাই, আপনার কথায় একটা অভিযোগের টোন আছে।

নিজের পুত্রবধূর জন্য অভিযোগ করা কি আমার শোভা পায় কিশলয়? দেবতোষ বললেন। তা সত্ত্বেও আমার কথায় যদি তোমার সেরকম মনে হয়ে থাকে, তাহলে বলছি, আয়াম সরি।

কথা হচ্ছিল কিশলয়ের ইকেনহাম-এর বাড়িতে বসে। দেবতোষ আর

নির্মলা এসেছেন মিনিট পনেরো-কুড়ি আগে। আগে থাকতে টেলিফোন করে রেখেছিলেন, সপ্তাহের যে কোনও দিন সন্ধের দিকেই তাঁরা আসতে পারেন। ইচ্ছে করলে কিশলয়রাও যেতে পারে তাঁর ব্যাসিলডন-এর বাড়িতে। শেষ পর্যন্ত কয়েকদিন সময় নিয়ে কিশলয়ই বুধবার সন্ধেবেলা ওঁদের আসতে বলে দিয়েছিল। মনে মনে কিঞ্চিৎ অস্থির হয়ে উঠছিলেন দেবতোষ, অহরহ একটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠার বাতাসও যেন ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাঁর বাড়িতে। কী জানি, কখন আবার কী শুনতে হবে টিপলুর কাছে... কুন্তলা কী কাণ্ড ঘটিয়েছে কিংবা কোথায় চলে গেছে...। অন্তত যথাশীঘ্র সম্ভব কিশলয়ের সঙ্গে তো কথা বলতেই হবে। কিন্তু ওর দিক থেকে যেন তেমন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না।

এদিকে কুন্তলার সেই রবিবার রাতে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনার পরে দশদিন কেটে গেছে। যদিও পরের দিন বিকেলে দেবমাল্য ওকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে, ওর বন্ধু শ্রীলার বাড়ি উডফোর্ডগ্রিন থেকে, তা হলেও হঠাৎই যেন ওদের পারিবারিক পরিস্থিতি একটা অন্যরকম ঝাঁকানি খেয়েছিল। একটা দিনের অভিজ্ঞতা অকস্মাৎ অন্যরকম সতর্কতায় তটস্থ করে দিয়েছিল দেবমাল্যর সঙ্গে সঙ্গে দেবতোষ-নির্মলাকেও। রাগারাগি, তর্কাতর্কি, বনিবনা নিয়ে অশান্তি, এমনকী দাদার বাড়ি চলে যাওয়া পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে একেবারে অন্য জায়গায় গিয়ে রাত কাটিয়ে আসার ঘটনা ঘটেনি ইতিপূর্বে। দেবতোষের মনে হয়েছিল, ছেলে আর ছেলের বউ-এর সম্পর্ক নিয়ে শুধু যে অশান্তি আর অনিশ্চয়তায় ভরা মন খারাপ হচ্ছে, তা নয়। কুন্তলার আচরণ এবার যেন ক্রমশ একটা ঝুঁকির চেহারা নিয়ে তাঁদের পারিবারিকভাবে বিপদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।

আর কিছু না হোক, অন্তত কুন্তলার নিকটতম আত্মীয় আর দাদা হিসেবে কিশলয়ের সঙ্গে কথা বলার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিলেন দেবতোষ। একবার ভেবেছিলেন, কলকাতায় ওদের পার্কসার্কাসের বাড়িতে টেলিফোন করে সোজাসুজি বেয়াইমশায়ের সঙ্গেই কথা বলবেন। কিন্তু এত দূর থেকে টেলিফোনের মাধ্যমে ঠিকমতো পারম্পর্য

রেখে, সমস্ত ব্যাপারটার গুরুত্ব কিংবা নিজেদের উৎকণ্ঠার সঠিক আন্দাজটা কি দিতে পারবেন! নাকি দিবাকরবাবুও তাঁদের মনের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন!

অশান্তি গোলমাল চলছে একথা তাঁদের অজানা নয়। সত্যি বলতে কী, বছর খানেক ধরেই যে কুন্তলার বাপের বাড়িতে এসব নিয়ে কথা চালাচালি হচ্ছে, সে খবর পেয়েছেন দেবতোষরা। আভাসে ইঙ্গিতে, চিঠিতে বা টেলিফোনে তিনি নিজেও যে তাঁর প্রচ্ছন্ন উদ্বেগের কথা একেবারে জানাননি তা নয়। অথচ মৌখিকভাবে সোচ্চার না হয়েও, সূক্ষ্ম ক্ষোভের সঙ্গেই দেবতোষ অনুভব করেছেন, দিবাকরবাবুরা যেন ব্যাপারটা টের পেয়েও জেগে ঘুমোচ্ছেন। কানে তুলতে চাইছেন না এমন একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পদসঞ্চার ঘটছে বলে।

কিন্তু এবার যে পরিস্থিতির অবনতি তাঁর ঘুম কেড়ে নেওয়ার আয়োজন করছে! আর কার সঙ্গেই বা তাঁরা কথা বলবেন! এদেশে নেহাত ঘনিষ্ঠ দু-একজন ছাড়া, এমন ঘরের কথা কি আর কারও সঙ্গে আলোচনা করা যায়! না কি ছেড়ে দেওয়া যায় শুধু টিপলুর ওপর। মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন দেবতোষ, কিশলয়ের সঙ্গে প্রাথমিক কথা তো বলতেই হবে। কিন্তু মাস দেড়েকের মধ্যে কলকাতায় গিয়ে অবশ্যই এবার খোলাখুলি কথা বলবেন কুন্তলার আর সব গুরুজনদের সঙ্গে। বিদেশবিভুঁই-এ একমাত্র ওর দাদা আর নিজেদের পরিবারের মধ্যে ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে আর রাখা যাচ্ছে না। উচিতও হচ্ছে না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কিশলয় বেজার মুখে বলল, তো আপনি এখন কী সাজেস্ট করছেন?

আমি তোমাকে স্পেসিফিক্যালি কিছু সাজেস্ট করছি না কিশলয়। দেবতোষ বললেন। কিন্তু ঘটনাটা জানার পরে দাদা হিসেবে...।

আমি কতখানি ইনভলভড হতে পারি আপনি বলুন!

দেবতোষ বললেন, না-না, বোনের ব্যাপারে তুমি কীভাবে, কতটা ইনভলভড হবে, কি হবে না, সেটাও আমি বলার কে?

শুনুন মেসোমশাই, কিশলয় বলল, কুন্তলা আমার বোন হলেও, শি

ইজ অ্যাডাল্ট, অন টপ অব দ্যাট কারেন্টলি শি ইজ ম্যারেড। আর একটা কথাও মাথায় রাখার দরকার— উই আর নাউ লিভিং ইন এ ফ্রি ডেমোক্র্যাটিক য়ুরোপিয়ান কান্ট্রি।

এগুলো সব আমি মাথায় রেখেছি কিশলয়। কিন্তু অ্যাডাল্ট আর ম্যারেড হলেও, ফ্রি কান্ট্রিতে বসবাস করলেও... ক্রাইসিস তো একটা হতেই পারে এবং তখন ভাবতে হবে...।

ভাবাভাবির কী আছে মেসোমশাই? কিশলয় দেবতোষের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, তখন এদেশের সিস্টেম, নিয়মকানুন অনুযায়ী ক্রাইসিস কীভাবে রিজলভ করা যাবে, তাই ভাবতে হবে।

কিশলয়ের কথাটা শুনলেন দেবতোষ। ও কি কিছু একটা ইঙ্গিত দিতে চাইছে টিপলু-কুন্তলার ভবিষ্যৎ জীবনযাপন নিয়ে? খুব সূক্ষ্ম একটা শাসানির সুরও কি রয়েছে ওর কথার মধ্যে!

একটু ভেবে নিয়ে দেবতোষ বললেন, দেশের সিস্টেম, আইনকানুন এসব তো আছেই। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সেই সব কথা টেনে না এনে... আমাদেরই কি পারিবারিক ভাবে কিছু উদ্যোগ আলোচনার দরকার নেই?

কিশলয় যেন একটু হালকা চালেই বলল, হ্যাঁ... সে সব তো হতেই পারে—।

হতেই পারে নয়, গলার সুরে কিঞ্চিৎ দৃঢ়তা মিশিয়ে দেবতোষ বললেন, সেটাই হওয়ার দরকার। আমি আজ এসেছিও সেই কারণে। একটা ছেলে আর একটা মেয়ের জীবন, ভবিষ্যৎ জড়িয়ে রয়েছে যেখানে, সেখানে তাদের পরিবারের লোক হিসেবে আমাদের আরও অনেক সিরিয়াস হয়েই কি ব্যাপারটা ভাবতে হবে না?

সেটা তো আমি অস্বীকার করছি না, মেসোমশাই।

তা করছ না, কিন্তু সত্যি সত্যি কতটা সিরিয়াসলি তুমি ভাবছ আমি জানি না। টিপলুর কথা ছেড়ে দাও, ওর ভাবনা তোমায় কিংবা তোমাদের ভাবতে হবে না। কিন্তু কুন্তলা আমার বউমা হলেও, তোমারও তো বোন। বিদেশবিভুঁই-এ তুমি আর বিদিশাই শেষ পর্যন্ত ওর ঘনিষ্ঠতম।

এখন অবস্থা যেদিকে গড়াচ্ছে, সেক্ষেত্রে তোমাদের তো ওর প্রতি কিছুটা নজর দিতেই হবে।

বুঝতে আমি সবই পারছি। তালুর ওপর আঙুল ঘষতে ঘষতে কিশলয় বলল, তবে কথাটা কী জানেন, আপনি হচ্ছেন রিটায়ার্ড ম্যান, ঝাড়া হাত-পা, আমি তো তা নই। নিজের কাজ, অনকল, ফ্যামিলি কমিটমেন্ট... এসব সামলানোর পরে, ম্যারেড বোনের লাইফস্টাইল নিয়ে কতটা ইনভলভড হতে পারব... কতটা উচিত... হয়েও কিছু লাভ হবে কি না... এসবই ভাবছি।

একটু হতাশভাবে দেবতোষ বললেন, দ্যাখো। আবার যোগ করলেন, আমরা এদেশে থাকলেও মানসিকতা, মূল্যবোধ এসব দিক দিয়ে তো পুরোপুরি ওয়েস্টার্নাইজড হয়ে যেতে পারিনি। এদের ভাবনায় যার-যার তার-তার বোধটা অনেক বেশি, আমরা এখনও কাছেপিঠের সবাইকে জড়িয়েমড়িয়ে নিয়ে চলতে চাই। এসবেরই পক্ষে বিপক্ষে, ভালমন্দ নিয়ে নানান যুক্তিতর্ক আছে, থাকবে, আমি জানি। কিন্তু এখন সেই সবের মধ্যে না গিয়েও, আমার মনে হচ্ছে, বিয়ের পর থেকেই টিপু-কুন্তলার জীবনযাপন যেভাবে আর যেদিকে গড়াচ্ছে, আমাদের দুই ফ্যামিলির তরফ থেকেই এবার বোধহয় খুবই সচেষ্ট হওয়ার দরকার, যাতে একটা বড় ধরনের ডিজাস্টার না ঘটে।

হঠাৎই কিশলয়ের একটা মন্তব্যে একটু নড়েচড়ে বসলেন দেবতোষ।

কিশলয় বলল, সে তো ঠিক আছে মেসোমশাই। কিন্তু মুখে আপনি ফ্যামিলির কথা বললেও, লাস্ট কিছুদিন আপনারাই তো ওদের কেসটা ফ্যামিলির বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন।

দেবতোষ ভুরু কুঁচকে বললেন, ফ্যামিলির বাইরে! তুমি ঠিক কোন ইনসিডেন্টের কথা বলছ?

আপনারা সে রাতে কুন্তলার বন্ধুর বাড়ি যাওয়াটা পুলিশকে জানাননি?

দাঁড়াও, দাঁড়াও, দেবতোষ সোজা হয়ে বসে বললেন, বন্ধুর বাড়ি যাওয়া মানে? ঘটনাটা কি অতই সিম্পল! বাড়ির বউ রাতবিরেতে

কাউকে কিছু না জানিয়ে, কোনও মেসেজও না রেখে, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল, কোথায় গেল তা পর্যন্ত কেউ জানে না। এ ঘটনাটাকে কি তুমি এলেবেলে একটা বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার মতো ঘটনা মনে করো?

যাই হোক, ব্যাপারটা তো বোঝা গেল তাই-ই।

না, ব্যাপারটা মোটেও তাই নয়। এবং বোঝাও গিয়েছিল অনেক পরে, যখন প্রায় রাত একটা নাগাদ শ্রীলার হাজব্যান্ড মলয় কিছু একটা গন্ডগোল বুঝে, টিপলুকে বাড়িতে টেলিফোন করে জানিয়েছিল যে মামণি ওদের বাড়িতে আছে।

কিন্তু রাতের মধ্যেই আপনারা জানতে তো পেরেছিলেন!

বাট ইন দ্য মিন টাইম...লং টু আওয়ারস টাইম ওয়াজ গন। আমাদের ওয়ারিজ তুমি কল্পনা করতে পারো? কাগজে-টিভিতে নিত্যদিন দ্যাখো না কী সব ঘটছে! তোমাকে ছাড়াও আরও সব পসিবল জায়গায় টেলিফোন করে, খোঁজ না পেয়ে, পুলিশকে জানানো ছাড়া আমাদের আর কী করার ছিল? তুমি হলে কী করতে?

কিশলয় অবলীলায় বলল, আমি হলে অন্তত রাতটুকু দেখতাম।

দেবতোষ রীতিমত অবাক হয়ে, প্রায় চল্লিশ বছরের ডাক্তারটির দিকে বোধহয় কিছুটা করুণা মিশিয়েই তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, নাহ...পুত্রবধূ হোক, নিজের মেয়ে হোক বা আত্মীয়স্বজন যেই হোক, এমনকী দেশে হলেও, মাঝরাতে একটা মেয়ে বাড়ি ছেড়ে কোথায় বেরিয়ে গেল...খবর না পেয়ে সারারাত অপেক্ষা করে বসে থাকার মতো... মনের জোর বা স্মার্টনেস কিংবা বোকামি বা স্বার্থপরতা, আমার দ্বারা সম্ভব হত না, হয়ওনি। আলটিমেটলি পুলিশকে জানানো ছাড়া আর কোনও অলটারনেটিভ আমাদের মাথায় আসেনি। আর তাইতে কোনও মান-সম্মানও ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে করি না।

কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে বসে থেকে কিশলয় আবার বলল, আপনারা তো সাইকিয়াট্রিস্ট-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন!

দেবতোষ এবার সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বললেন, আরও আগেই করা

উচিত ছিল।

কিন্তু সে ব্যাপারে তো আপনারা একবার আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন না?

কেন করব? এই দু বছব ওদের বিয়ে হওয়ার পরে, এমনকী তুমিও তো মাত্র মাসখানেকের আগে একবার হিন্ট পর্যন্ত দাওনি যে মামণির...কিছু মেন্টাল ডিসঅর্ডার আছে! দিয়েছিলে কি?

ওর এমন কিছু মেন্টাল ডিসঅর্ডার নেই, যেটা আপনাদের জানানোর দরকার বলে আমরা ভেবেছিলাম।

দেবতোষ বললেন, এমন কিছু বলতে তুমি কিংবা তোমরা কী মিন করছ... সেটা জানি না। তবে আমরা গন্ডগোল টের পাচ্ছিলাম অনেক দিন থেকেই। ন্যাচারালি সে এখন আমাদের বাড়ির বউ, তাকে ভাল করার জন্য যা দরকার মনে করেছি, তাই করছি। ...আর এখন তো ডাক্তার বলেই দিয়েছে, মামণির একটা পার্সোন্যালিটি ডিসঅর্ডার আছে, অ্যান্ড ইট স্টার্টেড সিন্স হার টিন এজ।

দেবতোষের কথা শেষ হতে হতেই কফির ট্রে হাতে নিয়ে বিদিশা ঘরে এল। পিছনে নির্মলাও এলেন। নিচু টেবিলের ওপর ট্রে রাখতে রাখতে বিদিশা বলল, মেসোমশাই, আপনাদের কথাবার্তা সবই শুনছিলাম, আর কিছু কিছু তো আমি নিজেই জানি। চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলের সামনে বসে আবার বলল, তবে এ বিষয়ে আমার কথা বলা কতখানি উচিত হবে জানি না—

দেবতোষ বললেন, উচিত হবে না কেন! তুমি মামণির বউদি, ওকে দেখেছ এবং জানো আমাদের থেকে অনেক বেশি—

না মেসোমশাই, সেটা ঠিক নয়। কাপে কফি ঢালতে ঢালতে বিদিশা বলল, বছর বারো আমার বিয়ে হলেও, শ্বশুরবাড়িতে আমি কমই থেকেছি। এ দেশেই চলে এসেছি ছ বছর হল। তার আগে মোটামুটি হাসপাতাল কোয়ার্টার্সেই কেটেছে। ছুটিছাটায় পানিহাটি বা পার্কসার্কাসে গিয়ে থাকতাম... সে আর কতটুকু!

হাতে হাতে কফির কাপ এগিয়ে দিল বিদিশা। নির্মলা কাপ হাতে

নিয়ে বললেন, তা হলেও তোমার মতামতের একটা মূল্য আছে বিদিশা। তুমি আমাকে যে সব কথাগুলো বলছিলে, সেগুলোই তোমার মেসোমশাইকে বলো না।

কিশলয় সম্ভবত আলোচনাটা চাপা দেওয়ার জন্যই দ্রুত বলল, দেখুন, আমার কিন্তু ঠিক এ ধরনের একটা ডিসকাশন পছন্দ হচ্ছে না। বিদিশা যেটা বলেছে সেটাই ঠিক। আমরা দুজনেই বহুকাল বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন। কী মতামত দেব?

বিদিশা যে বুদ্ধিমতী মেয়ে সেটা ওর পরের কথাতেই বোঝা গেল।

তাড়াহুড়ো না করে, কফির কাপে চুমুক দিয়ে ও বলল, আমরা খুব বেশি মতামত দিতে পারি না। আবার এখন আমাদের বাড়ির মেয়েকে নিয়ে যখন একটা সমস্যা শুরু হয়েছে এদেশে, আমরা পুরো চুপ করেও থাকতে পারি না। এদিকে আমরা ওর গার্জিয়ানও নই। কিন্তু মেসোমশাই-মাসিমার সঙ্গে, দাদা-বউদি হিসেবে দরকারে আমরা খানিকটা সাহায্য কি আর করব না!

কিশলয় চাপা বিরক্তি নিয়ে গম্ভীরভাবে বলল, সাহায্যই বা আমরা কতটুকু করতে পারি?

বিদিশা বলল, যেটুকু পারি, তাই করব। এখন ওঁদের বাড়ির বউ হলেও, কুন্তলা তো আর আমাদের পর নয়!

দেবতোষ বললেন, দ্যাখো, আমি গোড়ার থেকেই বলছি, টিপলু-কুন্তলার ব্যাপারটা এখন আর আমাদের-তোমাদের এভাবে ভাবলে চলবে না। ওরা স্বাভাবিক স্বামী-স্ত্রীর মতন জীবনযাপন করলেই আমরা সবাই খুশি। কিন্তু যেভাবে গত দু বছর ধরে, উন্নতির বদলে ওদের সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে, তাইতে আমরা কেউই কি পুরোপুরি শান্তিতে থাকতে পারছি? না ওয়ারিজ কমছে!

কিশলয় বলল, তাহলে ওদের দুজনের কার-কোথায়-কী গোলমাল সেগুলো সবই জাজ করা উচিত।

আমরা তো সেই চেষ্টাই করছি। দেবতোষ বললেন,কিন্তু.. আমার ছেলে বলে নয়, টিপলুর তো শারীরিক বা মানসিকভাবে কোনও

গোলমাল আছে এতকাল কেউ বলেনি, আমরাও জানি না। কিন্তু মামণির যে একটা মানসিক গণ্ডগোল আছে...।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া-রাগারাগি-মুড সুইং এগুলো কোনও মানসিক অসুখ নয়। কিশলয় বলল।

দেবতোষ বললেন,আসলে কোনটা কী, কিসের থেকে কী হচ্ছে, কেন হচ্ছে... সেসব সাইকিয়াট্রিস্টই বলবেন। তুমিও ডাক্তার, তুমি যা বলছ সেটাও আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু সাইকিয়াট্রিস্ট তো তোমাদের সঙ্গেই কথা বলতে চাইছেন। এ দেশে তুমি আর বিদিশা ছাড়া আর কে আছে যে মামণির পাস্ট লাইফ, বিহেভিয়ার-ইমোশন-অ্যাবিউজ-পারসোন্যালিটি... এসব নিয়ে কথা বলতে পারে!

বিদিশা হঠাৎ বলল, মেসোমশাই, আমরা এদেশে না থাকলে কি কুন্তলার তাহলে চিকিৎসা হত না?

কেন হবে না? কিন্তু তোমরা যখন ওর ইলনেস সম্পর্কে খানিকটাও অন্তত জানো, সেটুকু সাইকিয়াট্রিস্টকে বললে, চিকিৎসাপত্রের ব্যবস্থাটা ভাল হত.. এটুকুই। আলটিমেটলি আমরা সবাই কী চাই? মামণি নরম্যাল হয়ে যাক এবং ওরা ওদের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করুক... এই তো!

নির্মলা চুপচাপ শুনতে শুনতেই বললেন, আমি তো সেই কথাই বিদিশাকে বলছিলাম। যেটুকু তোমরা জানো... যেমন আমাকে বলছিলে, সেগুলোই স্পেশ্যালিস্টকে বলো... তার পর দেখা যাক কদ্দুর কী হয়!

দেবতোষ সিরিয়াস মুখে বললেন, আসলে এখন আর আমাদের নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকার কোনও সময় নেই।

কিশলয় বলল, ঠিক আছে... আমিও একবার বাবা-কাকা-দাদার সঙ্গে কথা বলব।

তুমি বলো, দেবতোষ বললেন, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আমিও কলকাতায় যাচ্ছি, বেয়াইমশায়ের সঙ্গে আলোচনা করব। তবে এর মধ্যে যাতে চিকিৎসাপত্রটা চালিয়ে যাওয়া যায়...।

বিদিশা হঠাৎ বলল, ঠিক আছে মেসোমশাই, ওর যদি সময় না-ও হয়, আমি একবার সাইকিয়াট্রিস্ট-এর সঙ্গে কথা বলব।

কিশলয় রীতিমত ক্রুদ্ধ চোখে একবার বিদিশার দিকে তাকিয়েই দৃষ্টি ফেরাল দেবতোষের দিকে। বলল, আপনি দেবমাল্যকে বলবেন, সেন্ট জর্জেস-এর সাইকিয়াট্রিস্ট-এর ডিটেলটা একবার আমায় দিতে। আর কুন্তলার সঙ্গেও আমি কথা বলব।

দেবতোষ বললেন, বলো। তুমি ওর নিজের দাদা, তোমার কথা ও অন্যরকম ইম্পর্টেন্স দিয়ে শুনবে।

আমার কথা শোনার থেকে, এখন তো আমার মনে হচ্ছে, ওকে অন্যান্য কিছু ব্যাপারেও ইনসট্রাকশন দিতে হবে।

দেবতোষ একটু অবাক হয়েই বললেন, অন্য ব্যাপারে ইনসট্রাকশন মানে?

মানে... সামান্য ইতস্তত করে কিশলয় বলল, আপনারা এখন যেহেতু পুলিশকেও ইনভলভ করেছেন, তখন শি অলসো শুড নো অ্যাবাউট হার লিগ্যাল রাইটস।

দেবতোষ আরও অবাক হয়ে বললেন, তার মানে তুমি কী বলছ, মামণি সলিসিটারের অ্যাডভাইস নেবে?

দরকার হলে তাও নিতে হবে।

কেন? সলিসিটার ওকে কোন ব্যাপারে অ্যাডভাইস দেবে? আর তুমিই বা কোন ক্যাপাসিটি থেকে ওকে হেলপ করবে ভাবছ?

দেখুন মেসোমশাই, আমি তো দেখতে পাচ্ছি ঝামেলাটা এখন আমার ঘাড়েই এসে পড়ছে। এদিকে আমার সেই সময় নেই যে বোনের ব্যাপার নিয়ে ছোটাছুটি করব। কিন্তু প্রোটেক্ট করার জন্য ব্যবস্থা তো নিতেই হবে। আমি ছাড়া কে করবে।

হতাশভাবে মাথা নেড়ে দেবতোষ বললেন, আমার মনে হচ্ছে, এতক্ষণ ভস্মে ঘি ঢালা হল! কিছু মনে করো না কিশলয়, তোমার ভাবনা-চিন্তার লাইনটা ঠিক নেই। এতক্ষণ ধরে আমি যা বলতে চাইলাম, মনে হচ্ছে, সবই 'উলটো বুঝলি রাম' হয়ে দাঁড়াল। মামণিকে

তুমি প্রোটেস্ট করতে যাবে কেন! সেজন্য তার হাজব্যান্ডই তো রয়েছে।

কিশলয়ের আশঙ্কা মেশানো চাপা ক্ষোভটাই প্রকাশ হয়ে পড়ল। বলল, কিন্তু হাজব্যান্ড-ই তো পুলিশকে খবর দিয়েছে!

সো হোয়াট! রাতে বাড়ি ফিরে বউকে না পেলে, শেষ পর্যন্ত পুলিশের মিসিং স্কোয়াডকে জানানোটাই তো রীতি!

কিশলয় খানিকটা এলোমেলোভাবে বলল, তা হলে পুলিশ ব্যাপারটা তারপর ফলোআপ করবে না!

করত, যদি মামণিকে খুঁজে না পাওয়া যেত। দেবতোষ বললেন, কিন্তু শ্রীলার হাজব্যান্ডের কাছ থেকে খবর পাওয়া মাত্রই তো আমরা পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছি এবং এফ আই আর উইথড্র করে নিয়েছি। পরের দিন সকালে টিপলু থানায় গিয়ে কাগজপত্র সইসাবুদও করে দিয়ে এসেছে।

কিশলয় যেন আর বলার কিছু না পেয়ে, নিজের জেদ বজায় রাখার মতো বলল, ইন এনি কেস... ভবিষ্যতেও এসব নিয়ে কোনও গন্ডগোল বাধলে... আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

দেবতোষ স্বগতোক্তির মতন বললেন, ভবিষ্যতের কথা তো পরে... এখন বর্তমানটা নিয়েই আমাদের ভাবনাচিন্তা করার দরকার বেশি! আজ আমাদের আসার উদ্দেশ্যও ছিল তাই। কিন্তু বুঝতে পারছি না... ঠিক..। আর কিছু না বলে চুপ করে গেলেন দেবতোষ।

একটু পরে নির্মলার দিকে তাকিয়ে বললেন, চলো, আমাদের এবার উঠতে হবে।

ওঁদের আগেই দ্রুত উঠে দাঁড়াল বিদিশা। বলল, আর একটু বসুন মেসোমশাই। আমার মনে হচ্ছে, টেনশনে আর দুশ্চিন্তায় ও একটু বেশি ...।

তা নয় বিদিশা, দেবতোষ বললেন, একটা ব্যাপার আমি বুঝতে পারছি, কিশলয় যত না মামণি আর টিপলুর সম্পর্ক— বনিবনার সমস্যা নিয়ে ভাবছে, তার থেকে বেশি ভাবছে— সেই সবের পরিণতি নিয়ে। আমরা কিন্তু সমাধানের কথাটাই ভাবছি।

তাই তো ভাবতে হবে মেসোমশাই। বিদিশা বলল, তা নইলে তো ওদের দুজনের জীবনেই যে বড় ধাক্কা এসে যাবে।

নির্মলা বললেন, ঠিকই তো, কোনও বাবা-মা-ই কি ছেলে-মেয়ের জীবনে অমন ধাক্কা আসুক চাইবেন? আমরা তো কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি, ছেলের বিয়ে দেওয়ার পর এমন একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।

কিশলয় বলে উঠল, কিন্তু বিয়ে দেওয়ার আগে আপনারা তো মেয়ে দেখেই নিয়েছিলেন।

দেবতোষ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ কিশলয়। কিন্তু আমাদের তো মেয়ে দেখে বিয়ে দেওয়ার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না ... প্রয়োজন আছে বলেও ভাবিনি। এখন জানতে পারছি, অ্যারেঞ্জড ম্যারেজে ছেলে এবং মেয়েকে বাজিয়ে নেওয়ার জন্য নানান টেকনিক, প্রশ্নমালা এমনকী বই পর্যন্ত পাওয়া যায়, আর তাইতে ধামাচাপা দিয়ে রাখা অনেক গন্ডগোলের হদিশও বেরিয়ে আসে। কিন্তু এখন গতস্য শোচনা নাস্তি। চেষ্টা করতে হবে যাতে ওদের মধ্যে মিলমিশ হয়ে যায় ... না হলে খেসারত দিতে হবে। নির্মলার দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন, ওঠো।

বিদিশা বোধহয় আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, আপনি বিশ্বাস করুন মেসোমশাই, এদেশের পাত্রর সঙ্গে কুন্তলার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে, জানার পরে আমি ওকে বলেছিলাম ... আপনাদের একটু হিন্ট দিতে যে কুন্তলা একটু মুডি ... ছোটবেলা থেকেই ও যে একটু অন্যরকম, এটা আপনাদের না জানানোর কী ছিল! এমনিতে লেখাপড়া করা, স্মার্ট মেয়ে ...।

দেবতোষ বললেন, এমন তো হতেই পারে। আর কিছু না, একটু ধারণা থাকলে হয়তো আরও আগে থাকতে আমরা মামণির জন্য ... বাট এনি ওয়ে ... এখনও যা যা করার করতে তো হবেই। আর সেইজন্য তোমাদের ফ্যামিলি থেকেও আমরা একটু কোঅপারেশন এক্সপেক্ট করি। কোনও অভিযোগ করা কিংবা কারও ওপরেই দোষ

চাপানো আমাদের উদ্দেশ্য নয় ... । তাতে লাভটাই বা কার!

বিদিশাও দাঁড়িয়ে উঠে বলল, আমাদের কোঅপারেশনের জন্য আপনি ভাববেন না। কিন্তু বুঝতে পারছেন তো, যার জন্য কোঅপারেট করব, সে কতখানি আমাদের কথা শুনবে ...।

দেবতোষ বললেন, নিজের ভালমন্দ বোঝার মতো বোধবুদ্ধি মামণির নেই বলে তো মনে হয় না। শুনলাম, সাইকিয়াট্রিস্টও বলেছেন, ওর যে ইনসাইট নেই, তা নয়। কিন্তু সম্পর্ক-অধিকার-অ্যাডজাস্টমেন্ট এসব ব্যাপারে ওর কতকগুলো ফিক্সড আইডিয়া আছে ... সেগুলো ঠিক নয়। সামহাউ ছোটবেলা থেকে সেগুলো ওর মধ্যে গেঁথে বসে গেছে। তেমন কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, যাতে সেগুলো উপড়ে তুলে দেওয়া যায়। এখন সেই চেষ্টা করতে হবে, আর তার জন্য আমাদের সবাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওকেও পরিস্থিতিটা বুঝতে হবে।

কিশলয়ের ঝুম হয়ে বসে থাকা দেখেই মনে হচ্ছিল, ও একসঙ্গে অনেক কিছু চিন্তা করছে।

হঠাৎ কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলল, আমার মনে হচ্ছে, এসব সমস্যার সমাধান দেশে গিয়েই করতে হবে। দেবতোষের দিকে তাকিয়ে যোগ করল, আপনি তো কলকাতায় যাচ্ছেনই, বাবা-দাদার সঙ্গে কথা বলুন ... দেখুন কে কী সাজেস্ট করে।

আর খুব বেশি আলোচনার মধ্যে না গিয়ে সে রাতে ফিরে এসেছিলেন দেবতোষ-নির্মলা।

একটা বিষয় তাঁদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, টিপলু-কুন্তলার সম্পর্কজনিত সমস্যা নিয়ে যেভাবে তাঁরা জড়িয়ে পড়েছেন এবং সমাধানের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন, কিশলয় কুন্তলার নিজের দাদা হলেও এবং এদেশে বসবাস করলেও, ওর দিক থেকে তেমন আগ্রহ নেই। বাস্তব অবস্থাটার যে গুরুত্ব দিচ্ছেন না দেবতোষ তা নয়। কিশলয় যে একটা পূর্ণ সময়ের সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার, এদেশে ডাক্তারদের কতখানি দায়দায়িত্ব, উদ্বেগ, এসব তাঁর না বোঝার কোনও কারণ নেই। তা ছাড়া অবশ্যই তার নিজেরও সংসারধর্ম আছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও,

ক্রমশ উদ্ভূত এমন একটা অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে দাদা হিসেবে, অন্তত ভাবনাচিন্তার দিক থেকেও ওর যেন ততখানি উৎকণ্ঠা বা সিরিয়াসনেস নেই। বরং ওর উচ্চারিত, ঝামেলা, গন্ডগোল, ঘাড়ে পড়ে যাওয়া— শব্দগুলোই যেন কিছুটা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

তাহলে কি নিজেদের পরিবারের সকলের মধ্যে ওদের তেমন একটা সম্পর্কের বাঁধন নেই?

তা ছাড়া এখন থেকে 'লিগ্যাল রাইট' জাতীয় ভাবনাটাই বা ওর মাথায় আসে কী করে!

ওরা কি ধরেই নিয়েছিল, বোনের বিয়ের পরে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, যখন নিজেদের সুরক্ষিত রাখার কথা ভাবতে হবে!

না কি এই সবই দুশ্চিন্তার চাপে অতিরিক্ত নেতিবাচক ভাবনা দেবতোষেরই?

কিন্তু একথা তো ঠিকই, বিয়ের আগে ওদের পরিবার থেকে কোথাও একটু গোপনীয়তা, একটু তঞ্চকতা, কিছু চেপে যাওয়ার ব্যাপার ছিল। বিদিশা তো বটেই, এমনকী কিশলয়ও এখন চাপে পড়ে সে কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারছে না।

অদ্ভুত একটা নিঃসঙ্গতার বোধ আর বেদনার একাকিত্বে ডুবে যান দেবতোষ। তাঁরা কি খুব সনাতন আর পুরনোপন্থী মানসিকতার বশবর্তী হয়ে, মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে টিপলুর জীবনে একটা স্থায়ী দুর্ঘটনার প্রভাব ফেলে দিলেন! আরও বেশি সতর্ক, আরও বেশি খোঁজখবর নেওয়া, অভিজ্ঞ আরও কিছু মানুষের মতামত, আরও সময় নেওয়ার বা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল!

কিন্তু প্রত্যাশিত সবরকম খোঁজখবর-আয়োজন-নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার পরেও কি দুর্ঘটনা ঘটে না! কী বলা হবে সেক্ষেত্রে? নিয়তি? ললাটলিখন? নাকি বিবাহ-নামক এই ঘটনাটার মধ্যেই একটা ঝুঁকির সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন সন্নিবিষ্ট হয়ে রয়েছে! মনে মনে স্বীকার করেন দেবতোষ, আসলে যে পদ্ধতিতে এখনও তাঁদের সমাজে বিবাহের রীতি ও আয়োজন হচ্ছে, সেই পদ্ধতিতে বরাবর উত্তরকালের জন্য কিছু

অনিশ্চয়তা থেকে যাবে। আবার সবক্ষেত্রে যে বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভব হবে, তাও না। যদি হত, তাহলে খবরের কাগজের পাতা জুড়ে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন এমন বেড়েও যেত না।

আরও এক ধাপ এগিয়ে দেবতোষ ভাবেন, আসলে বিবাহ ব্যাপারটার সম্পর্কে তাঁদের দেশীয় দৃষ্টিভঙ্গিটাই পালটানো দরকার। কই, এদেশের কোনও কাগজে তো পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপন থাকে না। তা সত্ত্বেও তো বিয়ে হচ্ছে। কিন্তু এ দেশীয় কোনও বিবাহেই প্রথম থেকে পরিবারের কোনও ভূমিকা থাকে না। প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দুটি মানুষ, তারও আগে এবং পরে তারা ঘনিষ্ঠ হয়, বোঝাবুঝির বেশ কিছু স্তর পার হওয়ার পরেই তারা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেয়— হ্যাঁ অথবা না।

কিন্তু এই একই পদ্ধতিতে নির্বাচন কি আমাদের মানসিকতায় গৃহীত হবে!

একে একে আরও অজস্র প্রশ্ন মাথায় আসে দেবতোষের। আর ক্রমশই টের পেতে থাকেন সেইসব প্রশ্নের মধ্যে মিশে রয়েছে আজন্মলালিত সংস্কার-রুচি-বোধ-শিক্ষা, সমাজ-অর্থনীতি, সম্পর্ক ও যৌনতার বিষয়ে মতামত, ধর্মীয় অনুশাসন এবং রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো এবং আইন।

একসময় সত্যি সত্যি নিজেকে প্রশ্ন করেন দেবতোষ, বিবাহ ব্যাপারটার কি আদৌ কোনও প্রয়োজন আছে?

মানুষের যদি শিক্ষা-অনুভূতি-আন্তরিকতা-দায়িত্ব ...। থাক।

ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণে বাঁধেন দেবতোষ। বুঝে ফেলেন, লাগামছাড়া এমন ভাবনার দৌড় তাঁকে কোথাও পৌঁছতে সাহায্য করছে না। তাঁর সাম্প্রতিক মনোবেদনারও কোনও উপশম হচ্ছে না। যুক্তি-তর্ক-নীতি-বাস্তবতার প্রকট স্বরূপ যেখানে নিশ্চিন্তির পূর্ণচ্ছেদ দিয়ে দেয়, মানবিক এবং মানসিক চলাচলের সীমাহীন গতি তারপরেও কোনও ভাবের আকাশ খোঁজে, কিছু ছুঁতে চায়।

কী সেই চাওয়া?

সুখ নয়, অর্থ নয়, যশ নয়, জয় নয় ; এক অপার্থিব-নিবিড়-অলৌকিক

অনুভব— ভালবাসা আর শান্তি। বিবাহ আসলে একটি প্রয়োজনীয় অনুশাসন ও ভণিতা।

নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই বৈধব্যের রিক্ততা নিয়ে শীর্ণ আর শীতল হয়ে গেল দেশটা। পাতা ঝরিয়ে ঝরিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেল গাছেরা। কনকনে হাওয়ার সঙ্গে মাঝেমাঝেই উড়ো ঝুরো বৃষ্টি। নৈঃশব্দ্য আর আঁধারে ডোবা সারাদিনের মধ্যে কখন যে সংক্ষিপ্ত দিনের আলোটুকু ফোটে এবং ফুরিয়ে যায় টের পাওয়া যায় না। রাতের শিশির সাদা তুষারের স্তর হয়ে জমে থাকে বাগানে, ঘাসজমির ওপর। অভ্যস্ত কাজের মানুষ, দেশ-সময় সবই প্রায় নিখুঁত ছন্দে আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলেছে।

বছরান্তে একবার দেড়-দু মাসের ছুটিতে দেশে যাওয়ার জন্য নানান প্রস্তুতি সারতে হচ্ছে দেবতোষ-নির্মলাকে। বিশেষ করে নজর রাখতে হয় বাড়ির হিটিং ব্যবস্থা আর জলের পাইপ লাইন ইত্যাদির প্রতি। ইদানীং তুষারপাত অপেক্ষাকৃত কম হলেও, ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে তাপমাত্রা শূন্যের নীচে চলে যায় প্রায়ই। ঘরবাড়ির উষ্ণতা ঠিকমতো বজায় না থাকলে, পাইপের মধ্যে জল জমে গিয়ে ফেটে যাওয়ার ঘটনা খুব বিরল নয়। কিছু কেনাকাটা, বাজার-দোকান থাকেই। প্রতিবারেই ভাবেন এসব এবার বন্ধ করে দেবেন। দেশে, কলকাতার বাজারে সব বিদেশি জিনিসপত্রই সহজলভ্য। সব হয়তো খাঁটি নয়, তা হলেও মানুষ আকছার সেসব ব্যবহার করেন। উপহার কিংবা কারও জন্য কিছু নিয়ে যেতে সামান্য ঝুঁকিও অনুভব করেন দেবতোষ ইদানীং। ঝুঁকিটা সমালোচনার। মুখের ওপর কেউ কিছু না বললেও, পরে মন্তব্য শুনেছেন— শস্তার জিনিস দিয়েছে! গাল বাড়িয়ে চড় খেতে যাওয়ার কী দরকার!

কিন্তু ওই ভাবনা পর্যন্ত। খুব বেশি কেউ না থাকলেও, চেনামুখগুলো মনে পড়ে। বোন-ভগ্নিপতি, ছেলেমেয়েরা, অল্পকিছু আত্মীয়স্বজন, দেবতোষ এবং নির্মলারও, ভাটপাড়ার কিছু পুরনো প্রিয়জন আছেন। নতুন ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের সঙ্গেও খুচরো সৌজন্য বিনিময় শুরু হয়েছে।

টিপলুর শ্বশুরবাড়িতে গতবছরও কুটুম্বিতার খাতিরে কিছু জিনিসপত্র উপহার নিয়ে গিয়েছিলেন। এ বছরে ইচ্ছেটা যেন কিছুতেই ভেতর থেকে আসছে না। বরং একটা অনীহা অনুভূত হচ্ছে। এখানকার খবরাখবর ওঁরা পান না, বা পাচ্ছেন না, তা তো নয়! কিন্তু একটু যে যোগাযোগ করা কিংবা রাখা ওঁদের কাছেও আশা করেন দেবতোষরা, সেটা তো মনে হয় না!

দেবমাল্যকেই ভেবে দেখতে বলেছিলেন দেবতোষ, ওঁদের সঙ্গে কিংবা আগে-পরে, কুন্তলা-সহ ওরাও একবার কলকাতায় ঘুরে আসবে কি না। শুনে অবাকই হয়েছিলেন দেবতোষ। কুন্তলার কোনও আগ্রহ নেই বাপের বাড়ি যাওয়ার। মেয়েদের আবার অমন হয় নাকি? দেবতোষ ভেবেছিলেন। বরং বিয়ের পরেই তো মেয়েরা যেন দশগুণ বেশি বাপের বাড়ি অন্তপ্রাণ হয়ে যায়! শ্বশুরবাড়ির পরিবার-প্রতি একটা উপহার কিনলে, বাপের বাডির জন্য জনে-জনে জিনিস কেনে বিবাহিত মেয়েরা।

মেয়েটার যে কী ভাবনাচিন্তা বুঝে ওঠেন না দেবতোষ। এদিকে মুখে তো বাপের বাড়ির কৌলিন্য প্রমাণে কুন্তলা পঞ্চমুখ।

মাথা ঘামাননি দেবতোষ আর। এমনিতেই যা টানাপোড়েন চলছে!

কিশলয়ের বাড়ি থেকে ঘুরে আসার পরেও চার-পাঁচদিন কেটে গেছে। নিয়মিত খবরাখবর পান না। মাঝেমাঝে মনে হয়, না পাওয়াই ভাল। কথা আছে, নো নিউজ ইজ গুড নিউজ। এটুকু জানেন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখেছেন কুন্তলাকে, হয়তো কাউন্সেলিং, থেরাপি-টেরাপিও চলছে। চলুক। নিজেদের দায়দায়িত্ব-ঘরসংসার-সামাজিকতাও তো আছে। শক্তিদা-বন্দনাদি দুজনেরই শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। বন্দনাদির একটা নি-রিপ্লেসমেন্ট অপারেশন হয়েছে। ভাইঝি তৃষাই দেখাশোনা করছে। ওর বাবা-মা আমেরিকা ফিরে গেলেও, তৃষা থেকে গিয়েছিল— ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডন-এ ও একটা ট্রেনি ফেলোশিপের অফার পেয়েছে বলে। ওদিকে বছরে একবার বন্দনাদির ফাল্গুনী-সংস্থার পক্ষ থেকে এপ্রিল মাসের প্রথম শনিবার যে সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যাপার থাকে, দেবতোষ তো সেসব প্রায় ভুলতেই বসেছেন। দেশে যাওয়ার আগে সেইসব খোঁজখবরও কিছুটা নিতে হবে।

বেলা ছোট হয়ে আসা এবং দেরিতে সকাল হওয়ার জন্য ব্রেকফাস্ট খাওয়া আর হয় না। চা-এর পরে নিত্যদিনের কাজ সারতে সারতে বেলা হয়ে যায়। সাড়ে এগারোটা পৌনে বারোটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ মিশিয়ে 'ব্রাঞ্চ' খেয়ে নেন দেবতোষ আর কুন্তলা। কিছু সিদ্ধ সবজি, ব্রাউন লো-ক্যালরি ব্রেড-এর টোস্ট, একটু চিকেন রোস্ট বা আগের দিনের রান্না করা মাছ আর কিছু ফলমূল ... এই।

রান্নাঘরে সেইসবই আয়োজন করছিলেন দুজনে। ডোরবেল বাজার শব্দেই বুঝলেন, কাজের দিন এ সময়ে স্টুয়ার্ট ছাড়া আর কে-ই বা আসবে! নিজে থেকেই হয়তো এ বাড়ির জন্য কোনও দায়িত্বের কথা ওর মনে পড়েছে।

দরজা খুলতে গেলেন দেবতোষ। মুহূর্তের বিস্ময়ে প্রায় আকাশ থেকে পড়লেও, সেই ভাবটা গোপন রাখার চেষ্টাতেই যেন বেশি করে আন্তরিক সুবে বাজলেন।

ও মা, মামণি যে! এসো, এসো ... টিপুও এসেছে, না তুমি একা? এসো, আগে ভেতরে এসো। ওগো, শুনছ ...

ডাকাডাকি শুনে বেরিয়ে এসেছেন নির্মলাও। সম্ভবত মামণি নামটাও তাঁর কানে গিয়েছিল। বেরিয়ে এসেই পুত্রবধূর হাত ধরলেন। এসো মামণি। কদিন ধরেই ভাবছিলাম খবরটবর কিছু পাইনি—

শাড়ির ওপর লম্বা কোট পরে এসেছে কুন্তলা। গলায় লাল স্কার্ফ। জুতো খুলতে খুলতে বলল, কীরকম খবর আশা করছিলেন?

হাসি নয়, মুখে ব্যঙ্গ করার অভিব্যক্তিও নেই। তা হলেও প্রশ্নের ধরনে ঢোক গিললেন নির্মলা। আমতা আমতা করে বললেন, রকমটকম কিছু না ... কথা হয়নি তো বেশ কদিন ... একাই এসেছ?

হাতের ব্যাগ সিঁড়ির রেলিং-এ ঝুলিয়ে রেখে কুন্তলা বলল, আপনাদের এখানে একা। ঘর থেকে একা বেরোইনি।

নির্মলা প্রশ্ন না করে শুধু বললেন, ওহ।

কুন্তলাই আবার বলল, ড্রাইভিং লেসন নিচ্ছি, ইনসট্রাক্টরকে বলে রেখেছিলাম— ব্যাসিলডনে নামিয়ে দিতে।

খুব ভাল করেছ, নির্মলা বললেন। চলো, একেবারে রান্নাঘরেই এসো, খাওয়ার ব্যবস্থা করছিলাম, তুমিও বসে যাবে চলো।

দেবতোষও সায় দিলেন। দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ তাই চলো, খেতে খেতে কথা বলা যাবে। এসো।

ও বাড়ি থেকে আমি খেয়ে বেরিয়েছি। আপনারা শেষ করে নিন, ততক্ষণ আমি টিভি দেখছি।

নির্মলা বললেন, তাহলে তুমি কি শুয়ে একটু বিশ্রাম নেবে মামণি? ওপরে বিছানাটিছানা ...?

কিছু দরকার নেই, আপনারা সেরে নিন। দু-একটা ফোন করতে হবে আমায়, তারপর কথা আছে আপনাদের সঙ্গে।

নিজের থেকে বসার ঘরে ঢুকে গেল কুন্তলা। দেবতোষ-নির্মলা দুজনেই অনুভব করলেন, শেষ বাক্যটায় যেন একটা ত্রাসের স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে গেল গায়ে। আর কিছু উচ্চবাচ্য করলেন না তাঁরা।

নমো নমো করে খাওয়া সারলেন দেবতোষ-নির্মলা। কী একটা অজানা হুতাশেই যেন কুন্তলাকে দেখার পরে খাওয়ার ইচ্ছেটা চলে গিয়েছিল। তার মধ্যেই এক মগ কফি, প্লেটে করে গার্লিক ব্রেড, বিস্কুট আর কিছু শুকনো ফল নির্মলা দিয়ে এলেন পুত্রবধূকে। খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল। বাড়ির বউ-কে যেন বাইরের অতিথির মতো আপ্যায়ন করছেন। কিন্তু উপায় কী! বউ-ই যে পারিবারিকভাবে সম্পৃক্ত হল না।

দেবতোষ শুধু চাপা গলায় একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন স্ত্রীকে, উলটোপালটা কিছু বললেও, শুধু শুনে যেয়ো। ওর অ্যাটিটিউড দেখে মনে হচ্ছে, ভেতরে ভেতরে ক্ষেপে রয়েছে।

নির্মলা বললেন, ওপরে গিয়ে টিপুর সঙ্গে একবার কথা বলে নেবে নাকি?

সামান্য ভেবেই দেবতোষ বললেন, থাক। আগে দেখি ওর কী কথা আছে ...। আমি যাচ্ছি, তুমি এসো।

হাতে কফির মগ নিয়ে বসার ঘরে এলেন দেবতোষ। সামনের নিচু টেবিলে পা তুলে বসে ম্যাগাজিন ওলটাচ্ছিল কুন্তলা। দেবতোষকে দেখে পা নামাল। কফিতে একটা চুমুক দিয়ে বলল, আমাকে দেখে আপনাদের খুশি হওয়ার কথা নয় ... তা সত্ত্বেও আসতে হল। কটা কাজের কথা সেরেই চলে যাব। উনি ... টিপলুর মা গেলেন কোথায়?

আসছেন। দেবতোষ বাঁদিকের সোফায় বসলেন। বললেন, তোমায় দেখে অখুশি হব কেন মা? বাড়ির বউ তুমি ...।

বাড়ির আবার বউ হয় নাকি? ছেলের বউ বলুন। ছেলে আর বাড়ি আপনাদের কাছে এক নাকি?

থতমত খেয়ে গেলেন দেবতোষ। সামলে নিয়ে বললেন, না-না, বাড়ি বলতে ... এই ফ্যামিলি আর কি ...।

নির্মলা ঢুকলেন। উলটোদিকের সোফায় বসতে বসতে বললেন, এ বেলাটা থেকে যাও মামণি, টিপুকে টেলিফোন করে দাও, অফিস থেকে এখানে চলে আসবে—

অফিস থেকে ওর আজকাল ফিরতে দেরি হয়। কুন্তলা বলল। জানেন না? তৃষার সঙ্গে প্রেম করছে, আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেলে বোধহয় ওকে বিয়ে করার প্ল্যান করছে।

এসব তুমি কী আজগুবি কথা বলছ মামণি? দেবতোষ বললেন। তুমি ওর স্ত্রী হয়ে কেন অমন উলটোপালটা ভাবছ? আর কেনই বা ওসব ... আলাদা-টালাদা হওয়ার ...।

আপনারা ন্যাকা নাকি? ঠকাস করে কফির মগ টেবিলে রেখে সোজা হয়ে বসল কুন্তলা। ওর চোখেমুখে ক্রোধের আগুন জ্বলছে এই দুটো তিনটে কথার পরেই। বলল, দুয়ে-দুয়ে চার, এ তো সবাই বোঝে। আমাদের বনিবনা হচ্ছে না, আমার পাগলের চিকিৎসা হচ্ছে। ওদিকে সেক্সি একটা মেয়েও ফিট হয়ে রয়েছে, আমিও ব্যাপকভাবে ফেড আপ। ব্যবস্থা তো সব হয়েই রয়েছে।

দেবতোষ-নির্মলা দুজনেই এমনভাবে তাকিয়েছিলেন, মনে হচ্ছিল কুন্তলার কথাবার্তার প্রায় কিছুই তাঁদের বোধগম্য হচ্ছে না। দেবতোষের

কথাতেও তাব প্রতিফলন টের পাওয়া গেল। বললেন, মামণি, তুমি যেসব কথা বলছ ... আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। হঠাৎ তুমি আমাদের এসব কথা বলছই বা কেন? আমরা তো কখনও তোমায় ...।

আপনারা হয় আনস্মার্ট, নয়তো শয়তান।

প্রায় কান্নাচাপা গলায় নির্মলা বললেন, আমাদের তুমি যা ইচ্ছে বলো মামণি, কিন্তু নিজেদের জীবন সম্বন্ধে অমন উলটোপালটা ডিসিশন নিয়ো না। একটু ঠান্ডা মাথায় ভাব, বাবা-মার সঙ্গে কথা বলো।

হাত তুলে নির্মলাকে থামাল কুন্তলা। বলল, আমাদের জীবন সম্বন্ধে ডিসিশন আমরাই নেব। আপনাব ছেলে বেশ করিৎকর্মা, আর আমিও জলে পড়ে নেই। দু-চারটে ছেলে আমার পিছনেও বরাবর ঘোরে ... আর এখন তো জানেন, বিবাহিত মেয়েদেরও যে দু-চারটে এক্সট্রা অ্যাফেয়ার থাকবে না, সেটা রেয়ার ঘটনা। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে আমবা আনসাকসেসফুল ... সময় নষ্ট করে লাভ কী?

কুন্তলা চুপ করল। ঝুম হয়ে কয়েক মুহূর্ত বসে দেবমাল্য বললেন, তুমি আর কী বলবে মামণি?

অ্যায়, কাজের কথায় আসতে চান তো? বলতে বলতেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কুন্তলার মুখটা যেন উদাস হয়ে গেল। একটা ঘোরের মধ্যেই যেন বলল, ম্যারেড লাইফ-টাইফ আমার পোষাবে না, ওসব হিপোক্রিটদের জন্য। সবাই চায় আর একজনকে এক্সপ্লয়েট করতে। এসব আমি ছোট থাকতেই বুঝে গেছি, আর একটু বড় হয়েই বুঝেছি, মেয়ে দেখলেই সব ছেলেরা তাকে চিত করতে চায়...। অবশ্য মেয়েরাও যে রংঢং করে ছেলেদের উশকায় না তা নয়—

দেবতোষ গম্ভীর গলায় না বলে পারলেন না, তুমি আমাদের সামনে এসব কথা বোলো না, আমি সহ্য করতে পারছি না।

কুন্তলা যেন শুনতেই পায়নি, এভাবে বলল, সাইকিয়াট্রিস্ট আমার কাঁচকলা করবে। তবে, টিপলুর বন্ধু ওই ডাক্তারটা, মানস, খুব ইন্টেলিজেন্ট ছেলে। একদম রাগে না। তুখোড় কথা বলতে পারে, আবার আমার ওই ইংলিশ সলিসিটারটারও খুব ঠান্ডা মাথা, ভাল

অ্যাডভাইস দেয়। কিন্তু ... তার মানে এরা কেউ যে আমার বুক-পাছার দিকে নজর বোলায় না, তা নয়। কী করবে, প্রকৃতি তো! আর আমিও যে ওদের বেড-এ ইমাজিন করি না ... তা তো নয়!

প্লিজ, তুমি থামবে! প্রায় ধমক দিলেন দেবতোষ।

একটা হালকা হাসি খেলে গেল কুন্তলার মুখে। কিন্তু থেমেও গেল। ঠান্ডা হয়ে আসা কফির মগ তুলে একসঙ্গে অনেকটা খেয়ে নিল। একটু পরে বলল, অবশ্য সেক্স ছাড়াও যে কথা নেই, তা নয়। আমাকে এখন সেগুলোই সর্ট আউট করতে হবে।

দেবতোষ ঠান্ডা গলায় বললেন, তোমার কি সত্যিই আমাদের সঙ্গে কোনও কাজের কথা আছে?

অফকোর্স। চাঙ্গা হয়ে বসল কুন্তলা। বলল, দেখুন, আমার থেকে আপনাদেরই তাড়া বেশি ... কেননা, আমি বুঝে গেছি, যত তাড়াতাড়ি আমাদের ডিভোর্স হয়, হয়ে যাক, সেটাই দেবমাল্য চাইছে। আমিও অবশ্য চাই। কিন্তু আমি জানি, টিপলু এখন আর মেয়েমানুষ ছাড়া ঘুমোতে পারবে না, ওর অভ্যাস হয়ে গেছে ...তা ছাড়া আপনাদেরও নাতিপুতি চাই ... তাই তো?

নির্মলা একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে চলে গেলেন।

দেবতোষ বললেন, আমাদের কথা ছাড়ো। তুমি কী বলতে চাও সেটার জন্যই ...।

কুন্তলা উঠে দাঁড়াল। দেবতোষের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাকে এ বাড়ির দামের ফিফটি পারসেন্ট টাকা দিয়ে দিন। আমি ডিভোর্স দিয়ে দেব। আইনকানুন, সলিসিটর ... এ সবের খরচাগুলোও বেঁচে যাবে। ভাবনাচিন্তা করে বলবেন।

অনেক কথাই বলতে পারতেন দেবতোষ, প্রশ্ন তুলতে পারতেন। কিন্তু নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করলেন। তাঁর মাথা ঝিমঝিম করছিল। কুন্তলা বাইরে বেরিয়ে এসে জুতো পরল। গলায় স্কার্ফ জড়াল। দেবতোষ দেখলেন চুপচাপ। কোথাও একটা ভাঙাভাঙি হয়ে যাচ্ছে নিজের মধ্যে। বললেন, তুমি কোথায় যাবে এখন?

যেন নিশ্চিত কিছুই না ভেবে কুন্তলা বলল, দেখি। যাওয়ার জায়গার আমার অভাব নেই।

দেবতোষ বললেন, দাঁড়াও মামণি, তুমি যেখানেই যাও, আমি তোমায় নামিয়ে দিয়ে আসব।

কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে হাসল কুন্তলা। তারপর বলল, থ্যাংক ইউ। আই ক্যান টেক কেয়ার অব মাইসেলফ। বাই।

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল কুন্তলা। দেবতোষ দাঁড়িয়ে রইলেন।

৭

ব্যাসিলডন জেনারেল হাসপাতালের ভিজিটরস রুমটা মিনিট পাঁচেক হল ফাঁকা হয়ে গেছে। রাত বাড়ার সঙ্গে এমনিতেই পেশেন্ট পার্টিদের সংখ্যা কমে যায়। নেহাত যে দু-একজনকে বিশেষ কোনও খবর জানাবার জন্য ডাক্তার কিংবা নার্সরা অপেক্ষা করতে বলে, তারা ছাড়া আর কেউই লোক-দেখানো কর্তব্যের খাতিরে হাসপাতালে বসে থাকে না। সাহেবরা ও সব ভাবাবেগের গুরুত্বও দেয় না। চিকিৎসা করবে ডাক্তার। পরিস্থিতি জানিয়ে দেওয়ার পর কোনও স্টাফ অনুরোধ করে না থাকার জন্য। আত্মীয়স্বজনও ঘুম নষ্ট করতে চায় না।

ঘণ্টা দেড়েক আগে কুন্তলাকে ভর্তি করে, লাউঞ্জ পার হয়ে দেবমাল্য যখন ভিজিটরস রুমে ঢুকেছিল, তখনও চার-পাঁচজন ছিল। আসলে ওদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি ছোটবড় সকলেই ছিল এক পরিবারের। সম্ভবত ওরা অন্য কোনও ই-সি কান্ট্রি থেকে সদ্য ইংল্যান্ডে আসা পরিবার। ইংরিজি উচ্চারণে পূর্ব-ইউরোপীয় দেশের টান ছিল। নার্স এসে কিছু খবরাখবর জানানোর পরে একটি বাচ্চাসহ পুরো দলটাই বেরিয়ে গেল। আর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের ভুঁড়িওয়ালা, মাথায় গোল কালো উলের টুপি, জিনস আর একটা বস্তার মতো অ্যানোর‍্যাক চাপানো লোকটা তখন থেকেই বসে বসে ক্যান থেকে লাগার খেয়ে যাচ্ছে।

দেবমাল্য ভাবল, কী ভাগ্যিস পুরো হাসপাতালে ধূমপান নিষিদ্ধ, নয়তো ও নিশ্চয়ই এতক্ষণে সিগারেট খেয়ে খেয়ে ঘরটা ধোঁয়ায় ভরিয়ে দিত। ওর মিস্ত্রিদের মতন পুরুষ্টু হাতের আঙুলে দেবমাল্য লালচে নিকোটিনের ছোপ দেখতে পেয়েছিল।

চারতলার ভিজিটরস রুমের জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিল দেবমাল্য। আরামদায়ক উষ্ণতা রয়েছে ঘরের মধ্যে। বাইরে নিঝুম শীতের শহর, হিম-কুয়াশায় আবছা। সামনের দীর্ঘ কার পার্ক অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। হ্যালোজেন আলোর স্তম্ভগুলো ঘিরে হালকা ধোঁয়ার বৃত্ত। তাপমাত্রা নিশ্চয়ই শূন্যের কাছাকাছি। ডিসেম্বর মাস এসে গেল, এখন থেকে দূরে দূরে ক্রিসমাস-এর আলোকসজ্জাও চোখে পড়ে।

ক্লান্তি আর অবসাদে দেবমাল্যর শরীরটা এখন ভেঙে পড়তে চাইছে। তা হলেও সতর্ক থাকতে হচ্ছে। ভিজিটরস রুমের মাইক্রোফোন যে কোনও সময়ে ওর নাম ধরে ডাকবে এবং হয়তো কিছু খবর বা নির্দেশ দেওয়ার জন্য ওয়ার্ডে আসতে বলবে, যে ওয়ার্ডে কুন্তলা ভর্তি রয়েছে। এখন কেমন আছে তাই বা কে জানে! একমাত্র দেবতোষ আর নির্মলাকে ছাড়া ঘটনার খবরও কাউকে জানানো হয়নি। যদিও ফ্ল্যাটের সিকিওরিটি ...।

ভাবনায় ছেদ পড়ল দেবমাল্যর। লম্বা-চওড়া, ভুঁড়িওয়ালা লোকটা উঠে এসেছে। মুখে বেশ একটা সরল ভাব।

হাই মেট, ইউ লুক ভেরি টেন্সড! আর ইউ অলরাইট?

হালকা হাসল দেবমাল্য। ইয়েস, আয়াম অলরাইট। থ্যাঙ্ক ইউ।

ইজ এনিবডি সিরায়াসলি ইল?

সাধারণত সাহেবরা সৌজন্যের খাতিরেও এমন কৌতূহল দেখায় না। লোকটার নিশ্চয়ই লাগারের প্রভাব কাজ করছে। হয়তো বক বক করতে ইচ্ছে করছে। উত্তরটা একটু ঘুরিয়ে দিল দেবমাল্য।

আই ডোন্ট নো হাউ সিরিয়াস ... বাট ডেফিনিটলি ইল।

মাথা নাড়ল সাহেব। যেন সমব্যথী। বলল, হু ইজ ইট?

মাই ওয়াইফ।

আবার চিন্তাচ্ছন্ন মাথা নাড়ল লোকটা। কিন্তু আর বিশদ জানার কৌতূহল প্রকাশ করল না। অন্য কথা বলল।

তুমি একটা লাগার খাবে? ইউ উইল ফিল বেটার।

হেসে মাথা নাড়ল দেবমাল্য। নো, থ্যাঙ্কস। আয়াম ড্রাইভিং। তা ছাড়া আমি ঠিকই আছি।

ওহ্ খামন ... লোকটা ওর ঝোলা হাতে তুলে নিয়ে বলল, হ্যাভ আ সফট ওয়ান ... ইটস আ ফিজি অরেঞ্জ জুস। এর পরে প্রত্যাখ্যান করলে খারাপ দেখায়। থ্যাঙ্ক ইউ, বলে নিল।

ঢাকনা খুলে এক চুমুক দিয়ে অবশ্য ভালই লাগল। ঘণ্টা দুয়েক আগে যে দৌড়ঝাঁপ, উত্তেজনা, হাসপাতালের টানাপোড়েন এবং তারপর এতক্ষণ এই ভিজিটরস রুম-এর হিটিং-এ বসে থাকা—এর মধ্যে একবারও জল পর্যন্ত খায়নি। নিশ্চয়ই চোখমুখ শুকনো লাগছে, সাহেব সেটা খেয়াল করেছিল। বেশ লম্বা চুমুক শেষ করে বলল, ইটস গুড। আই ওয়াজ ডেফিনিটলি থার্স্টি টু-উ, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না। থ্যাঙ্ক ইউ।

নো প্রবলেম। সাহেব আবার সোফায় বসেছে। বলল, এবার বসে তোমার পা দুটোকে রেস্ট দাও।

বসতেই হল দেবমাল্যকে। জিগ্যেসও করতে হল, তোমার কেউ ভর্তি হয়েছে নিশ্চয়ই হাসপাতালে!

ইটস মাই পার্টনার। নিজে থেকে গড়গড় করে বলতে শুরু করল সাহেব, নাথিং সিরিয়াস। শি ইজ প্রেগন্যান্ট, অ্যান্ড অলওয়েজ আ বিট ওয়ারিড। আমি ট্রাক ড্রাইভার তো, বাড়িতে বেশি থাকি না ... তাই রাত্তিরেই একটা এমার্জেন্সি চেক আপ ... হেসে বলল, ফর হার পিস অব মাইন্ড, অ্যান্ড আই নিড আ গুড স্লিপ।

মাথা নেড়ে সামান্য হাসল দেবমাল্য। কথা চালানোর ইচ্ছেটা ভেতর থেকে আসছে না।

একটু উশখুশ করে সাহেব নিজেই উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি নীচে থেকে একটা সিগারেট খেয়ে আসছি। তুমি বোসো।

দেবমাল্য মাথা নাড়ল, কিন্তু একটু আতান্তরেও পড়ে গেল, কেননা সাহেব জিনিসপত্র সব ফেলে রেখেই যাচ্ছে যে! দ্রুত বলল, এর মধ্যে আমাকে ... কিংবা তোমাকেও যদি ডাকে?

সাহেব ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ডোন্ট ওয়ারি, তোমায় ডাকলে তুমি চলে যেয়ো। আর তোমাকে-আমাকে দুজনকেই ডাকলে ... একটু ভেবে নিয়ে হেসে বলল, ইউ গো, অ্যান্ড লিভ ইয়োর এম্পটি ক্যান ইন দ্য সেন্টার অব দ্য টেবল। অলরাইট? দেন আই নো ...।

হেসে হাত নেড়ে দিল দেবমাল্য। ঘরে একলা হতেই হাসিটা মিলিয়ে গেল। ঘড়ি দেখল। রাত এগারোটা চল্লিশ। ধকল আর টেনশনটা চলছে আড়াই ঘণ্টা হয়ে গেল। ঠিক আছে তো কুন্তলা! বাবা-মা-ই বা কী করছে কে জানে! কিন্তু কিশলয় তো একবার অন্তত ওর মোবাইলে টেলিফোন করে খবর নিল না! বাবা-মা অবশ্যই জানিয়েছে ওকে ঘটনাটা।

ঝলমলে অথচ নিঝুম ভিজিটরস রুমে বসে থাকা ছাড়া কিছু করার নেই দেবমাল্যর। বই-ম্যাগাজিন-খবরের কাগজ ডাঁই করে রাখা এক কোণে, উলটোদিকে টিভি। কিছুই দেখতে ইচ্ছে করছে না। ডাক্তার বলে দিয়েছে, কুন্তলার অবস্থা সম্বন্ধে কিছু না জানানো পর্যন্ত যেন ও অপেক্ষা করে। ওকে ভর্তি করেছে ওয়ার্ড এইট্রিনে, ভিজিটরস রুম থেকে হেঁটে যেতেও বেশ সময় লাগবে।

একটা অনিবার্য হাই তুলতে তুলতে ভাবল, কুন্তলা কি আনকনশাস এখন? ড্রিপ দিচ্ছে কি?

যখন অ্যাক্সিডেন্ট-এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টে আনা হয়েছিল, তখন অবশ্য সজাগই ছিল। যদিও খানিকটা ড্রাউজি। সঙ্গে সঙ্গেই ভর্তি করে নিয়েছিল, ওয়ার্ড এইট্রিনে, কিন্তু বলে দিয়েছিল, শি মে বি ট্রান্সফারড টু দ্য ইনটেনসিভ থেরাপি ইউনিট, অর ইন দ্য অ্যাকিউট মেডিকেল ওয়ার্ড। কে জানে এখন ওকে কোথায় নিয়ে গেছে!

একটা শ্বাস ফেলে সোফার পিছনে নিজেকে হেলিয়ে দিতে দিতে দেবমাল্য ভাবল, জীবন ওকেই বা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে!

প্রোমোশনের পরে অফিসে কিছু কাজ বেড়েছে। ঠিক পাঁচটার মধ্যে রোজ কাজ শেষ হয় না। তা হলেও কোনও কারণে ওর ফিরতে দেরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, টেলিফোন করে কুন্তলাকে জানিয়ে দেয়। এদেশে কলকাতার মতন উইক-ডে-তে আড্ডা দেওয়ার কোনও সুযোগ নেই। তা হলেও প্রতিদিন অফিস থেকে সোজা বিলারিকে ফিরে যাওয়া যায় না। কিছু কেনাকাটা বাজার দোকান থাকে, বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া, কিছু কিছু ডাকে আসা কাগজপত্র ও বাড়ি থেকে আনতে হয়। শক্তি জেঠু-জেঠিমা দুজনেরই শরীর ভাল না, মাঝেমধ্যে না গেলে নিজেরই খারাপ লাগে। যদিও এখন তৃষা ওঁদের বাড়িতে থেকেই ইউ সি এল-এ যাতায়াত করছে বলে, ওঁদের বিশেষ সুবিধে হয়েছে। ছেলে থাকে কেন্ট-এ, মাঝেমাঝে আসে। অত দূর থেকে নিয়মিত আসতে পারে না। ওদিকে কুন্তলার চিকিৎসা শুরু হয়েছে বলে, অফিস ফেরত এক আধদিন মানসের সঙ্গেও দেখা করতে হয়। সব কথা টেলিফোনে হয় না।

কুন্তলা এই সবের অনেক কিছুকে যে নিজের মতন ভাবনা আর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ব্যাখ্যা ও বিচার করে, দেবমাল্য জানে। ইদানীং ওর যে কোনও দিন ফিরতে দেরি হওয়ার কারণকে, কুন্তলা 'তৃষার জন্য' বলে ভাবে। খুব সহজ ভাবেই দেবমাল্য ওর এই মনগড়া সন্দেহকে কাটিয়ে দিতে চায়। কিন্তু এখন বুঝতে পারে, কুন্তলার আসলে বিশ্বাস বলে কিছু নেই। ও অন্য কাউকেই বিশ্বাস করে না, আবার নিজে যেটাকে বিশ্বাস করে বলে ভাবে, সেটাও খুব সাময়িক, কিছুদিন পরেই সেটার ওপর আর আস্থা রাখতে পারে না। আর এই সামগ্রিক বিশ্বাসহীনতার ফলাফল এবং প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, ওর প্রচণ্ড ক্রোধ। কখনও তার প্রকাশ হচ্ছে খুব স্থূলভাবে অন্যকে অপমান বা কথায় আক্রমণ করে, আর কখনও নেহাত ভাঙচুর, ছোড়াছুড়ি করে।

দেবমাল্য যথাসম্ভব সংঘাত এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। মাঝেমাঝে হতাশ কিংবা অস্থির কিংবা অসহায় লাগলেও চেষ্টা করা ছাড়া উপায় কী! প্রায় দু বছরে শরীর-মন সব মিলিয়ে সম্পর্ক তো একটা হয়েছেই। কিছু

সহানুভূতি, কিছুটা দুর্বলতা, খানিকটা আকর্ষণও। দেখতে শুনতে কুন্তলা নেহাত খারাপ না। ফিগার, গায়ের রং, সাড়ে পাঁচ ফুট উচ্চতা সব মিলিয়ে ওর সাতাশ-আঠাশ বছর বয়সের একটা চটক তো আছেই। এদেশের পরিচ্ছন্নতা, আবহাওয়ায় তার ওপর একটা পালিশও পড়েছে।

কখনও সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেলেও, দেবমাল্য সত্যি কি ওকে ছেড়ে দিতে পারে পুরোপুরি! পারবে?

সেই যে বিয়ের মন্ত্র পড়া, অগ্নিসাক্ষী, মালাবদল, গাঁটছড়া বাঁধা, সাত পাক ... এ সবের কি একটা বাঁধন নেই? শুধুই সংস্কার-আবেগ-আচার বলে কি উড়িয়ে দেওয়া যায়? তার পরেও, নিজের কাছে সত্যি কথাটা বলতেই বা আপত্তি কী? এখনও পর্যন্ত শারীরিকভাবে কুন্তলাকে কামনা করার তীব্রতাই কি কম কিছু! হঠাৎ-হঠাৎ কখনও ওর আচরণে চূড়ান্ত বিভ্রান্ত বোধ করতে হয় ঠিকই। জলজ্যান্ত-ভরাট-পূর্ণ একটা মেয়ে যেন হঠাৎ কখনও দপ করে জ্বলে ওঠে, কখনও নিবে যায় একটু একটু করে। কখনও ও দেবমাল্যকে টগবগে ঘোড়ায় চাপা সওয়ার করে তুলতে চায়। কখনও নির্যাতনে অমানুষিক হয়ে ওঠে। কিংবা অবহেলায় নির্মম। জোর করার ধাত নয় দেবমাল্যর। কিন্তু করলেও কুন্তলা যে কতখানি দুর্বিনীত হয়ে উঠতে পারে, সে অভিজ্ঞতা ওর হয়েছে।

সব কথা বাবা-মাকে বলা যায় না। মানসকে আন্দাজ দিয়েছে অনেকটা।

কে জানে এখন বাবা-মা কী ভাবছে! কিন্তু এতদিন পর্যন্ত দেবতোষ-নির্মলা বলে এসেছেন, হয়তো ওর ভাবনাচিন্তায় কিছুটা গন্ডগোল আর অসামঞ্জস্য আছে। আস্তে আস্তে শুধরেও যাবে। নিজেদের মেয়ে থাকলে কি ছেড়ে দিতে পারতাম!

কিন্তু কুন্তলাদের বাড়ি থেকে এমনভাবে কেউ ভাবছেন কি?

ওঁরা তো যেন নিশ্চিন্ত মনেই সব দায়দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি দেবতোষ এবং হয়তো কিশলয়ের কাছ থেকেও কিছু খবর পাওয়ার পরে, দিবাকর চক্রবর্তী যে চিঠি লিখেছেন, তার মধ্যেও যেন তেমন উৎকণ্ঠা কিংবা ভাবনার সুর নেই। ভাবখানা যেন,

'দেখা যাক কী হয়' গোছের। সঙ্গে আবার প্রচ্ছন্নভাবে একটু যেন মনে করিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা, চরম কিছু ঘটনার ধকল কি দেবতোষরা নিতে পারবেন? কলকাতায় দেখা হওয়ার পরে অবশ্য এসব নিয়ে আলোচনারও উৎসাহ দেখিয়েছেন কুন্তলার বাবা।

কিন্তু তত দিনে অবস্থাটা কোথায় দাঁড়াতে চলেছে!

গত সোমবার এমন কিছু দেরি হয়নি দেবমাল্যর বাড়ি ফিরতে। অফিস ফেরত অল্প কিছুক্ষণের জন্য উইম্বলডন পার্ক-এ গিয়েছিল মানসের সঙ্গে দেখা করতে। কুন্তলাকে দেখা এবং থেরাপি শুরু হওয়ার পরে আর সামনাসামনি কথা হয়নি। প্রথমদিনের পরে ও তার কাছে যায়নিও। কুন্তলার ভাল লেগেছিল মানসের সঙ্গে কথা হওয়ার পরে। মানস বলেছিল ওর মুড ডিসঅর্ডার আছে, এবং ক্রমশ সেই সব নিয়ে আলোচনা এবং মানসের উপদেশ মতো সাইকোথেরাপি ইত্যাদি নিতেও ও রাজি আছে।

মাত্র সপ্তাহ তিনেক হয়েছে কুন্তলা মানসদের স্প্রিংফিল্ড হাসপাতালে যাতায়াত করছে। সেন্ট জর্জেস হাসপাতালের মানসিক বিভাগ ওটা। শুরুর দিকে সপ্তাহে দুবার, পরে যাওয়া আসাটা আরও কমে যাবে কুন্তলার। টেলিফোনে কথা বলে দেবমাল্য প্রায়ই। আসলে মানসের কাছে খোঁজ নেয়, কুন্তলা কীভাবে চিকিৎসার ব্যাপারটা নিয়েছে কিংবা নিচ্ছে, মূলত সেটাই। কথা বলার সময় দুজনেরই কম। তার মধ্যে মানস জানিয়েছিল, সময় লাগবে। পারলে একদিন চলে আয় সন্ধের পরে, কথা বলব তখন।

নিশ্চিন্ত হয়নি দেবমাল্য। তা হলেও একটু তুষ্টির বোধ হচ্ছিল কিছু চেষ্টাচরিত্র হচ্ছে বলে। কুন্তলাও অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখছে, আয়োজনটা বাতিল করে দেয়নি। মানস বলেছিল, তাড়াহুড়ো করিস না, সময়ের দরকার। তিনচার মাস গেলে একটু একটু অ্যাসেস করা যাবে।

পৌনে আটটা নাগাদ বাড়ি ফিরেছিল দেবমাল্য। সাড়ে আটটা-নটার মধ্যে ওদের রাতের খাওয়া হয়ে যায়। শুতে যেতে সাড়ে দশটা-এগারোটা। এমনিতেও ওর ফিরতে সাড়ে ছটা-পৌনে সাতটা হয়।

কুন্তলা টিভি দেখে, কখনও ছোটখাটো কাজ করে, টেলিফোনে কথা বলে বা ম্যাগাজিন ওলটায়। সেদিন ফিরে দেখল, কুন্তলা চুপচাপ একটা রেড ওয়াইনের বোতল খুলে নিয়ে বসেছে, সামনে আধফাঁকা গ্লাস। চোখমুখ দেখে বুঝল ইতিমধ্যে আরও কিছুটা ও পান করেছে। লালচে ছোপ লেগেছে গালে। প্রথমেই কিছু বলল না দেবমাল্য।

জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে ধীরেসুস্থে ঠান্ডা গলায় বলল, তুমি তো রেড ওয়াইন পছন্দ করো না, খাচ্ছ যে!

উত্তর দিল না কুন্তলা, যেন দেবমাল্যর অস্তিত্বটাই স্বীকার করল না। কিন্তু গ্লাসে চুমুক দিল।

ঘরে পরার মোটা পাতলুন, ওপবে একটা হালকা পুলওভার চাপিয়ে দেবমাল্য বসল ওর পাশে। বোতলটা হাতে তুলে নিয়ে দেখল। টেবিলে রাখতে রাখতে বলল, অনেকটাই তো খেয়েছ, ভাল লাগছে? বলতে বলতেই কুন্তলার গ্লাসটা তুলে ও একটা লম্বা চুমুক দিল। মুখটা সামান্য বিকৃত করেই বলল, বাব্বা, বেশ স্ট্রং তো! আর খেয়ো না।

দেবমাল্য গ্লাসটা টেবিলে রাখতেই, কুন্তলা তুলে নিয়ে উপুড় করে দিল নিজের মুখে। পুরো তলানিটা গিলে ফেলল এক চুমুকে। গ্লাসটা হাতে রেখেই বলল, কোথায় গিয়েছিলে?

দেবমাল্য তাকাল ওর দিকে। —কেন? অফিসে।

আসছ কোত্থেকে?

ভুরু কুঁচকে গেল দেবমাল্যর। —যেখান থেকে রোজ আসি।

তাই নাকি? দেরি হল যে! টেলিফোন করোনি তো?

এমন কিছু তো দেরি হয়নি। সোফায় হেলান দিয়ে দেবমাল্য বলল, অফিসের কাছেই একটা কফিশপে বসেছিলাম ... এক কলিগ-এর সঙ্গে কথা বলছিলাম ... এই অফিসের ব্যাপারেই ...। ইচ্ছে করে মানসের সঙ্গে দেখা করার কথাটা বলল না।

তোমার জেঠু-জেঠিমাকে দেখতে যাওনি?

চোখের কোণ দিয়ে কুন্তলাকে একবার দেখল দেবমাল্য। বলল, সেরকম তো কথা ছিল না। কেউ টেলিফোন করেছিল?

তোমার মোবাইলে কেউ ফোন করলে আমি জানব কী করে?

মোবাইলে কেউ ফোন করেনি তো! তা ছাড়া ওঁরা আমার মোবাইল নম্বরই জানেন না।

বুড়োবুড়ি ছাড়াও তো একজন আছে। সে জানে না?

কে? তৃষা? ও আমার মোবাইল নম্বর পাবে কোত্থেকে?

ন্যাকামি করছ কেন? কোত্থেকে আবার পাবে ... তুমিই ...।

অসহায় ক্ষোভ মাথার মধ্যে টিপটিপ করে উঠলেও প্রকাশ করল না দেবমাল্য। শান্ত উত্তর দিল, দরকার হলে ওরা তো বাড়িতেই ফোন করে, মোবাইল নম্বর দেব কেন? তুমি জানো না, আমি মোবাইল ব্যবহার পছন্দ করি না?

না, আমি জানি না।

তা হলে একটু জানার চেষ্টা করো কুন্তলা, তোমার হাজব্যান্ড কী পছন্দ করে, না-করে।

সামান্য একটু দমে যেতে গিয়েও কুন্তলা বলে, কেন করব? হাজব্যান্ড তো ওই মেয়েটার কথাই ভাবছে সারাক্ষণ।

একটা শ্বাস পড়ে গেল দেবমাল্যর। তা সত্ত্বেও ঘন হল কুন্তলার গায়ের কাছে। বলল, মোটেই না। আমার এমন বউ থাকতে, আমি অন্য মেয়ের কথা ভাবতে যাব কেন? একটা হাত তুলে দিল দেবমাল্য, কুন্তলার গলার কাছে।

ধীরেসুস্থে কুন্তলা বলল, আমায় করার সময় তুমি তৃষার কথা চিন্তা করো না?

প্রায় ছিটকে সরে গেল দেবমাল্য। —এ কী বলছ তুমি! ছি-ছি-ছি। এত নোংরা তোমার ভাবনা কুন্তলা?

কেন আমি ও রকম ভাবব?

বিকজ ইউ আর সিক, ইউ আর প্যারানয়েড, ইউ আর ...।

মুখে আর কথা এল না দেবমাল্যর। ও উঠে পড়ল কুন্তলার পাশ থেকে।

কুন্তলার শ্বাস পড়ছে দ্রুত। আস্তে আস্তে কেটে কেটে বলল, আমি

সিক? আমি প্যারানয়েড? তা হলে তুমি কী?

আয়াম এ নরম্যাল, হেলদি, ইয়াং ম্যান।

সেইজন্যেই বুঝি ছিপ্‌লি গোছের সেক্সি মাগিটাকে মনে ধরেছে? সুযোগ পেলেই শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছ?

চাপা গর্জনের মতন দেবমাল্য বলল, কুন্তলা, স্টপ দ্যাট!

আমাকে শাসাচ্ছ তুমি? বুড়োবুড়িকে দেখতে যাওয়ার নাম করে, তুমি লাইন মারছ না তৃষার পিছনে? যাওনি আজকে? কফি খেতে খেতে ওদের কিচেনে গিয়ে জাপটে ধরোনি? সামনে পিছনে ঘষতে ঘষতে হাবড়ে চুমু খাওনি ছুঁড়িকে?

ওহ গড, বলতে বলতে দু হাতে নিজের মাথার চুল খামচে ধরল দেবমাল্য।

চোখমুখ লাল করে, রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে কুন্তলা বলে যাচ্ছে, ও কেন পড়ে আছে এখানে? তোমাকে দিয়ে মারাবে বলেই তো... তারপর ওর পেট হবে, তুমি ওকে বিয়ে করবে... আমি বুঝি না!

দু হাতে কান চেপে ধরল দেবমাল্য। মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে পাশের ঘরে গিয়ে বালিশ-কম্বলের মধ্যে মুখ গুঁজে দিল।

উঠে এগিয়ে গেল কুন্তলাও। বলল, আমি বুঝি ঝি-এর মতো থাকব? চতুর্দিকে আমার বদনাম ছড়াচ্ছ। পাগলের চিকিৎসা করাচ্ছ, এর পরে অ্যাসাইলামে ভর্তি করবে... বলবে আমি বাঁজা, আমি গরম হই না... আর ও মাগি ঢেলে দিচ্ছে!

দেবমাল্য উঠে দাঁড়াল আবার। ঘরের হিটিং, গায়ের পুলওভার মিলিয়ে উত্তেজনায় ঘামছে। একটানে খুলে ফেলল সোয়েটার। বলল, তোমার যা ইচ্ছে করে করো, বলো... কিন্তু প্লিজ... ওই ভাষায় অন্য কাউকে অ্যাকিউজ কোরো না... ওগুলো আমাদের কালচারে নেই কুন্তলা। ও ভাবে আমরা ভাবতে পারি না, শিখিনি...।

তুমি কালচার দেখাচ্ছ আমাকে? বউ ছেড়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে র‍্যালা করছ কোন কালচারে?

ছোট ফ্ল্যাটের মধ্যেই হাঁপাতে হাঁপাতে এপাশ ওপাশ করছে

দেবমাল্য। বলল, তোমার মাথার ঠিক নেই, য়্যু আর রিয়্যালি মাড, তোমার সাস্‌পিসাস মাইন্ড, য়্যু আর নট নরম্যাল...!

এতক্ষণ ওয়াইনের গ্লাসটা ধরা ছিল কুন্তলার হাতে। হঠাৎ 'কী, আমি ম্যাড? অ্যাবনরম্যাল?' বলতে বলতে টিভির ওপর দিকে দেয়ালে ছুড়ে মারল গ্লাসটা। ঝনঝন করে সেটা ভেঙে পড়তেই ছুটে গেল ওয়াইনের বোতলটা তুলতে। মুহূর্তে ছুটে গিয়ে ওর হাত চেপে ধরল দেবমাল্য। রেড ওয়াইনের বোতল ঘরে ছুড়ে ভাঙলে... বলা যায় না, শব্দে সিকিউরিটির লোকও ছুটে আসতে পারে। হাতের সঙ্গেই বলিষ্ঠ ভাবে ওকে পুরো বেড় দিয়ে জাপটে ধরল দেবমাল্য। টানতে টানতে ওকে নিয়ে যেতে চাইল পাশের ঘরে, বিছানার ওপর। মুখে বলল, প্লিজ, কুন্তলা প্লিজ... এরকম কোরো না... এরপর সিকিউরিটির লোক আসবে, পুলিশ আসবে বাড়িতে... একটু বোঝো... মাথা ঠান্ডা করো... আমি জেঠিমাদের বাড়িতে যাইনি কুন্তলা... তুমি মিছিমিছি... বিছানার ওপর ওকে ফেলে জড়িয়ে ধরে রইল দেবমাল্য। রাগে অন্ধ হয়ে ছটফট করল কুন্তলা, আঁচড়ে কামড়ে দিতে চাইল দেবমাল্যকে। কিন্তু ওর শক্তির সঙ্গে পেরে উঠল না, একটু একটু করে থিতিয়ে গেল।

দেবমাল্য তারপরেও বলে গেল, শান্ত হয়ে একটু বোঝবার চেষ্টা করো কুন্তলা... আমার কাজের অনেক দায়িত্ব, জেঠিমার বাড়িতে আমি যাইনি, কেন তুমি অমন সন্দেহ করো? তুমি বিশ্বাস করো আমি তোমায় রাগ করে কিছু বলে ফেলেছি... আমি তোমাকেই ভালবাসি কুন্তলা...।

আস্তে আস্তে ওকে ছেড়ে দিল দেবমাল্য, বলল, ওঠো। নিশ্চয়ই খালি পেটে ওয়াইন খেয়েছ...য়্যু মাস্ট বি হাংরি।

না, আমি হাংরি ফর ফুড না, হাংরি ফর সামথিং এলস।

বলতে বলতেই কুন্তলার আচরণ সম্পূর্ণ পালটে গেল। দেবমাল্যকে ঠেলে ফেলে দিয়ে, নিজেই ওর গায়ের ওপর উঠে বসল। দ্রুত হাতে একে একে খুলে ফেলতে লাগল জামা কাপড়, এমনকী অন্তর্বাসও। হতচকিত দেবমাল্য সম্পূর্ণ পরাস্ত এবার। কুন্তলা টানাটানি করে খুলে ফেলে দিল ওরও পাতলুন, গেঞ্জি। নিজের পূর্ণ নগ্ন শরীর দিয়ে কুন্তলা

অধিকার করে নিল দেবমাল্যকে। ওর হাত আর মুখের যথেচ্ছ নিষ্পেষণে, লেহনে জেগে উঠল অনিবার্য পৌরুষ। দুরন্ত আদিম লীলায় মেতে উঠল পুরুষ-নারী।

কেন যেন মনে হয়েছিল দেবমাল্যর, সতি সত্যি এবার একটু করে শুধরে উঠছে কুন্তলা। ভাবনাচিন্তা, আচরণকে ও বোধহয় একটু একটু করে বাস্তব জীবনযাপনের প্রেক্ষাপটে সাজিয়ে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। নয়তো ও যেন এবার বুঝতে পারছে ভবিষ্যৎ কোন দিকে যেতে পারে...।

নাহ, সমস্ত ভাবনাটাই ভুল হয়েছিল দেবমাল্যর।

তা নয়তো এই নির্জন শীতল মধ্যরাতে ওর কি হাসপাতালের প্রতীক্ষাকক্ষে বসে থাকার কথা!

অফিস ফেরত আজ শক্তিজেঠুর বাড়িতে না গেলে কি দুর্ঘটনাটা এড়ানো যেত? ব্যাপারটা দুর্ঘটনাই কি?

ঘড়ি দেখল দেবমাল্য। আর তখনই মনে হল, ঠিক, আজ তো নয়, হিসেব অনুযায়ী সব ব্যাপারটাই গতকালের। সেই মুহূর্তেই আরও মনে হল, সাহেবটাই বা আসছে না কেন! একটা সিগ্রেট খেতে কতক্ষণ লাগে!

প্রায় ম্যাজিকের মতো, লম্বা চওড়া লোকটা ঘরে এল তখন। হাতে আরও একটা অতিরিক্ত পলিথিন ব্যাগ। বাজার করে ফিরল নাকি? হতেই পারে। আসার সময়ে দেখেছিল হাসপাতাল থেকে দু-তিন মিনিট হাঁটাপথের দূরত্বে টেস্‌কো ডিপার্টমেন্টাল স্টোর-কাম- সুপারমার্কেট। ইদানীং ওরা রবিবার ছাড়া চব্বিশ ঘন্টাই খোলা থাকে।

ঘরে ঢুকেই সাহেব বলল, কাউকেই ডাকেনি তো এখনও? আই নিউ দ্যাট।

কী করে জানলে? দেবমাল্য জিগ্যেস করল।

মেটার্নিটি ওয়ার্ডে ডাইরেক্ট কল করলাম। মিডওয়াইফ বলল, একটা স্ক্যান করে দেখে তারপর জানাবে। আধঘন্টা তো লাগবেই, সো আই ওয়েন্ট ফর সাম শপিং।

ভালই করেছ। দেবমাল্য বলল, আমাকে কতক্ষণে ডাকে দেখি!

সাহেব আর থাকতে না পেরে জিগ্যেসই করে ফেলল, কোন ওয়ার্ডে আছে তোমার ওয়াইফ?

শি ওয়াজ অ্যাডমিটেড ইন ওয়ার্ড এইট্টিন... তারপর কোথাও ট্রান্সফার করেছে কিংবা করবে কি না জানি না।

সাহেব একটু তাকিয়ে থেকে, মাথা নেড়ে বলল, ওহ তার মানে সাইকিয়াট্রিক ওয়ার্ডে?

দেবমাল্য বলল. হ্যাঁ। অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড এমার্জেন্সি-তে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখে ভর্তি করে নিয়েছে... বলেছে শি মে বি ট্রান্সফারড টু...।

বুঝেছি। বেশ বিজ্ঞর মতো মাথা নাড়ল সাহেব। তারপর ঝোলা থেকে একটা স্যান্ডউইচের প্যাকেট বার করে ওর হাতে দিয়ে বলল, খাও। লাস্ট নাইটে ডিনার খাওনি নিশ্চয়ই? তোমার কথা ভেবেই এনেছি, খাও, খাও।

মাঝেমধ্যেই সাহেবদের এই অযাচিত বদান্যতায় সংকোচ বোধ না করে পারেনি দেবমাল্য। কিন্তু ক্রমশই দেখেছে, এখনও এদেশের অনেক মানুষের এ জাতীয় একটা দিলদরিয়া, স্বতঃস্ফূর্ত মানসিকতা আছে। কারও ভারী জিনিস টেনে তুলে দেওয়া, কিংবা গাড়িতে উঠতে সাহায্য করা, বা ক্লান্ত কাউকে জল এনে দেওয়া, গাড়ির কাচে বরফ জমে গেলে ঘষে তুলে দেওয়া... নিজে থেকে এসেই এরা করে দেয়।

সংকোচটা তা সত্ত্বেও পুরো কাটে না। বলল, থ্যাঙ্ক য়্যু, বাট আই ডোন্ট ফিল লাইক ইটিং।

সহেব পাত্তা দিল না। বলল, আই নো। তা হলেও খাও, সাইকিয়াট্রিক অ্যাসেসমেন্ট শেষ করে তোমায় জানাতে অনেকক্ষণ সময় লাগবে। তারপর যদি অন্য ওয়ার্ডে ট্রান্সফার করে... ওভারডোজ নিয়েছে বুঝি? নিউলি ম্যারেড?

দেবমাল্য বুঝে গেল, এ সাহেবটা একেবারে পাতি গ্রাম্য বঙ্গসন্তানের মতোই সরল। আর বেশি কথায় না গিয়ে ও বলল, ওই রকমই।

বলতে বলতে প্যাকেট ছিঁড়ে স্যান্ডউইচ খেতে শুরু করল।

সাহেব কোক নিয়ে এসেছে ওর জন্য। বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ডোন্ট ওয়ারি, শি উইল বি ফাইন।

মাথা নেড়ে চুপ করে খেয়ে যেতে লাগল ও। সাহেব তার পরেও বলল, সব ইয়াং বউ-মেয়েদের এই এক সমস্যা, বড্ড ইমপালসিভ। একটু হেসে যোগ করল, হরমোনের সঙ্গে সঙ্গে ওদের মুড ওঠানামা করে তো... বাট ডোন্ট ওয়ারি...।

মাইক্রোফোনটা কথা বলে উঠতেই সাহেব চুপ করে গেল।

...প্লিজ লিসন, মিস্টার ব্যাগসি ফ্রম বিলারিকে... য়্যু আর রিকোয়েস্টেড টু সি দ্য স্টাফ ইন ওয়ার্ড টুয়েন্টি থ্রি, আই রিপিট...।

দেবমাল্য উঠে দাঁড়াল। সাহেবকে বলল, আমি যাই, থ্যাঙ্কস ফর য়োর কম্পানি... স্যান্ডউইচ অ্যান্ড...।

ওহ্ কামঅন মেট... য়্যু আর ওয়েলকাম। অফ য়্যু গো.. ডোন্ ওয়ারি... বাই...।

ওয়ার্ড টুয়েন্টি থ্রি থেকে বেরুতে আরও আধঘন্টা লেগে গেল দেবমাল্যর। ওটা অ্যাকিউট মেডিকেল ওয়ার্ড, মেয়েদের। যা বুঝল, কুন্তলাকে সাইকিয়াট্রিক ওয়ার্ড থেকে দেরি না করেই মেডিকেল ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিল। কেননা, ও বেশ কতকগুলো প্যারাসিটামল ট্যাবলেটের প্রভাবে তখন কিছুটা ঝিমুনির মধ্যে ছিল; কয়েকটা ডায়াজিপাম ট্যাবলেটও খেয়েছিল। ব্লাডটেস্ট করতে পাঠানোর পরে, মেডিকেল ওয়ার্ডে ইনট্রাভেনাস ড্রিপ দিচ্ছে, অবজারভেশনে রেখেছে। ব্লাড রেজাল্ট আসতে সময় লাগছিল বলেই দেরি। নয়তো ও মোটামুটি স্টেবল কন্ডিশনেই আছে। হাতের কাটাগুলো নেহাতই সুপারফিশিয়াল, ক্যাজুয়ালটি থেকে যে ড্রেসিং করে দিয়েছে, তাইতেই ঠিক আছে। হোপফুলি শি ক্যান গো হোম বাই মিড ডে।

ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে, করিডোর দিয়ে যেতে যেতেই বাড়িতে ফোন করল দেবমাল্য। বাবা-মার মনের অবস্থা ও জানে। দেবতোষই ফোন ধরলেন।

হ্যাঁ বল, মামণি ঠিক আছে? স্টম্যাক পাম্প করেছে? স্যালাইন দিচ্ছে? জ্ঞান আছে তো?

সব ঠিক আছে বাবা। একটু ড্রিপ দিচ্ছে। ও কথাটথা বলেছে, এখন ঘুমোচ্ছে। কাল দুপুরে বাড়ি চলে আসবে। স্টমাক ওয়াশটোয়াশ দিতে হয়নি।

একটা শ্বাসের শব্দ শুনল দেবমাল্য। তার পরেই দেবতোষ বললেন, তুই কোথায় এখন?

আমি হাসপাতাল থেকে বেরুচ্ছি। বাড়িতেই চলে আসছি।

শোন, সাবধানে ড্রাইভ করিস, রাস্তায় ফ্রস্ট জমেছে বলে নুন আর বালি ছড়াচ্ছে, টিভিতে দেখাল। সাবজিরো টেম্পারেচার।

তোমরা শুয়ে পড়ো বাবা, আমার কাছে চাবি আছে। বাই।

ওভারকোটে কান মাথা ঢেকে, হাতে গ্লাভস পরে, আলো ঝলমল অথচ শুনশান-নিথর-ঠান্ডা কারপার্কে বেরিয়ে এল দেবমাল্য। গাড়িতে উঠতে উঠতে বারবার একটা কথাই মাথায় এল, ও কি সত্যি এভাবে জীবনটাকে চালাতে পারবে? এত দিন ধরে এত কিছু চেষ্টার পরেও, যেভাবে সব ব্যাপারটা চলেছে, তাতে কি ওরও ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে না সব দিক থেকে! বিয়ে করা বউ-এর প্রতি কর্তব্য বোধ, আজীবন নিজের এবং পরিবারের সংস্কৃতি বা সংস্কার, এমনকী কুন্তলার প্রতি আকর্ষণ, সহানুভূতি... এই সবকিছু নিয়ে চললেও, এ সবেরও তো একটা সীমা আছে। কোথাও কি সেই সীমানা প্রাচীর ভেঙে গিয়ে জীবনটা ছারখার হয়ে যাচ্ছে না!

আলাদা হয়ে যাওয়া কিংবা ভাঙাভাঙির কথা মাথায় এলেও, সত্যি কি তার বাস্তব রূপটা এত দিন মনে ঠাঁই দিতে পেরেছে দেবমাল্য? একটু গভীরে গেলেই যে বারবার কেমন অপ্রস্তুত, দিশেহারা মনে হয়েছে নিজেকে, ভবিষ্যৎকে মনে হয়েছে ধূসর- এলোমেলো-গন্তব্যহীন। নাহ, সে জীবনযাপন আরও যন্ত্রণাময়, দু বছর ঘর করার শিকড়বাকড় উপড়ে তুলে ফেলার কষ্ট সহ্য হবে কি? এদেশে বসবাস করলেও, মনের দিক-থেকে যে মেমসাহেবদের মতো স্মার্ট, হয়তো বা বাস্তবও কিংবা

আত্মজীবনমুখী, কি ভাটপাড়ার দেবমাল্য বাগচি হতে পারে! কুন্তলার ভবিষ্যৎ-ভাবনাও কি মনে রেখাপাত করে না!

কিন্তু এখন যে সেই মানুষটাই কখনও আরও বেশি উগ্র, বেপরোয়া, এমনকী বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। হয়তো ওর জীবনের অতীত আর কোনও নিবিড় অন্ধকারকে পরাজিত করার জন্যই কুন্তলার এমন আস্ফালন, আচরণ, প্রতিশোধ চরিতার্থ করার অজানা-গোপন বাসনা, অবচেতন মনে অগ্নিসংযোগের ভাবনা; কিন্তু সে-ও নির্মম ব্যাধি। আরোগ্যের যাবতীয় আয়োজন-যোগাযোগ, সম্পর্কের নিরিখে, সহানুভূতিতে-ভালবাসায়, শ্রম-যত্ন-অর্থ... সবই দেওয়া যায়, করা যায়। কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই জীবন কিংবা প্রাণপাত করতে পারবে কি? হতাশা আর গ্লানি কোথায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে দেবমাল্যকে? দেবতোষ আর নির্মলাকে?

মাত্র কদিন আগেই ব্যাসিলডনের বাড়িতে গিয়ে কুন্তলা যা বলে এসেছে, শুনে আকাশ থেকে পড়েছিল দেবমাল্য। নিশ্চয়ই ক্ষ্যাপামির জেরে নয়, অন্তত কোথাও ওর নিজস্ব যুক্তি, বোধ একটা চূড়ান্ত আর বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইঙ্গিত দিয়েছে সেদিন। কোথাও, কারও কাছ থেকে পরামর্শ, মানসিক সমর্থন পাচ্ছে কি কুন্তলা?

অথচ তার পরেও যে একের পর এক আকস্মিক বিভ্রাট ঘটিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। যে-কাণ্ড ও আজ করেছে, উত্তরোত্তর ওর অসহিষ্ণুতা, অসূয়া যে হিংস্র ভাঙনের পথ ধরে এগিয়ে চলেছে, দেবমাল্য কি টিকে থাকবে তার পরেও?

উদ্বেগ উত্তেজনা আর দুর্ভাবনার মধ্যে মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে। এখন নিশুত রাতের অন্ধকার ঘরে বিছানায় শরীরটা ছেড়ে দিতেই যেন বাঁচন-মরণের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল দেবমাল্য। এ কী জীবনযাপন ও করছে দুবছর ধরে! কোন ভালবাসা, মায়ামমতায় জড়িয়ে রয়েছে ত্রিশ বছরের এই জীবদ্দশা! কী অপরাধ করেছে ও, ওর বাবা-মা?

অবসন্নতায় তলিয়ে যেতে যেতেও মনে হল, পারবে কি, এভাবে এর

পরেও জীবনটাকে টেনে নিয়ে চলতে পারবে দেবমাল্য?

তিনচার দিন পরে প্রায় এই ভাবনাটারই প্রতিধ্বনি শুনল মানসের কথায়।

ভেবে দ্যাখ টিপলু, এরকম একটা স্ট্রেস নিয়ে তুই ওর সঙ্গে লাইফ কাটাতে পারবি?

একটু চমকে গিয়ে দেবমাল্য তাকাল মানসের দিকে।

তুই কী অলটারনেটিভ সাজেস্ট করিস?

আমি কিছু সাজেস্ট করছি না। কিন্তু অলটারনেটিভ তো একটাই। আইনগত বিচ্ছেদ।

ডিভোর্স!

ডিভোর্স বলে অমন আঁতকে ওঠার তো কিছু নেই! তা নয়তো এ কদিনে তোর যা হাল হয়েছে দেখতে পাচ্ছি...তুই নিজেই টিকে থাকতে পারবি কি না সন্দেহ আছে। ইন ফ্যাক্ট ডিপ্রেশনে ডিপ্রেশনে তোরই এখন যা স্টেট অব মাইন্ড, আমার মনে হচ্ছে তোর অ্যান্টিডিপ্রেশেন্ট মেডিকেশন-এর দরকার।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেবমাল্য বলল, দরকার হলে তাই দে।

সেটা দিতেই পারি, মানস বলল, কিন্তু সেই সঙ্গেই তোর কজ অব ডিপ্রেশনটা যদি থেকেই যায়, তা হলে ওষুধ খেয়ে লাভ কী?

আমার কজ অব ডিপ্রেশন বলতে তুই...কুন্তলাকেই বোঝাচ্ছিস তো?

নট অ্যাজ আ পারসন, বাট য়োর রিয়্যাকশনস টু হার বিহেভিয়র-নেচার, দ্য ওয়ে শি লিডস হার লাইফ, সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্তহীনতা... রেকলেসনেস। অ্যান্ড য়্যু ডোন্ট নো আপটু হোয়াট এক্সটেন্ট শি ক্যান গো... শি ইজ এক্সট্রিমলি ভালনারেবল, ফট করে ড্রাগ ধরতে পারে, অ্যান্ড ইভন ক্যান স্লিপ উইদ এনিবডি...।

দেবমাল্য মাথা নেড়ে বলল, থাক-থাক মানস, আর বলিস না।

মানস তার পরেও বলল, কিন্তু তোর ডিপ্রেশনের কারণ আরও আছে, আমি সেগুলো নিয়েও কনসার্নড। তোর সাবকনশাস মাইন্ডে

এবার একটা হেট্রেড তৈরি হচ্ছে তোর নিজের জন্যই...বাড়তে দিলে তুই নিজেকেই ফেলিওর মনে করবি এর পরে। তা ছাড়া তোর একটা গিল্ট তৈরি হচ্ছে ভেতরে ভেতরে মাসিমা-মেসোমশায়ের জন্য। হচ্ছে না?

কিছু না বলে মাথা নিচু করে বসে রইল দেবমাল্য।

মানস বলল, মেজর ডিপ্রেশনের অন্য সাইন-সিম্পটমগুলোও তোর মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

যেমন?

চোখেমুখে জামাকাপড়ে সাইনস অব সেলফ-নেগলেক্ট রয়েছে, নিশ্চয়ই তোর অ্যাপেটাইট নেই, সেই জন্য ওয়েট লুজ করছিস, রাতে ঘুম নেই, তাই চোখের নীচে কালি...কত বলব! এর পরে শালা ধ্বজভঙ্গ হয়ে যাবি, আর দাঁড়াবে না...তখন ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে তুই-ই ওভারডোজ নিয়ে কোন দিন লটকে পড়বি...।

হাসি নয়, হাসির মতন একটা ভাব করে দেবমাল্য বলল, বউকে দেখাতে নিয়ে এসে, আমিই যে তোর পেশেন্ট হয়ে গেলাম!

তাই তো হয়! কিন্তু তোর বউ এই সিরিয়াসনেস অব দ্য প্রবলেম কিন্তু রিয়ালাইজ করবে না।

বাবা, মা?

ওঁরা করবেন। প্রথম প্রথম সময় লাগতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক পারবেন। কেন জানিস? ছেলেমেয়েরা বাবা-মার জন্য যত চিন্তা করে, ভালবাসে, বাবা-মা কিন্তু ছেলেমেয়ের জন্য তার থেকে অনেক বেশি ভাবেন, অনেক বেশি ভালবাসেন।

চারটের মধ্যেই গভীর অন্ধকার নেমে এসেছে বাইরে। লন্ডনের রাস্তায় আলো জ্বলে উঠেছে। মানসের হাসপাতালের চেম্বারেও উজ্জ্বল আলো জ্বলছে কোণে দাঁড় করানো স্ট্যান্ডলাইট থেকে। দেবমাল্য ঘড়ি দেখল। জিগ্যেস করল, তোর সময় নষ্ট করছি কি?

মানস বলল, না। বুধবার বিকেলটা আমার অফ। তোর মতো ক্লায়েন্টদের জন্যই থাকি। কফি খা।

ঘরের সঙ্গে লাগোয়া অ্যান্টিচেম্বারে ঢুকে কফির কেটলির স্যুইচ অন করে দিল মানস।

দেবমাল্য জিগ্যেস করল, মানস, কুন্তলার চিকিৎসা করে কোনও লাভ হবে শেষ পর্যন্ত?

মানস সোজাসুজি উত্তর দিল না কথাটার। বলল, তোর এই কথাটা জিগ্যেস করার কারণ আমি জানি। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, তোকে সেই উত্তরটা দেওয়ার আগে বলি, এতক্ষণ তোর সঙ্গে আমি যে কথা বলছিলাম, সেটা ঠিক সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে নয়। অনেকটা পুরনো ছোটবেলার বন্ধু হিসেবে।

দেবমাল্য বলল, সেটা আমি জানি।

কেন বলছিলাম জানিস? উত্তরটা মানস নিজেই দিতে শুরু করল। এটা পিওরলি আমার হিউম্যান রিয়্যাকশন। সেই গত বছর পুজোর সময় তোদের সঙ্গে দেখা, যোগাযোগ, তারপর কুন্তলাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা...সব কটা মিলিয়ে বহু বছর পরে আমরা খুব দ্রুত আবার কাছাকাছি এসে পড়েছি। ইন ফ্যাক্ট, বিশেষ করে কুন্তলার চিকিৎসা শুরু করার পর থেকে আমি তোর, তোদের ফ্যামিলি ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক ডিটেল জেনেও ফেলেছি।

দেবমাল্য বলল, অনেক কথা তো আমিই তোকে বলেছি।

বলেছিস। তারপর গত তিনচার সপ্তাহে বেশ কয়েকটা সেশনে, কুন্তলার কাছ থেকেও আমি অনেক খবর বার করেছি—মেইনলি অবশ্য ওর এবং ওদের ফ্যামিলির বিষয়ে এবং বুঝতেই পারছিস উইথ ডিফিকাল্টি... নানারকম টেকনিক অ্যাপ্লাই করে।

অর্থাৎ আমরা দুজন এবং দুজনের ফ্যামিলি সম্বন্ধে তুই এখন অনেক কিছু জানিস।

এগজ্যাক্টলি। আর বিশ্বাস কর টিপলু, আমি বেশ ইনভলভড হয়েও পড়েছি।

তা তো হবেই। সেটাই তো স্বাভাবিক। হয়তো বিদেশবিভুঁই-এ বলে...।

দেবমাল্যর কথার মধ্যেই মানস বলে চলল, ইদানীং প্রায়ই দেখছি, ছেলে-মেয়ের বিয়ে, তারপর এই দেশে-বিদেশের টানাপোড়েন, অ্যাডজাস্টমেন্টের গন্ডগোল... এসব নিয়ে যে কত সোসিও-মেডিকো-ফ্যামিলিয়াল সমস্যা হচ্ছে, ডিজাস্টার হচ্ছে... অনেকটা আমরা এই ডিপার্টমেন্টে বসে বুঝতে পারি। যাতায়াত যোগাযোগ বহু গুণ বেড়েছে, মানুষের অ্যাম্বিশন-এক্সপেক্টেশন বেড়েছে... অবভিয়াসলি ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে কিন্তু টলারেন্স কমেছে। দেশে এই সমস্যাটা হচ্ছে না, তা নয়। কিন্তু ডেভেলাপড কান্ট্রির প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যাওয়ার ফলে, গন্ডগোল কিছু হওয়া মানেই হ্যারাসমেন্টের চূড়ান্ত, কেননা, নিজেদের গোলমাল ছাড়াও এখানে অন্য দেশের আইনকানুন, ভিসা-সমস্যা, টাকাপয়সার লেনদেন, বাচ্চা নিয়ে টানাটানি... জটিলতা, তার এফেক্ট, কোথায় গিয়ে পৌঁছায় ভাব তো!

দেবমাল্য বলে উঠল, থ্যাঙ্ক গড, এর মধ্যে যে আমাদের একটা বাচ্চাটাচ্চা হয়ে যায়নি...।

মানস বলল, গত শুক্রবার রাতে তুই যখন আমায় টেলিফোন করে বললি, কুন্তলা স্যুইসাইড করার অ্যাটেম্পট নিয়েছে, ওয়েল... আমি জানতাম,দ্যাট ওয়াজ মোর লাইকলি অ্যান অ্যাটেনশন-সিকিং বিহেভিয়র, কিন্তু তখনই আমি ভেবেছিলাম, অ্যাটলিস্ট বন্ধু হিসেবে আমি তোকে কয়েকটা স্পষ্ট কথা বলব। য়্যু ক্যান্ট গো লাইক দ্যাট টিপলু।... দাঁড়া কফিটা নিয়ে আসি।

মানস পাশের ঘরে যেতেই যেন কয়েক দিন আগের স্মৃতি ঢেউ-এর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল দেবমাল্যর মনে।

সেদিন উইকএন্ড-এর ছুটির ঠিক আগেই দেবতোষের টেলিফোন পেয়েছিল দেবমাল্য।

টিপু তুই বাড়ি ফিরবি কখন?

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এখান থেকে বেরুব। কেন ফোন করছ বাবা?

ভাবছিলাম... একবার শক্তিদার বাড়িতে ঘুরে যেতে পারবি?

আজকে? মানে সন্ধেবেলার মধ্যেই?

তেমন অসুবিধে থাকলে ছেড়ে দে। আমি এমনিতেই যাচ্ছি এক্ষুনি... একটা প্রবলেম হয়েছে শুনেছি... দেখি।

প্রবলেমটা কী? সিরিয়াস কিছু?

তোর শক্তিজেঠুর বুকে ব্যথা হয়েছে...বউদিরও তো ওইরকম অবস্থা। এদিকে পাপাইরা গেছে কলকাতায়। তৃষা বেচারি খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছে। জিপিকে অবশ্য খবর দিয়েছে—।

তোমায় খবর দিল কে?

তৃষাই দিয়েছে। জিপি খুবই চেনা ওদের, বোধহয় সোজাসুজি অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে চেয়েছিলেন... ক্যাজুয়ালটিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য...।

দেবমাল্য একটু অস্থিরভাবে বলে ফেলল, তোমার আগে আমাকেই তো একটা টেলিফোন করা উচিত ছিল।

বউদিও তাই বলেছিলেন। কিন্তু মেয়েটা বুদ্ধিমতী বলেই...আগে আমায় ফোন করেছে। আসলে বুঝতে পারছিস তো...তোকে ডাকলেই মামণি আবার...সবাই তো সব জানে। এদিকে হঠাৎ দরকারে আমরা ছাড়া ডাকবেই বা কাকে!

জেঠু এখন কোথায়?

নিশ্চয়ই বাড়িতেই হবে, আমি দশ মিনিটে পৌঁছব বলেছি—।

তুমি যাও। যদি ডাক্তার বলেন, কিংবা অ্যাম্বুলেন্স এসে যায়, স্ট্রেট হাসপাতালে চলে যেয়ো। আমি এক্ষুনি বেরুচ্ছি...জেঠুর বাড়িতে যাচ্ছি, দরকার হলে হাসপাতালে চলে যাব...। এ সময়টা লন্ডনের জ্যাম কীরকম বুঝতে পারছ তো... এনিওয়ে...যত তাড়াতাড়ি পারি...। আর মুহূর্ত মাত্র দেরি করেনি দেবমাল্য। অফিসে বলার কিছু ছিল না। গাড়িতে উঠেই মোবাইলের হ্যান্ডসেট ঠিক করে নিয়েছিল, ছোট্ট মাইক্রোফোনটা কানে লাগিয়েই ছুট ছুট।

কিন্তু ছুটব বললেই ছোটা যায় না। দুপাশের বড় বড় গথিক অট্টালিকার মাঝখানে সরু সরু মধ্য-লন্ডনের রাস্তা, তার ওপর শুক্রবার সন্ধ্যার ট্র্যাফিকে দেবমাল্যকে মাথাটাই ঠান্ডা রাখতে হয়েছিল বেশি। আর শম্বুক গতিতে টেমস-এর ওপর পাটনি ব্রিজ পেরিয়ে, এ-টুয়েন্টি থ্রি

রাস্তাটা ধরার আগেই, অনিবার্য মাথায় এসেছিল কুন্তলাকে খবরটা জানানোর কথা। সূক্ষ্মভাবে ওর বিচারবিবেচনার কথাটাও মাথায় আসেনি, তা নয়। কিন্তু মাত্র কটা দিন আগেকার রাগারাগি ভাঙাভাঙির পরে যে স্থিতাবস্থা চলছিল, আশা করেছিল, সেই কারণেই জেঠুর বাড়ি ছুটে যাওয়ার উদ্দেশ্যটার অন্য অর্থ ও করবে না।

মোবাইল থেকে দ্রুত খবরটা দিয়েই বসেছিল, তুমি চিন্তা করো না, জেঠুর কন্ডিশন স্টেবল বুঝলেই আমি ফিরে যাব।

কুন্তলা বলেছিল, হার্ট অ্যাটাকে স্টেবল হতে হতে রাত কাবারও তো হয়ে যেতে পারে...।

শোনো, চেস্ট-পেন মানেই তো হার্ট অ্যাটাক নয়... রাত কাবারের প্রশ্ন উঠছে কোথায়? দেখা যাক ব্যাপারটা—।

দ্যাখো! তবে তোমার বাবা তো গেছেনই—আর সেই বোনঝিও তো আছে।

বাবারও বয়স হয়েছে কুন্তলা! আর... তৃষা কদিনই বা আছে এদেশে। তা ছাড়া জেঠুর এরকম অবস্থায়... ।

হ্যাঁহ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি...তোমার নিজের হার্টটা সামলে রেখো। যা দরদ দেখছি...!

কী বলছ কুন্তলা! ওঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক...।

ঠিক আছে, যাচ্ছ যাও... শুক্কুরবার সন্ধেটাই মাটি...।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়েছিল কুন্তলা।

অসন্তোষটা বুঝেছিল দেবমাল্য। কিন্তু ওর কিছু করার ছিল না। মনে এসেছিল, ঘনিষ্ঠজনের এমন বিপদের সময়েও ভাবনাকে এত সংকীর্ণ করে কেউ রাখতে পারে! এ-ও কি শুধু পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার, নাকি নেহাতই কাল্পনিক ঈর্ষার জ্বলুনি! কিন্তু একবারের জন্যও যেটা ওর মাথায় আসেনি, তা হচ্ছে, সেই অসন্তোষ আর ঈর্ষার কী দুর্বিনীত ফলাফল দাঁড়াতে পারে। প্রায় নিজের পরিবারের একটি মানুষের অসুস্থতা গুরুত্ব পায়নি কুন্তলার কাছে, ও কল্পনা করে নিচ্ছিল তৃষা আর দেবমাল্যর অন্তরঙ্গতা।

হাসপাতালে যেতে হয়নি শক্তিজেঠুকে। অ্যানজাইনা-র রুগি, বইপত্র গুছিয়ে তুলে রাখতে গিয়েই বেশি ব্যথা অনুভব করেছিলেন। অ্যাম্বুলেন্স এসেছিল, ইসিজি করে প্যারামেডিক সার্ভিস-এর স্টাফ অক্সিজেন দিয়েছিলেন। একটু একটু করে সুস্থ বোধ করেছিলেন শক্তি। ইসিজিতে মাইওকার্ডিয়াল ইনফার্কশন ছিল না। জিপি এসে দেখেছিলেন। মানসিক অবলম্বন জানিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলেন সকলেই। কিন্তু সময়টা কেটে গিয়েছিল দ্রুত এবং বেশ কিছুক্ষণ। আর সেই সময়টুকুর মধ্যেই বিলারিকের ফ্ল্যাটে একটি বিপজ্জনক নাটক রচনা করেছিল কুন্তলা ঈর্ষার বশে।

নাটকই তো! দু-এক গ্লাস ওয়াইনের সঙ্গে খেয়েছিল গোটা কয়েক প্যারাসিটামল ট্যাবলেট, কয়েকটা দু-মিলিগ্রামের ডায়াজিপাম-ও। বাঁ কবজির ওপর কয়েকটা আঁচড় কেটেছিল ভোঁতা ছুরি দিয়ে। তারপর নাইন-নাইন-নাইন ডায়াল করে নিজেই ডেকেছিল এমার্জেন্সি সার্ভিসকে। দেবমাল্যর মোবাইল নম্বরও দিয়েছিল। কিছুটা দিশাহারার মতোই দেবমাল্য টেলিফোন করেছিল মানসকে। তারপরেই ছুটেছিল ব্যাসিলডন জেনারাল-এ।

বিহ্বল আর নির্বাক দৃষ্টিতে সমস্ত ঘটনাগুলোর মধ্যে নিজের ভূমিকা আবিষ্কার করছিল তৃষা। কিছুটা জানা ছিল সেই প্রথমদিন কুন্তলাকে দেখার পর থেকে। মাস দেড়েক সময়ে বুঝতে পেরেছিল আরও অনেক কিছু। দেবমাল্যর হতাশ করুণ অসহায়তাকে আর একবার সামনে থেকে দেখল সেদিন। নিজেকে অপবাধী মনে করেছিল কি তৃষা? কেন করবে? বরং...।

শুধু কফি নয়, প্লেটে করে বিস্কুট আর কাজুবাদামও নিয়ে এল মানস। কাপে চুমুক দিয়ে বলল, দ্যাখ টিপলু, তোকে আমি পার্সোনাল পয়েন্ট অব ভিউ থেকে যা-ই বলি না কেন, দ্যাট উইল নট অ্যাফেক্ট কুন্তলাজ ট্রিটমেন্ট। আমরা ওকে অলরেডি কগনিটিভ বিহেভিয়রাল থেরাপির জন্য রেফার করেছি। খোঁজ নিয়েছি এখনও পর্যন্ত ওর রেসপন্স পুওর। হয়তো দরকার হলে ওকে ভর্তিও করতে হবে, কেননা, ও রিস্ক

বিহেভিয়র করছে। যদিও গত সপ্তায় যেটা করেছে, সেটা নেহাতই সবাইকে বিশেষ করে তোকে অসুবিধেয় ফেলার জন্য।

তা হলেও দেশটা ইংল্যান্ড তো, ওই ব্যাপারটাকে সেলফ হার্ম করার অ্যাটিচুড বলে নোট করতে হবে।

মাথা ঝাঁকিয়ে হঠাৎ দেবমাল্য বলল, নাহ মানস, এভাবে পারব না আমি। একটু থেমে আবার বলল, দু বছর ধরে যেভাবে আমাদের রিলেশনশিপটা ডেভেলাপ করছে...মনে হচ্ছে আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। আমি একা নই, আমাদের ফ্যামিলিটাই রুইনড হয়ে যাচ্ছে। মা-র ডায়াবিটিস কন্ট্রোলে থাকছে না, বাবার ব্লাডপ্রেশার বাড়ছে... আমিই বা কী করছি?

আমি সেসব কথাই বলছিলাম, মানস বলল, যেভাবে তোদের বিয়ে হয়েছে, তাইতে এমন ডিজাস্টার তো ঘটতেই পারে। উলটোটাও হতে পারত। একটা ভাল মেয়ে বিয়ের পরে এদেশে এসে হয়তো বুঝত বদমাইশ একটা ছেলের পাল্লায় পড়েছে। বেশি বোধহয় সেটাই হয়, কাগজপত্রে লেখাও পড়েছি। এক্ষেত্রে তোর ব্যাড লাক, আর এভাবে দেখেশুনে, অল্প আলাপ পরিচয়ের বিয়েতে পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার আগে থেকে ধরাও মুশকিল। য়্যু আর ফেসিং দ্য কনসিকোয়েন্স নাউ।

দেবমাল্য বলল, বাবা-মা কলকাতা যাচ্ছে কদিন পরেই, বলব, কুন্তলার বাড়ির লোকেদের জানিয়ে দিতে—উই আর টেকিং আ ডিসিশন। তা ছাড়া ও তো এমনিতেই আমাদের বাড়িতে এসে বলে গ্যাছে...।

যত সহজে সব হবে ভাবছিস, তা কিন্তু হবে না। মানস বলল। হাওএভার, আগে নিজেকে মেন্টালি তৈরি কর।

সেটা আমার অনেকখানি হয়েই রয়েছে মানস। বিশ্বাস কর, কুন্তলার কথা ভেবে... আউট অব সিমপ্যাথি-ও আমি অনেকদিন...।

ওতে টিকবে না তোদের সম্পর্ক। ডোন্ট টেক মি রং...ম্যারেড লাইফে আরও অন্য কিছু কেমিস্ট্রি লাগে...অ্যাফেকশন-আন্ডারস্ট্যান্ডিং-লাভ—সব মিলিয়েই... চল, উঠতে হবে।

ঝুম হয়ে বসে থেকে শুধু মাথা নাড়ল দেবমাল্য।

বেরুনোর আগে মানস বলল, তুই আর একদিন আয় টিপলু। কুন্তলার আপব্রিংগিং, ওদের ফ্যামিলির কিছু কথা তোর জানার দরকার। আমার মনে হয় যেভাবে তোদের বিয়ে হয়েছে কিংবা বলতে পারিস যেভাবে এরকম অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ হয়, তাইতে অনেক ব্যাপার অজানা থেকে যায়, আর তার রেজাল্ট তো...।

ওর কথার মধ্যেই দেবমাল্য বলল, কুন্তলার কিংবা ওদের বিষয়ে আমার কিছু জানার উৎসাহটাই চলে গেছে।

বুঝতে পারছি, বলতে বলতে ব্রিফকেস হাতে নিয়ে মানস বলল, আসলে তোর দেয়ালে পিঠ ঠেকে গ্যাছে। গেট দিয়ে বেরুতে বেরুতে আবার খুব আকস্মিকভাবে জিগ্যেস করল— টিপলু, তৃষাকে তোর কী রকম মনে হয় রে?

সামান্য অবাক দেবমাল্য, একটু হাসির ছোঁয়া রেখেও ভুরু কুঁচকে বলল, মানে?

গাড়িতে উঠে পড়ল মানস। হাত নেড়ে বলল, ফোন করিস। বাই।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে মানসের শেষ কথাটাই কানে বেজে যেতে লাগল দেবমাল্যর। একইসঙ্গে মনে হতে লাগল, কোন বাড়িতেই বা ও যাচ্ছে, কার কাছে? এই শীতল অন্ধকার নির্জন দেশে, সারাদিন কাজের পরে ও কি কোনও প্রিয়জনের কাছে যেতে পারে না!

৮

তাঁরা কলকাতায় পৌঁছানোর পরে সপ্তাহখানেক কেটে গেল, কিন্তু দেবতোষ রোজই বুঝতে পারেন কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। এমনকী যেসব কাজগুলো সারবেন বলে ঠিক করে এসেছেন, সেসবগুলো আদৌ এগুচ্ছে বলেও মনে হচ্ছে না। সবই যেন হচ্ছে-হবে ভাব। কারও-কারও মানসিকতা যেন, দাঁড়ান হবে, তাড়াহুড়োর কী আছে, কিংবা...আরে

মশাই এটা তো বিলেত না...আবার কেউ যেন এভাবেই স্তোক দেয়, এখন আছেন তো কিছুদিন... দেখছি। দু-একজন স্পষ্টই বলেছে, এ সময়টা ছুটির মরশুম, ওয়েদারটা ভাল, সামনে ক্রিসমাস, নিউইয়ার্স ডে, পার্টি-পিকনিক হলিডে-টলিডে থাকে... কাজকর্ম ঢিলেঢালাই চলে। দেবতোষ খেয়াল করেছেন, উঁচু থেকে নিচু পর্যন্ত যে সমস্ত মানুষই সরকারি বা আধাসরকারি কাজ করেন অথবা রোজগারের জন্য প্রত্যক্ষভাবে নিজের কাজ ও শ্রমের ওপর নির্ভর করতে হয় না এবং কৈফিয়ত দিতে হয় না, ঢিলেঢালা চলার মানসিকতা তাঁদের মধ্যে প্রবল। অথচ এর মধ্যেই ব্যক্তিগত মালিকানার অফিস বা বিদেশি ব্যাংক কিংবা প্রাইভেট হাসপাতালগুলো তো দিব্যি চলছে। কর্মতৎপরতায় কোনও ঢিলেমি নেই।

তা ছাড়া, "মশাই এটা তো বিলেত নয়"—ঠেস দেওয়া এই কথাটাও খুব অপছন্দ করেন দেবতোষ। আমাদের দেশটা আমাদেরই, বিলেত হতে যাবে কোন দুঃখে! আসলে এ কথাটা একটা অজুহাত। ফাঁকি মারাটাই রীতি এবং তাকে সহজ করে নেওয়ার জন্যই যেন একটা দৃষ্টান্তের অবতারণা। কোথাও একটু হীনমন্যতাও বোধ হয় মিশে থাকে এ-জাতীয় কথার সঙ্গে। অথচ প্রাত্যহিক কাজকর্মের ব্যাপারে দেখেছেন, বিদেশবিভুঁই-এ থাকা মানুষদের, অন্তত আর্থিক দিকে কিছুটা এক্সপ্লয়েট করার প্রচ্ছন্ন আকুতি যেন প্রায় সার্বজনীন। নেহাত নিজের ঘনিষ্ঠ হৃদয়বান প্রিয়জনরা ছাড়া অনেকের মধ্যেই এই প্রবণতা লক্ষ করেন দেবতোষ। আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে, বাড়ির কাজের লোক, জমাদার, দারোয়ানটিরও প্রত্যাশার হাত যেন লম্বা হয়েই থাকে তাঁদের ধারেকাছে এলে। পুজো কিংবা অনুষ্ঠানের জন্য বেশি চাঁদা দিতে হবে, কাজের মাসি বা মেয়েটি বেশি মাইনে আশা করবে, সেলুনে চুল ছাঁটার ছেলেটি হাবভাবে বুঝিয়ে দেবে অতিরিক্ত টিপস-এর জন্যই সে বেশি তোয়াজ করছে। এমনকী বিমানবন্দরের বাইরে ভিখারিরাও টাকা চায় না, হাত পেতে বলবে, একটা পাউন্ড কিংবা ডলার দিন না স্যার। অভাব নয়, দারিদ্র্যও না, লোভ এবং শোষণ, যাকে সাদা বাংলায় বলা হয় খিঁচে

নেওয়ার মানসিকতা, দেবতোষ খেপে যান সেটাতেই। অথচ মানুষ হিসেবে এমনিতেই তো তাঁদের কার্পণ্য করে চলার কিংবা পুরো দাম উশুল করার মতো স্বভাব না। আদৌ কোনও দিন ছিল বলেও ভাবেন না। নির্মলা আবার তাঁর থেকেও এক কাঠি সরেস। কাজের মাসির বারো মাসের তেরো পার্বণ তো আছেই, তার ওপর মাসির মেয়ের দুঃখের কথা শুনে, নিজের জামাকাপড়-সোয়েটার মায় নগদ কিছু ধরে দিতেও দ্বিধা করেন না। সেই নির্মলাও যেন ইদানীং কলকাতায় এসে তিতিবিরক্ত হয়ে যান। চেনাজানা কারও সঙ্গে অপরিচিত কেউ এই কলকাতার ফ্ল্যাটে এলেই যেন একটা টেনশন বাড়তে থাকে। এ কথা, সে কথার মধ্যে হঠাৎ কখন বেড়ালটি ঝুলি থেকে বুঝি বার করল।

বছর আঠারো বিলেতে থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝতে পারেন দেবতোষ। অধিকাংশ মানুষের নিম্ন কিংবা মধ্যবিত্ত নির্বিশেষে, লোভ এবং ভোগ করার ইচ্ছে খুব বেড়ে গেছে। প্রাপ্য কোনও কিছুতে কেউ খুশি নয়। প্রত্যাশা সব সময়েই অতিরিক্তের প্রতি। গত বছর কলকাতায় এসে এক বন্ধুর মুখে একটি প্রচলিত সমসাময়িক প্রবাদ বা রসিকতার কথা শুনে দেবতোষ হাসতে পারেননি। প্রবাদটি চাকুরিজীবীদের জন্য ঠাট্টা করা একটি মন্তব্যই আসলে। "আসি যাই মাইনে পাই, কাজ করলে উপরি চাই।"

দেবতোষের মনে হয়েছিল, নিছক রসিকতাই কি মন্তব্যটি?

ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন, মিউটেশন সার্টিফিকেট বার করা, ইনকাম ট্যাক্স-এর ক্লিয়ারেন্স দেখানো, তাঁর ব্রিটিশ পাসপোর্ট থাকলেও তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত বলে পরিচয়পত্র করানো... এইসব কাজ করতে গিয়েই তাঁর যে অভিজ্ঞতা, তাইতে উপরোক্ত মন্তব্যটিকে তিনি খুব হালকা আর উপহাসের বলে ভাবতে পারেননি। অপ্রিয় সত্য বলেই মনে করেছিলেন।

মাঝেমাঝে নিজেকেই সমালোচনা করেন দেবতোষ। তিনি কিছুটা 'সিনিক' হয়ে উঠছেন নাকি?

কিংবা খানিকটা বয়সের দোষে আর কিছুটা বিলেতের জলহাওয়ায় তিনি সহ্যশক্তি হারিয়ে নাক সিঁটকোচ্ছেন সব কিছুতে!

নাহ সেটা তো মানতে পারবেন না।

একটু ধুলোধোঁয়া, গরমটরমে সাময়িক জেরবার হলেও দেশের আকুলতা, নাড়ির টান কি যাওয়ার! হাজার খুঁটিনাটি অসুবিধের পরেও ফিরে যাওয়ার সময় মন খারাপ, তারপর আবার হা-পিত্যেশ করে বসে থাকা—এ সব আন্তরিক অনুভূতি কি মিথ্যে! তা ছাড়া দেশের অনেক ভাল কিছু, প্রশংসা করার মতন বিষয়ও কি চোখে পড়ে না?

রাস্তাঘাটের নিশ্চয়ই কিছু উন্নতি হয়েছে, লোডশেডিং প্রায় নেই, টেলিফোন পরিষেবা বেশ ভাল। কলকাতায় গাছ বেড়েছে, বাদুড়ঝোলা ভিড় নেই ট্রামে-বাসে। যদিও বিরল, তা হলেও হৃদয়বান কিছু কিছু মানুষও কি চোখে পড়েনি। এমনকী সরকারি দপ্তরটপ্তরেও! জীবন বিমা করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি মেয়ের অযাচিত উপকার কোনও দিন দেবতোষ ভুলবেন? কিংবা নন্দন প্রেক্ষাগহে উচ্চাঙ্গসংগীতের একটি বিরল অনুষ্ঠান, কোনও আসন না থাকা সত্ত্বেও কি তিনি শুনতে পেতেন, যদি না স্বপ্নাভ বলে সেই হৃদয়বান যুবকটি ব্যবস্থা না করে দিত? টিকিটের পয়সা তো নেয়ইনি, উপরন্তু চা-সিঙাড়া খাওয়াল। অথচ সে-ও তো সরকারি কর্মচারী।

তো এ সব জিনিসও যদি দেবতোষের চোখে পড়ে, অন্তরে বাজে, তা হলে তিনি সিনিক হবেন কেন!

মনে মনে দেবতোষ বিশ্বাস করেন, তাঁর ভাবনার একটা ভারসাম্য আছে। বরং অনেক বছর বিদেশে আছেন বলেই, ইদানীং পক্ষপাতিত্বহীন এক ধরনের ভাল খারাপ বিচার তিনি স্বচ্ছ দৃষ্টিতেই করতে পারেন। আর দুর্বলতা বা সমালোচনা, সে তো যে-কোনও মানুষের ব্যক্তিগত রুচি দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভরশীল।

আর একটা ব্যাপার বুঝতে পারছেন দেবতোষ।

এবার কলকাতা আসা তক, কী একটা যেন অস্বাচ্ছন্দ্য তাঁর অনুভূত হয়ে চলেছে। এক সপ্তাতেও সেটা কাটেনি। না, শারীরিক অসুবিধে কিংবা জেটল্যাগ নয়। ব্যাপারটা মানসিক। ইংরিজিতে যেটাকে বলে, 'বেটার ফেল্ট দ্যান এক্সপ্রেসড' সেই রকম। হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়েছে,

কেউ কি অনুসরণ করছে? কিংবা কাজের অছিলায় এসে কেউ যেন তাঁদের পরিস্থিতি, অবস্থান জেনে গেল। অথবা পরিচিত মানুষজনও যেন একটু এড়িয়ে চলছে। কারও কারও কথায় যেন প্রচ্ছন্নভাবে সতর্ক করার ইঙ্গিত।

কেন এরকম মনে হবে! যে-কোনও কারণে তিনি নিজেই কি একটু সচেতন, স্পর্শকাতর হয়ে রয়েছেন? কে জানে বাবা।

নির্মলাকে কথাটা বলতে গিয়েও, মুখ খুললেন না দেবতোষ। নিশ্চিত কোনও উদাহরণ কি দিতে পারবেন? না পারলে, অহেতুক মানুষটাকে সন্দেহবাতিক করে তোলা হবে। থাক, দেখা যাক। মাটিতে পা দিয়ে চলা লোক তিনি। আসলে মফস্‌সলের মানুষ, কলকাতায় যাতায়াত যোগাযোগ থাকলেও, একটু নিঃসঙ্গতাও কি অনুভূত হয় না! কিন্তু ঘাবড়ানোর মতো মন নয় তাঁর।

টুকিটাকি ছোটখাটো ব্যাপার ছাড়া, দুটি অন্তত বড় কাজের ভাবনা এবার নিয়ে এসেছেন দেবতোষ। যেভাবে হোক ফয়সালা করে যাবেন বলেও মনে মনে ঠিক করে রেখেছেন। ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন এবং মিউটেশন সার্টিফিকেটটা অবশ্যই বার করবেন। আর কুন্তলার বাপের বাড়িতে, বিশেষ করে বেয়াইমশাই দিবাকরবাবুর সঙ্গে ছেলে আর বউ-এর সাম্প্রতিক অবস্থা নিয়ে বিশদ আলোচনা করবেন। ওঁদের মতামত, মানসিকতা জানার পরে ফিরে গিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে বলেও ভেবে রেখেছেন। অন্তত ওঁদের বোঝাতে হবে, মামণির ব্যাপারে ওঁরা কিছু দায়িত্ব না নিলে, ওদের সম্পর্কটা খুবই খারাপ দিকে যাচ্ছে। ওঁরা কত দূর জানেন, কী ভাবছেন, কী করা উচিত, কিছুদিন কুন্তলাকে বাড়িতে এনে রাখলে ভাল হবে কি না এসব কথাবার্তা সামনাসামনি স্পষ্টাস্পষ্টি হওয়া দরকার।

এর মধ্যে দুদিন টেলিফোনও করেছিলেন দেবতোষ। অথচ এখন কলকাতায়, কাছাকাছি এসেও, কথা বলতে গিয়ে মনে হল ওঁদের যেন সেই ব্যগ্র, উচাটন ভাব নেই। এটা কি খুব স্বাভাবিক! জামাইয়ের কথা ছেড়ে দিলেও, এর সঙ্গে তাঁদের মেয়ের জীবনটাও তো জড়িয়ে রয়েছে।

প্রথম দিন টেলিফোন করার পরে, দিবাকরবাবু তো ফোন ধরতেই পারলেন না। কাঞ্চন ধরেছিল, কিন্তু মনে হল সে-ও এত ব্যস্ত লোক যে, প্রথমে স্মরণ করতেই পারল না কার সঙ্গে কথা বলছে।

দেবতোষ বলেছিলেন, দিবাকরবাবুর সঙ্গে কথা বলতে পারি? আমি দেবতোষ বাগচি...মানে...। ওঁকে শেষ করতে না দিয়েই একটা রুক্ষ কণ্ঠস্বর বেজে উঠেছিল।

আপনার কেসটা কী? পুলিশ ধরেছে, না কি ট্রাক-এর লাইসেন্স নিয়ে কেস খেয়েছেন?

প্রথমে বিভ্রান্ত হলেও, পরমুহূর্তে দেবতোষ বুঝেছিলেন কণ্ঠস্বরটি কাঞ্চনের এবং তাঁর নামটি পরিচিত কারও বলে ওর মাথায় ঢোকেইনি।

দেবতোষকে পরিচয় দিতে হল।

তুমি কাঞ্চন তো? আমি তোমার ছোট বোন কুন্তলার শ্বশুর, দেবতোষ বাগচি। চিনতে পারলে কি?

হ্যাঁ এবার চিনল কাঞ্চন। —আরে, ওহ-হো-হো... মানে মেসোমশাই তো? সরি-সরি। আপনারা পৌঁছে গেছেন লন্ডন থেকে?

আমরা তিনদিন আগেই এসেছি।

ঠিক ঠিক, বাবা বলছিল বটে।

তোমরা ভাল আছ? বাবা-মা, কাকা-কাকিমা, ছেলেমেয়েরা সব...।

হ্যাঁ মেসোমশাই... আছে আর কি সব, ঠিকই আছে... আমাদের এখানকার অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন...। আপনারা?

আমাদেরও চলে যাচ্ছে যা হোক করে।

কী সব ঝামেলা-টামেলা হচ্ছিল শুনছিলাম, দেবু আর কুন্তলার মধ্যে... আমি বিশেষ জানি না অবশ্য—।

এবার তোমাদের সবারই একটু জানতে টানতে হবে বলেই মনে হচ্ছে।

বটেই তো... কী বলব বলুন স্যার, মানে কাকাবাবু, সরি, মেসোমশাই এই পার্টির কাজ, তারপর বেলতলার চাকরি, লাফড়ার আর শেষ নেই।

কী একটা শব্দ ব্যবহার করল কাঞ্চন, ধরতে পারলেন না দেবতোষ।

তবে মানেটা আন্দাজে বুঝে নিয়ে বললেন, আসলে ওদের ব্যাপারে তোমাদের সকলের সঙ্গে কথা বলাটা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে... বুঝতে পারছি, তোমরা সকলেই খুব ব্যস্ত, রায়বাবুও নিশ্চয়ই...।

বাবা তো এখন রিটায়ার করে দিব্যি ফিট, আমাদেরই টাইট অবস্থা মেসোমশাই... কলকাতা মেগাসিটি হচ্ছে...

দেবতোষ টের পাচ্ছিলেন, কাঞ্চনের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। ওর কথার মধ্যেই বললেন, রায়বাবুর সঙ্গে কথা বলা যাবে?

হ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কাঞ্চন বলল, আপনি বাবার নম্বরটা লিখে নিন।

কলম টেনে নিতে নিতে সামান্য অবাক হয়ে বললেন, ওহ্ আচ্ছা, এটাই তোমাদের বাড়ির নম্বর না?

তাই ছিল। পুলিশের কোটায় পাওয়া নম্বর তো, রিটায়ার করার পরে আমার নামে ট্রান্সফার করিয়ে নিয়েছি। বাবার আর একটা ফোন আছে। এখন তো ল্যান্ডলাইনে বেশি ফোন হয় না কলকাতায়, সবারই মোবাইল। দুটো নম্বরই লিখে নিন।

নম্বর লিখলেন দেবতোষ। কাঞ্চন আবার বলল, ছুটিছাটা দেখে একদিন চলে আসুন তা হলে... ওদের কেসটাও তো সেট্‌ল করতে হবে... দেখুন বাবা কী বলে!

নাহ্, সেদিন আর দিবাকর রায়-এর নম্বরই পাওয়া গেল না। সারাক্ষণই এনগেজড। অর্থাৎ অবসর নেওয়ার পরেও ভদ্রলোক বেশ ব্যস্তই থাকেন বোঝা গেল। পরের দিন অবশ্য দিবাকর নিজেই টেলিফোন করেছিলেন। নিশ্চয়ই ছেলের কাছে শুনে অপ্রস্তুত বোধ করেছিলেন। সকাল সকাল ফোন করে আন্তরিক গলাতেই বেজেছিলেন।

আরে কী কাণ্ড বলুন তো মশাই... লন্ডন থেকে বেয়াই এসে কলকাতায় বসে রয়েছেন আজ চারদিন... আর আমি কিনা...।

কণ্ঠস্বরের উষ্ণতায় স্বস্তি অনুভব করেছিলেন দেবতাষ। বলেছিলেন, না-না তাতে আর কী হয়েছে! আমরা তো ছুটিতেই এসেছি। কিন্তু আপনি তো রিটায়ার করার পরেও বেশ ব্যস্তই আছেন মনে হচ্ছে!

তেমন কিছু না, দিবাকর বললেন, তবে ওই আর কি, পুলিশ অফিসাররা রিটায়ার করলেও প্রাইভেট কনসার্নগুলো ছিনেজোঁকের মতন বসে থাকে কিনা... তা ছাড়া ছুটি এনজয় করার কপালও তো থাকা চাই...।

দেবতোষ বললেন, কপালের সঙ্গে ইচ্ছেটাও তো জরুরি, নাকি?

ছুটি ভোগ করার ইচ্ছে কার না থাকে দেববাবু? তবে রোজগারের অভ্যাস একটা ফ্যাক্টর হলেও, প্রয়োজনটাকেও ঠেকাতে পারছি কোথায় বলুন!

আপনার সাংসারিক প্রয়োজন এখন আর কতটা জানি না, অভ্যাসটা অবশ্যই.. ।

চেপে গেলেন দেবতোষ। রোজগারের নিরিখে শুনেছেন এদেশের বহু পুলিশ অফিসাররা ধারেও কাটেন, ভারেও কাটেন। কী কথা বলতে গিয়ে কী বলে ফেলবেন, কোথায় আঁতে লেগে যাবে। কী দরকার!

অন্য কথা বলার মতো দেবতোষ বললেন, তো আপনি এখন কোথায় আছেন? মানে নতুন করে আবার..।

দৌড়ঝাঁপ খুব একটা আর করি না। একটা প্রাইভেট এয়ারলাইন্স-এর সিকিউরিটি অ্যাডভাইসার হিসেবে আছি। চেনাজানা-যোগাযোগ আর ঘাঁতঘোত বোঝা লোক হিসেবেই ওরা ডেকেছে। বুঝতেই পারছেন পরিচিতি আর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে—।

খুব ভাল, খুব ভাল। মনে মনে কথা হাতড়াতে গিয়ে দেবতোষ ভাবছিলেন, মেয়ে-জামাইয়ের প্রসঙ্গটা তো দিবাকরেরই ব্যগ্রতার সঙ্গে উত্থাপন করা উচিত। কিন্তু করছেন না তো! নিজেই আবার বললেন, শরীরটরির ভাল আছে তো? আপনার, ম্যাডামের...?

বিনয়ের সঙ্গেই দিবাকর বললেন, তা আপনাদের শুভেচ্ছায় চালিয়ে যাচ্ছি... হাঁটাচলা করি দুবেলা...।

দেবতোষ বলেই ফেললেন, তা আপনার সঙ্গে তো দেখা হওয়ার দরকার...জরুরি কথাবার্তা...।

অবশ্যই, অবশ্যই, দিবাকর বললেন। এক কাজ করুন না, আগামী রবিবার ডায়মন্ড হারবার রোডের একটা বাগানবাড়িতে আমাদের একটা

পিকনিক রয়েছে, ম্যাডামকে নিয়ে চলে আসুন... দেখাসাক্ষাৎ-কথাবার্তা-খানাপিনা সবই হবে। অনেক মস্তান লোকজন সব আসছেন... আপনারা বাইরের দেশের মানুষ, আলাপ পরিচয় করবেন।

মোটেও উৎসাহ বোধ করলেন না দেবতোষ, আবার বেয়াই বলে কথা, সঙ্গে সঙ্গে নাকচও করেন কী করে! নিমরাজি হওয়ার মতো বললেন, আচ্ছা, থ্যাংক য়্যু ফর ইনভাইটিং... দেখা যাক। এদিকে কিছু কাজকর্ম রয়েছে ফ্ল্যাটের ব্যাপার নিয়ে, যদি পারি আপনাকে জানাব, সেদিন না হলেও অবশ্য আপনার সঙ্গে বসতে তো হবেই।

তা তো বসবেনই, কিন্তু ওদিনটাই বা বাদ দেবেন কেন?

দেবতোষ আর না বলে পারলেন না, রায়বাবু, বুঝতেই তো পারছেন... দেবমাল্য আর কুন্তলাকে নিয়ে একটা গভীর মনের অশান্তি রয়েছে... আপনারা ধারেকাছে না থাকাতেই হয়তো সিরিয়াসনেস ধরতে পারছেন না। সেইজন্যই আর কি...।

দিবাকর রায়-এর কণ্ঠস্বর হঠাৎই অন্যরকম লেগেছিল দেবতোষের কানে।

ও সবই আমার মাথায় আছে দেববাবু।

দেবতোষ বললেন, তাহলে আর আলাদা করে কী বলব বলুন!

আপনাকে খুব বেশি কিছু বলতে হবে না, খবরাখবর আমি সবই রাখি। একটা লাইন অব সলুশনের কথা ভাবছি...।

তাহলে তো সেটা নিয়েই আমাদের যথাশীঘ্র সম্ভব বসা দরকার।

দিবাকর জিগ্যেস করলেন, কত দিন আছেন আপনারা?

ইচ্ছে তো মাস দুয়েকের মতো... রিটার্ন ডেটটা ওপেন রেখেছি—।

তাহলে তো ঢের সময় রয়েছে কথাবার্তা বলার। ছেলের জন্য আপনি যেমন ভাবছেন, আমাকেও তো মেয়ের দিকটা দেখতে হবে।

দেবতোষ দ্রুত বললেন, না-না, আমি টিপলু-মামণি কারও কথাই আলাদা করে ভাবছি না, এটা ওদের দুজনেরই—।

ঠিক আছে। একটু যেন ধাতস্থ হয়ে দিবাকর বলেছিলেন, সমাধানসূত্র একটা বার করা যাবে, কথাও হবে। তার আগে পিকনিকটাতেও আসুন

না, দেখবেন হয়তো কথায় কথায় ওখানেও... ভি আই পি অনেকেই থাকবেন, আর আপনিও তো আমার পর হয়ে যাননি এখনও।

আজ শুক্রবার। দেবতোষ মনে মনে ভাবলেন, দুদিন পরে পিকনিকটা এড়ানো উচিত হবে কি! অন্তত ঢিলেঢালা পরিবেশে আগে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, কথাবার্তাটাও মনে হচ্ছে দরকার। পাঁচরকম কথা দূর থেকে শুনে হয়তো ওঁরা একটু ক্ষুণ্ণই হয়ে রয়েছেন, হয়তো প্রকৃত পরিস্থিতি আর মামণিকে নিয়ে তাঁদের যে কী জেরবার অবস্থা চলছে, ওঁরা ধারণাই করতে পারছেন না।

উকিল পার্থসারথির দশটার মধ্যে আসার কথা। ফ্ল্যাট সংক্রান্ত কাগজপত্র বেশ কিছু ওর কাছে। রেজিস্ট্রেশনটা কেন আটকে পড়ে আছে, ওর সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না। অথচ এখন সাড়ে দশটা বাজতে চলল, তার পাত্তা নেই। এই যে তাঁর সময়টা নষ্ট হচ্ছে, কে দায়ী হবে তার জন্য! বিরক্তির সঙ্গে কেবলই একটা অসহায়তা আর অবসাদও অনুভূত হচ্ছে এবার দেবতোষের।

হাতের কাজ সারার মতো, দিবাকরকে পিকনিকে যাওয়ার কথাটা বলে দিতে চাইলেন।

রায়বাবু, আপনাদের পিকনিকটা শুরু হচ্ছে কটা থেকে?

দশটা সাড়ে দশটায় কথা আছে। আসছেন তাহলে?

মিসেস বোধহয় পারছেন না, আমি কি আর আপনার কথা ফেলতে পারি! ঠিকানাটা বলুন।

একটা গাড়ি নাহয় পাঠিয়ে দেব, আপনাকে তুলে আনবে। বিলেতের লোক আপনারা, খুঁজেপেতে একা ওসব জায়গায় কি যেতে পারবেন?

জুতসই একটা উত্তর দিতে পারতেন দেবতোষ, যে বিলেতে থাকলেও একা একা অনেক কাজই তাঁদের করতে হয়, আর কলকাতাও তাঁর কাছে এমন কিছু অপরিচিত জায়গা নয়। চেপে গেলেন। বললেন, তার দরকার হবে না, পৌঁছে যাব।

ঠিকানা লিখে নিয়ে আবার বললেন, থ্যাঙ্ক য়্যু। চাঁদাটা তাহলে ওখানে গিয়েই...।

চাঁদা? টেলিফোনেই যেন আকাশ থেকে পড়লেন দিবাকর। বললেন, নাহ মশাই, বিলেতবাসী হয়ে আপনারা আমাদের স্ট্যান্ডার্ডটাই গুলিয়ে ফেলেছেন। শুনুন দেববাবু, যেসব লোকজন সেদিন ওখানে আসছেন কিংবা আমরা যারা যাচ্ছি, তাদের তোয়াজ করার জন্য ওই বাগানবাড়ির মালিক কত দিন তেল মারছে আপনি জানেন!

দেবতোষের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, ওহ্ তাহলে ঠিক পিকনিক না... মানে পার্টির মতো...?

যাকগে, আপনাকে ওসব বুঝতে হবে না। এসে একবার আয়োজনটা দেখুন, তাহলে বুঝবেন। অন্য কথা বলার মতো দিবাকর বললেন, হ্যাঁ ভাল কথা, গতকাল কুন্তলা টেলিফোন করেছিল। খোঁজ করছিল আপনাদের সঙ্গে কথাবার্তা কিছু এগোল কি না।

দেবতোষ বললেন, আপনি বলেছেন তো, এগনো-পিছনোর তো ব্যাপার না, আমরা কথাবার্তা বলব যাতে দুবাড়ি থেকে পারিবারিকভাবে ওদের আর কতটা সাপোর্ট দিতে পারি... সো দ্যাট দে ক্যান অ্যাডজাস্ট বেটার অ্যান্ড...।

দেবতোষের কথার মধ্যে দিবাকর বললেন, অ্যাডজাস্টমেন্টের মানসিকতা ওদের আর আছে বলে তো মনে হচ্ছে না... শুনে আসছি ওদের বনিবনা হচ্ছে না, আপনার ছেলেও তো আর একটা কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে, ওকে তার ওপর পাগলের চিকিৎসা করাচ্ছেন আপনারা... দূর থেকে আমরা সব বুঝে উঠতে পারিনি বটে, তবে আপস-মীমাংসা যদি আপনারা করতে চান—।

না-না-না রায়বাবু, খানিকটা হুতাশের মধ্যে দেবতোষ বলে উঠলেন, এসব তো উলটো লাইনের কথা হয়ে যাচ্ছে, আপনি বোধহয় ঠিকঠাক সব জানেন না কিংবা শোনেননি।

ঠিক আছে থাক। টেলিফোনে এসব আলোচনা করব না। দিবাকর থামিয়ে দিলেন দেবতোষকে। বললেন, পরশু তো দেখা হচ্ছেই, তারপরেও আপনি আছেন বেশ কিছুদিন... ফয়সালা কিছু একটা করা যাবে। আজ ছাড়ি।

অস্বাচ্ছন্দ্যের অনুভূতি নিয়েই টেলিফোন ছাড়লেন দেবতোষ। কিছুটা বিভ্রান্তও যেন। বার দুয়েক অন্তত কথা হল বেয়াই মশায়ের সঙ্গে, অথচ মেয়ের জীবন, ভবিষ্যত নিয়ে ওঁরা যে তেমন উদ্বিগ্ন, তা তো একবারও মনে হল না। এদিকে বললেন খবরাখবর সবই রাখেন। রাখেনই যদি, তাহলে সেই অশান্তি আর দুশ্চিন্তার ছোঁয়া নেই কেন ওঁর কণ্ঠস্বরে! বরং একটা নিশ্চিন্তিরই আভাস যেন গলায়। আবার অভিযোগও জানালেন টিপলুর সম্পর্কে। ওঁরা কি কোনও একটা নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতেই বেশি আগ্রহী তা হলে!

পাঁচরকম ভাবনা ভাবতে ভাবতেই উত্তরমুখী ফালি বারান্দাটায় এসে দাঁড়ালেন দেবতোষ। শীত পড়েছে কলকাতায়। অনেক বছর বিলেতে থেকে কলকাতার শীত তেমন গায়ে লাগে না। কিন্তু টের পান দেবতোষ দু দেশের ঠান্ডার মধ্যেও যেন একটা তফাত আছে। কারণটাও টের পান। দেশে ঠান্ডা পড়লেও রোদ ওঠে, এবং সে রোদে বেশ মিঠে উষ্ণতা মিশে থাকে বলেই অনুভূতিটা অন্যরকম লাগে। ওদেশে ঠান্ডার সঙ্গে বয়ে আসে কনকনে হিমেল হাওয়া, বৃষ্টি। এখানকার উত্তুরে হাওয়ার শুকনো ভাবটাও ইংল্যান্ডে নেই। আজ রোদ উঠলেও কেমন একটা পাঁশুটে ভাব হয়ে রয়েছে, যেন কুয়াশা কেটে ঝলমলে রোদটা ঠিক বেরোয়নি এখনও, অথচ উত্তুরে হাওয়াটা আসছে।

গায়ের চাদরটা জড়াতে গিয়েই, তিনতলা থেকে নীচের দিকে চোখ গেল দেবতোষের। রাস্তার উলটোদিকেই একটা গলি ছেড়ে, ডানদিকে আর একটা ফ্ল্যাটবাড়ি। গেট-এ দারোয়ান-এর সঙ্গে যে ছেলেটা দাঁড়িয়ে গল্প করছে, ওকে কি চেনেন দেবতোষ! কোথায় যেন দেখেছেন দু-একদিনের মধ্যে। গতকাল ব্যাঙ্ক-এ পাশবইটা আপ টু ডেট করাতে গিয়েই কি? এদিকে তাকিয়েই ছেলেটা যেন কী সব জিগ্যেস করছে দারোয়ানকে! কেউ কি ওঁদের ঠিকানা বা খোঁজখবর নিতে পাঠিয়েছে!

ভাবনাটা এগোল না। দেবতোষ দেখতে পেলেন, হাতের ঘড়ি দেখতে দেখতে ব্যস্ততা নিয়ে পার্থসারথি ঢুকছে ওঁদের ফ্ল্যাটের দিকে।

বারান্দা ছেড়ে ভেতরে এলেন দেবতোষ। নির্মলা পুজো করছেন। কাজের মেয়েটি রান্নাঘরে। ওঁকেই দরজা খুলতে হবে।

পার্থ ঢুকেই বলল, একটু দেরি হয়ে গেল স্যার। আনোয়ার শা রোডের যেখানটায় সাউথসিটি হচ্ছে, তার উলটোদিকেই খুঁড়েছে... ওখানেই অটো নামিয়ে দিল। হেঁটে আসতে হল।

আসুন, বলে বসার ঘরের দিকে যেতে যেতে দেবতোষ বললেন, কী চলবে, চা, কফি?

কিছু না স্যার, থ্যাঙ্ক য়ু। পার্থ বলল, আপনার সঙ্গে কথা সেরেই যোধপুর পার্ক-এ এক ক্লায়েন্টের কাছে যাব।

কথা শেষ হতে-না-হতেই পার্থর মোবাইল বাজছে। এক মিনিট স্যার, বলেই বুক পকেট থেকে ছোট্ট মোবাইল বার করে দেখে নিল পার্থ। বন্ধ করে রাখতে রাখতে বলল, ওই ভদ্রলোকই ফোন করেছেন। ঠিক আছে।

দেবতোষ বললেন, বুঝতে পারছি আপনারা সকলেই খুব ব্যস্ত।

ঠিক তা নয় স্যার, পার্থ বলল, এখন কলকাতায় সবার কাছেই মোবাইল, চার্জও নামমাত্র, তাই কিছু মনে হওয়ামাত্র সবাই নম্বর টিপে দেয়।

দেবতোষ সোজাসুজি প্রসঙ্গে ঢোকার জন্য বললেন, কিন্তু আপনার সঙ্গে যে কথা বলব, কাগজপত্র কোথায়? আপনার হাত তো খালি।

সামান্য অবাক হয়ে তাকাল পার্থ। —কোন কাগজপত্র বলুন তো?

এই ফ্ল্যাটের রেজিস্ট্রেশন ফর্ম, কন্ট্র্যাক্ট-এর কাগজ, রিসিট, স্ট্যাম্প পেপার... সব তো আপনার কাছেই রেখে গিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, আপনাদের দলিল বার করা আর মিউটেশনের অ্যাপ্লাই করার জন্যই সব দিয়ে যেতে বলেছিলাম। কিন্তু সে সবই তো গতবার আপনি চলে যাওয়ার কিছুদিন পরে আপনার সম্বন্ধী... মানে রায়সাহেব, সব চেয়ে নিয়েছেন আমার কাছ থেকে!

এবার দেবতোষ অবাক। বললেন, রায়সাহেব... মানে দিবাকরবাবু?

আজ্ঞে হ্যাঁ। পেপারস তো সবই ওঁর কাছে। আমি সেইজন্যই ভাবছিলাম—।

কিন্তু কেন?

পার্থ আমতা আমতা করে বলল, স্যার, সেটা তো আপনিই জানেন বলে আমার ধারণা ছিল। রায়সাহেব বলেছিলেন, আপনারা নাকি কীসব পালটানোর কথাটথা ভেবেছেন, ওনারশিপ চেঞ্জ করবেন, রেজিস্ট্রেশন ফি-এর অ্যামাউন্টও ভ্যারি করবে... আরও কী কী সব..।

মানে? রেজিস্ট্রেশন ফ্রি-এ আড়াই লাখ টাকার সবটাই তো আমি জমা দিয়ে গেছি গত বছর।

সে তো আমি জানি স্যার। কিন্তু কী বললেন... ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের হিসেব গন্ডগোল হয়েছে— আমি পুরো বুঝিনি।

আমাদের তো ব্ল্যাক-এর কোনও ব্যাপার নেই। এদেশে আমাদের কোনও রোজগার নেই, সুতরাং ওদেশের ইনল্যান্ড রেভিনিউ-এর ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রোডিউস করেছিলাম—।

পার্থ মাঝখানেই বলল, রায়সাহেব আর একটা কী বলেছিলেন... আপনাদের সিটিজেনশিপ নিয়ে নাকি কী সব ডিসপিউট অ্যারাইজ করতে পারে... ব্রিটিশ সিটিজেন এদেশে প্রপার্টি রাখতে পারবেন কি না ঠিক নেই।

আরে সেসব তো গভর্নমেন্ট-এর নিয়ম অনুযায়ী প্রথম থেকে আমরা সর্ট আউট করে নিয়েছি। গ্রিন সিগন্যাল না পেলে এত টাকা দিয়ে আমি কি কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনতাম? ডিসপিউট তো কিছু নেই।

আমিও তো তাই জানতাম স্যার। পার্থ বলল, আপনাদের পাসপোর্ট-এর কপি, অ্যাটেস্টেড ফটো... সবই তো ওই প্যাকে ছিল। পরে আপনাদের আর বডিলি প্রেজেন্ট থাকতে হবে না বলেও আমি কোর্ট থেকে পারমিশন করিয়ে রেখেছিলাম।

এগজ্যাক্টলি। তা হলে আর আপনি কাগজপত্র আবার রায়বাবুকে দিতে গেলেন কেন?

তা কী করে হয় স্যার! উনি চাইলে আমি কি না বলতে পারি? উনি আপনার বেয়াই, অত ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোক...ভাবলাম নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে বিলেতে কথাবার্তা হয়েছে। হয়তো কিছু চেঞ্জ-টেঞ্জ করার দরকার। আমরা করতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, ওঁর ক্ষমতা অ্যাপ্লাই

করে ভেতর থেকেই সব পালটাপালটি হয়ে যাবে— আমি তো তাই ভেবেছি।

আমার সঙ্গে একবার যোগাযোগের কথা আপনার মাথায় এল না?

সত্যি মাথায় আসেনি স্যার। ...পার্থ একটু ইতস্তত করে বলল, আপনি এত ওয়ারিডই বা হচ্ছেন কেন? সব তো ওঁর কাছেই রয়েছে, বাইরের লোকের কাছে তো নয়...।

নানান প্রশ্নে-উত্তেজনায়-সংশয়ে মাথা ঝিমঝিম করে উঠলেও, পার্থর সামনে নিজেকে আর বেশি প্রকাশ করলেন না দেবতোষ। মুখ দেখে মনে হচ্ছে ছেলেটা মিথ্যে কথা বলছে না। তা ছাড়া একবার যখন কাগজপত্র সব দিবাকর রায়ের হাতে চলে গেছে, তখন পার্থর নিশ্চয়ই ক্ষমতা নেই আবার সে সব ফিরিয়ে নিয়ে আসার। ভদ্রলোক বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যেই তাঁর ফ্ল্যাটের পেপারস হাতিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু এতদিনের মধ্যে ঘুণাক্ষরেও সে কথা যখন উত্থাপন করেননি, তার মানে উদ্দেশ্যটা খুব সহজ বলে তো মনে হচ্ছে না। হাবিজাবি উলটোপালটা বেশ কিছু বাজে কথাও বলেছেন ওকে বোঝা যাচ্ছে।

একটা শিরশিরে উদ্বেগ ছড়িয়ে যাচ্ছে দেবতোষের স্নায়ুতন্ত্রে। তা সত্ত্বেও কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বললেন, কাগজপত্র নিজের কাছে রাখলেও, আমরা ছাড়া রায়বাবুর পক্ষে কি কোনও পালটাপালটি করা সম্ভব?

পার্থ বলল, সইসাবুদ যা করার আপনাদেরই করতে হবে। তবে আপনারা তো এখানে থাকেন না, রায়সাহেব হয়তো চেঞ্জটেঞ্জগুলো করিয়ে রাখবেন বলেই... সময়টা বাঁচবে। পুলিশের লোক উনি, ছেলেও পার্টির নেতা, প্রচুর ক্ষমতা আর ইনফ্লুয়েন্স ওঁদের।

মনোভাব ব্যক্ত না করার চেষ্টা সত্ত্বেও দেবতোষ বলে ফেললেন, ক্ষমতা আর ইনফ্লুয়েন্সের জন্য শেষে আবার আমাদের ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন নিয়ে গন্ডগোলে না পড়ে যেতে হয়... উলটোপালটা কত রকম লোকেই তো আছে—।

সে কথাটা মিথ্যে বলেননি স্যার। আমাদের এখানে তো সবই হয়, পয়সাকড়ি খাওয়ালে আর সুপারিশের জোরে কাগজপত্র পালটে ফেলা আর এমন কী ব্যাপার! তবে আপনাদের চেঞ্জটেঞ্জগুলো ভেতর থেকে করিয়ে ফেলার অসুবিধে হবে না, রায়সাহেব পাকা লোক। আমিও আপনার প্রোমোটারের সার্টিফিকেট থেকে শুরু করে, কর্পোরেশনের ক্লিয়ারেন্স, ফি জমা দেওয়ার রিসিট, পাসপোর্টের কপি... যা যা রেজিস্ট্রেশনের জন্য লাগে, একেবারে গুছিয়েই ওঁকে দিয়েছি। অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম-এ আপনার আর মিসেস বাগচির সই তো করাই ছিল... দেখুন হয়তো এত দিন...।

আপনার কি মনে হয়, এর মধ্যে রায়বাবু সব কাজ সেরেই ফেলেছেন? ... মানে রেক্টিফিকেশনের পরে...।

ভেতরে লোক থাকলে কী না হয় স্যার! একটু থেমেই পার্থ আবার বলল, আপনি এবার আসার পরে বেয়াইমশায়ের সঙ্গে কি কথা বলেননি একবারও?

দেবতোষ চিন্তাচ্ছন্ন মুখে বললেন, খুবই সামান্য। কী সব পিকনিক-টিকনিক নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

তা তো বটেই, এখনই সিজন কি না। পার্থ উঠে পড়ল। ভরসা দেওয়ার মতো বলল, কিছুদিন তো আছেন... ফ্যামিলির মধ্যে আপনাদের দেখাসাক্ষাৎ হলেই সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। হাত দিয়ে সাফারি স্যুট টানটান করছে পার্থ। আমি তা হলে...।

দেবতোষ তাকালেন। —কিছু বলবেন?

মানে... আমার ওটা তো আর রায়সাহেবের কাছ থেকে... মানে আমি তো আপনার উকিল হিসেবেই সব রেডিটেডি করে দিয়েছি... জমা অবশ্য দিতে পারলাম না—। এখন অসুবিধে থাকলে অবশ্য... থাক।

কত বাকি আছে আপনার?

সামান্যই। বারোশো সামথিং, আপনি বারোশো দিলেই হবে... আমি ইনভয়েসটা পাঠিয়ে দেব।

পাশের ঘরে গিয়ে টাকা নিয়ে এলেন দেবতোষ। পার্থর হাতে দিয়ে

বললেন, রায়বাবুর সঙ্গে কথা বলার সময়ে দরকার হলে আপনাকে পাওয়া যাবে তো?

নিশ্চয়ই স্যার। আবার যোগ করল, উনি ডাকলে আমার না এসে উপায় আছে! আসি স্যার।

নিঃঝুম হয়ে বসে রইলেন দেবতোষ। মেঘলাভাব কেটে গিয়ে রোদ উঠেছে। তা সত্ত্বেও বারান্দার দিক থেকে বয়ে আসা উত্তুরে হাওয়ায় শীত শীত করল। দিবাকর রায় যে কোন দিক থেকে কী মতলব আঁটছেন ভাবতে গিয়ে প্রায় কেঁপে উঠলেন। ওদিকে লন্ডনেও টিপু-কুন্তলা কে কী করছে, দিন দশেক খবর পাননি। ভেবেছিলেন রায়বাবুর সঙ্গে একবার প্রাথমিক কথাবার্তা হওয়ার পরেই টিপলুকে যা জানাবার মনে হবে জানাবেন। কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে, ওঁরা নিশ্চিত কিছু একটা ঘটতে চলেছে ধরে নিয়েই যেন আটঘাট বাঁধতে শুরু করেছেন, বেশ আগে থাকতে। অথচ এ সব কিছুই তো তাঁর মাথায় আসেনি।

আঠারো বছর বিদেশে থেকে, কলকাতা অবশ্যই কিছুটা অপরিচিত শহর দেবতোষের কাছে। ভরসা হয়েছিল কিছুটা প্রতিপত্তিশালী পরিবারে ছেলের বিয়ের পর, হয়তো মফস্‌সলের মানুষ হিসেবে তাঁরও একটু সহজ আর স্বচ্ছন্দ মনে হবে নতুন ফ্ল্যাটে ওঠার পরে। অথচ প্রথমেই ধাক্কা এল অত সাধের পুত্রবধূর দিক থেকে। তবু এত দিন ভেবে এসেছেন সে ধাক্কা সামলে উঠবেন। কিন্তু এবার তো মনে হচ্ছে, ধাক্কা আরও জোরদার হওয়ারই যেন গোপন প্রস্তুতি চলছে! শুধু ছেলেকে নয়, ছেলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও যেন সপরিবার এক গভীর ঘূর্ণির মধ্যে টেনে নামানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। একমাত্র ছেলের বিয়ে দিয়ে এ কোন চক্রের টানাটানিতে পড়ে গেলেন! তাও কোনও বিজন প্রবাসে নয়, খোদ নিজেরই দেশের রাজধানী শহরে।

পুজো সেরে, ধূপকাঠি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন নির্মলা। একটু সুগন্ধের আভাস ছড়িয়ে দেবেন। দেবতোষকে চুপচাপ একা বসে থাকতে দেখে ভুরু কোঁচকালেন।

কী হল, অমন চুপচাপ বসে আছ যে!

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে গেল দেবতোষের। মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না। বললেন, এমনিই।

একেবারেই এমনি? পার্থসারথি এসেছিল তো?

হ্যাঁ... এই তো গেল।

কী বলল? রেজিস্ট্রেশনের কথা হয়েছে?

পার্থর ও ব্যাপারে কিছু করার নেই আর।

তার মানে? ওর কাছেই তো যাবতীয় কাগজপত্র, ডকুমেন্ট...।

সে সমস্তই রায়বাবু ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে নিজের হাতে রেখে দিয়েছেন।

আমাদের সব কাগজপত্র রায়বাবুর কাছে... মানে...!

বিভ্রান্তি, আশঙ্কায় জড়িয়ে গিয়ে এমনই অবাক আর আড়ষ্ট হয়ে গেলেন নির্মলা যে মুখ দিয়ে আর শব্দ বেরুল না।

মনের অস্থিরতা চেপে গুম হয়ে রইলেন দেবতোষও। কোনও দিশা পাচ্ছেন না কী ভাবে উদ্ধার পেতে পারেন এই অবস্থা থেকে। শুধু আন্দাজ করতে পারছেন, ওপর ওপর একটা ছদ্মপরিচয় রেখে, দিবাকর রায় তাঁর পায়ের তলার মাটি সরিয়ে দেওয়ার আয়োজন করেছেন। নিজের কর্মজীবন আর পরিচিতি ভাঙিয়ে এবং একইসঙ্গে দেবতোষের কলকাতার সামাজিক ভূমিকার মূল্যায়ন করে, রীতিমত আটঘাট বেঁধেই তাঁকে বিপদে ফেলেছেন। হয়তো মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় থেকেই একটা সুদূরপ্রসারী ফাঁদ পেতে রেখেছিলেন। মনে মনে খুব সম্ভবত ধরে রেখেছিলেন, কুন্তলার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য তাঁদের আগাম প্রস্তুতির প্রয়োজন।

কার কাছে কোথায় যাবেন, ছুটবেন দেবতোষ! কলকাতায় কে তাঁর পাশে দাঁড়াতে পারেন, উপদেশ দিতে পারেন এই অবস্থায়? না, একেবারে কেউ নেই তাঁর, তা তো নয়! এটা ঠিকই আঠারো বছর ধরে প্রবাসী হয়ে যাওয়া এবং দেশের জল হাওয়া-লোকজন-নিয়মকানুন-

সামাজিকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত না থাকায়, এ দেশ এ শহর আংশিক অপরিচিত এখন তাঁর কাছে। প্রতিবছর যাতায়াত করলেও টের পান, খুব দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে মানুষের ভাবনায়, মূল্যবোধে, সহ্যশক্তিতে। অর্থনীতি-রাজনীতি, পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাসে তফাত হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই ভাল অথবা মন্দ কোনওটাই একতরফা হয়নি, কোথাও একটা ভারসাম্য না থাকলে দেশটা চলছে কী করে!

তাঁরও বোন-ভগ্নিপতি আছে, ভাটপাড়ায় প্রবীর ছাড়াও আরও আত্মীয়স্বজন আছেন, কলকাতাতেও ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব একেবারে নেই তা নয় এবং তাঁরা সকলেই যে অবসরপ্রাপ্ত, অসুস্থ, বৃদ্ধ তা নয়। দিব্যেন্দু ঘোষাল-সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তী-মিহির সেন-সুশান্ত পাল... এঁদের সঙ্গে তো প্রতিবারই দেখা না হলেও কথা হয়। এবং এঁরা সকলেই দিব্যি প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচিত কলকাতাবাসী, অথর্ব-ও হয়ে যাননি। তা হলে একেবারে জলে পড়ে যাওয়ার মতন অসহায়ই বা নিজেকে ভাববেন কেন! সল্টলেক, বেলেঘাটার দিকে নির্মলারও ভাই-বোন, আত্মীয় পরিজন আছে।

মনে মনে টের পান দেবতোষ, আসলে তাঁর বাধছে দুটি ব্যাপারে। সময় এবং রুচিতে।

সময়ের সঙ্গে তবু খানিকটা আপস করতেই পারেন। কিন্তু রুচি-আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে, ঠিক এমন একটা বিষয় বা ঘটনা নিয়ে পরিচিত কারও কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে কি দাঁড়ানো যায়!

তা ছাড়া আদপে সমস্ত পরিস্থিতিটাই যে এখনও অনিশ্চিত, অমীমাংসিত। কুন্তলা হইচই করে, অপমান করে, তাঁদের শাসিয়েছিল ঠিকই ব্যাসিলডন-এর বাড়িতে এসে। কিন্তু সব ব্যাপারটাকেই যে মেয়েটার অসুস্থতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। এখনও তার চিকিৎসাও নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে যায়নি।

টিপলুও কি হাল ছেড়ে দিয়েছে পুরোপুরি?

ছেলেটা ভাঙছে, দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে যে অস্থির অসহায়তায় দীর্ণ হতে হতেই একটা আশ্রয় পেতে চাইছে, রায়বাবুরা কি

যোগাযোগের মাধ্যমে এ খবরটুকু পাচ্ছেন না! কিশলয় কি বাড়িতে জানায় না আসল অবস্থাটা কী? তাঁকে বিপদে ফেলে রায়বাবুরা তুষ্টি অর্জন করতে পারেন, নিজেদের এবং কুন্তলাকেও সুরক্ষিত করছেন বলে ভাবতে পারেন। কিন্তু মেয়েটার জীবন! ভবিষ্যত? ও তো ব্যাধিগ্রস্ত।

কে ভাবছে ওর কথা!

দোলাচলে ভাসতে ভাসতেও একটা সংকল্প করেন দেবতোষ, রবিবারেই রায়বাবুর সঙ্গে কথা বলতে হবে, তাঁকে বোঝাতে হবে।

বিকেলের আগেই টেলিফোন পেলেন দেবতোষ।

বাগচিবাবু, কবে আপনারা দেশে ফিরছেন?

একটু থমকে গেলেন দেবতোষ প্রথমে। বললেন, দেশে...মানে? আপনি কে বলছেন, আমি ঠিক...

আরে দেশে মানে, আপনার দেশ—বিলেতে।

আপনি কে বলছেন সেটা বলবেন তো আগে!

চাপুন তো। স্‌শালা গাছের খাবেন আবার তলারও কুড়োবেন!

এসব কী বলছেন আপনি? এভাবেই বা কথা বলছেন কেন?

এখনও কথা বলছি, এর পর কাজ করব।

মানে?

মানে হাপিস। হাপিস বোঝেন তো? তুলে নিয়ে গিয়ে বানতলার খালে ভাসিয়ে দোব।

কী বলছেন উলটোপালটা? কে, কাকে ভাসাবে?

ন্যাকামি হচ্ছে বোকা—? শুনে রাখুন, কাল শনিবার দুপুরে ফাঁড়ির আগের পেট্রল পাম্প-এর কাছে দশহাজার ক্যাশ নিয়ে চলে আসবেন। যে ভিখিরিটা যাবে, হাতে মাল দিয়ে দেবেন। চুপচাপ।

হোয়াট ইজ দিস? আপনি আমাকে—।

আস্তে স্যার, আস্তে। যা বললাম যেন মনে থাকে। মাল না দিলে কিন্তু প্রথমে বুড়িটা গাড়ি চাপা পড়বে... সাঁইবাবার ভজন করতে যায় তো!

শাট আপ, আপনি ভেবেছেনটা কী? আমি নতুন কলকাতায়? জানেন...!

মুখ বন্ধ কর খানকির ছেলে! আগে কাল টাকা দিবি। পুলিশ কিংবা কাউকে জানালে কিন্তু কাল সন্ধেয় ফ্ল্যাটে হামলা হবে। একটু মানিয়ে নিন স্যার, যে কটাদিন কলকাতায় আছেন। শুধুমুধু বেড়াতে এসে জান খুইয়ে লাভ আছে? দুপুর দুটো, পেট্রোল পাম্প।

খুট করে লাইনটা কেটে গেল। দ্রুত অভ্যস্ত হাতে ওয়ান-ফোর-সেভেন-ওয়ান ডায়াল করলেন দেবতোষ। কুঁ-কুঁ-কুঁ...।

নাহ ঠিকই তো... এখানে তো সেই সিস্টেম নেই। রিসিভার রেখেই টের পেলেন মৃদু কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়েছে সারা শরীরে। হাত-পা-মাথা কিছুই যেন নিজের বশে নেই। ধুপ করে পাশের সোফাটায় বসে পড়লেন দেবতোষ। ভাষাগুলো কানে বাজছে।

৯

কুন্তলা চলে গেছে।

দুর্বলতা, কিছুটা দুর্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই প্রথম নিবিড় স্বস্তি অনুভূত হল দেবমাল্যর। বিলারিকের ফ্ল্যাটে ও একা, অনুভূতিটাও নতুন, তবু ধারাবাহিক অনিশ্চয়তা আর আশঙ্কার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে, বেশ কদিন পরে এবার টের পেল, এই নির্জনতা আর শান্তিটুকুর জন্য ও হা-পিত্যেশ করে বসে ছিল কত দিন! চারদিকে জিনিসপত্র ছড়ানো, কিছু ভাঙাচোরা, বিছানার চাদর ছেঁড়া, বালিশ ফুটো, কিচেনে ডাঁই করা প্লেট-বাসন, পোড়া টোস্ট-এর গন্ধ, ফ্রিজের ডালা খোলা, উলটে রয়েছে জলের জাগ, ফ্রুটজুস-এর ক্যান... ঘরে আলমারির পাল্লা হাট, হ্যাঙার ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে মেঝেয়, বিছানায়, কার্পেটে ওয়াইনের ছোপ। একমাত্র কোণের দিকে রাখা কম্পিউটার আর প্রিন্টারটা অক্ষত। ওটাও কুন্তলা ভেঙে দিয়ে যেতে পারত, যেভাবে আছড়ে ভেঙেছে ওদের এবং বাবা-মা-এর তিন-চারটে ফটোফ্রেম। ছবিগুলো মাটিতে ফেলে পা দিয়ে দলেছে যাওয়ার আগে।

এই বিধ্বস্ত ফ্ল্যাটের মধ্যেও যে এমন নিরবচ্ছিন্ন শান্ত পরিবেশ ছিল দেবমাল্য বোঝেনি কত দিন! গভীর নৈঃশব্দ্যও যে এত প্রিয়, এমন আরামের হতে পারে জানা ছিল না। হ্যাঁ, কিছু শব্দ এখনও আছে। চিনচিন শব্দে রেডিয়েটর চলছে ঘরে উষ্ণতা ছড়াতে, ঘড়ির কাঁটা সরে যাচ্ছে টিকটিক শব্দে, ব্লপ ব্লপ জলের ফোঁটা পড়ছে শাওয়ার থেকে বাথটাব-এর মধ্যে। কুন্তলা স্নান সেরেছে। জিনিসপত্র তছনছ করে, ঘর ভেঙে বেরিয়ে গেছে ও, কিন্তু নিজেকে সাজিয়ে নিতে ভোলেনি, গুছিয়েও নিয়েছে।

অফিস নেই দেবমাল্যর। ক্রিসমাস-এর ছুটি এবার চার দিন। শনি-রবি পড়েছে পঁচিশ আর ছাব্বিশ, সোম-মঙ্গল দুদিন সাতাশ আর আটাশে ডিসেম্বর লিউ ডে পেয়েছে ক্রিসমাস আর বক্সিং ডে-র জন্য। ছুটির প্রথম দিন আজ। এ বছর হোয়াইট ক্রিসমাস হয়নি। অল্পস্বল্প তুষারপাত হয়েছিল কদিন আগে, ইতস্তত চুন ছড়িয়ে দেওয়ার মতো সাদা সাদা বরফ জমেছিল বাগানে-পার্কে সবুজ ঘাসের ওপর, কোনও কোনও বাড়ির ঢালু ছাদে, কার্নিশে অলিন্দে। এখন সব গলে গিয়ে ভিজে ভিজে ভাব। ঠান্ডার কনকনানি অবশ্য কম না, হালকা হিমেল বাতাসেও মিশে রয়েছে অদৃশ্য বরফের অস্তিত্ব। ঘুম না ভাঙা মেঘলা মেদুর দিন, চুপচাপ, শুনশান এখন। নির্জনতার মধ্যে চলছে পারিবারিক মিলনোৎসব। টুপটাপ রঙিন আলো জ্বলছে কোনও বাড়ির জানালায়, দেয়ালে বাগানের গাছেও, আবছা আঁধার মোড়া দিন বলেই হয়তো। কখনও গাড়ির দরজা বন্ধ করার ঝুপ শব্দ, হাসির শব্দ কিংবা বাচ্চাদের সরু গলা ভেসে আসছে। কখনও শুধুই পায়ের আওয়াজ কিংবা হাওয়ায় ভাসা সরসর শব্দ।

কথাটা সূক্ষ্মভাবে একবার মাথায় এল দেবমাল্যর, নির্জন তবু সুখী মিলনোৎসবের এমন দিনের একাকিত্বও কি উপভোগ্য হতে পারে কখনও! হয়তো জীবনে এই প্রথমবার, তবু ও কি এতখানিই অভাগা যে...। ভাবনাটাকে আমল দিল না।

বিগত কয়েক দিন ধরে দেখা, সহ্য করা কুন্তলার মুখ, আচরণ মনে আসাতেই সিঁটিয়ে যাচ্ছে দেবমাল্য।

ঘর পুড়েছে ওর। পুড়ুক। এখনই আর আলো চায় না, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। একটু একা থাকতে চায় দেবমাল্য। এই দেহ মন প্রাণ এক করে আবার নিজের অস্তিত্বটুকু অনুভব করতে চায়। কত দিনের টানা বজ্রবিদ্যুৎ, ঘূর্ণিঝড়ের পরে ও বুঝি জীবন ফিরে পাওয়া একজন। বিষণ্ণ উদাস, বিপর্যয়ের পরেও টিকে থাকা নিঃসঙ্গ একক, তবু দু চোখে আলো ফোটে, বুকে বাতাস ঢোকে, প্রকৃতিও ডাকে।

ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট-এ কুন্তলার হয়ে আবেদন করেছিল ওর সলিসিটর। দুজন এসকর্ট এসেছিল ঠিক সকাল দশটায়। কুন্তলাকে উদ্ধার করে (সত্যি সত্যি উদ্ধারই কি করতে হল ওকে!) ওরা নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে ওর আপাতত গোপন আস্তানায়। যুবক ছেলে দুটো যেন তৈরি হয়েই এসেছিল কোনও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য। কোর্ট অর্ডার ছিল ওদের কাছে। কিন্তু ছেলে দুটোর মুখের হাবভাব যেন একটু একটু করে পালটে গেল ফ্ল্যাটে আসার পরে। কুন্তলা প্রায় মালবাহকেরই কাজ করাল এসকর্ট দুজনকে দিয়ে। নিজের টুকিটাকি গোছগাছের সময় ওদের দাঁড় করিয়ে রাখল দরজার বাইরে, চা কফিও অফার করল না। বিস্ফারিত চোখে সাহেব ছেলে দুটো যেন দেখছিল ঘরদোরের অবস্থা। ওরা হয়তো অনেক ভাঙাভাঙি দেখে অভ্যস্ত, কিন্তু এমনটা কি দেখেছে আগে!

দেবমাল্যকেও কী ভাবছিল ওরা! নিপাট ভালমানুষের চেহারায় এক অত্যাচারী হৃদয়হীন শয়তান?

বিন্দুমাত্র শব্দ করেনি দেবমাল্য। চেয়ার ছেড়ে ওঠেনি। ক্লান্ত চোখে শুধু তাকিয়েছিল। পরিপাটি করে নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে কুন্তলা টেবিলের ওপর রেখে গিয়েছিল সলিসিটরের চিঠি, স্টেটমেন্ট অব এভিডেন্স-এর কপি। ছেলে দুটোকে ভেতরে ডেকেছিল। আর বেরুনোর আগেই জুতো দিয়ে ফটোগুলো পিষে মাড়িয়ে যাওয়ার সময়ই, একটা ছেলে দ্রুত নিচু হয়ে ওগুলো সরাতে গিয়েছিল; ভেবেছিল বোধহয় কুন্তলা না দেখে বা ভুল করে ওগুলো মাড়িয়ে

ফেলেছে। কুন্তলা হাত দেখিয়ে নিরস্ত করেছিল ছেলেটাকে। সেই মুহূর্তেই একবার ছেলেটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল দেবমাল্যর! সাহেবের চোখে ছিল অপার বিস্ময়।

দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিল দেবমাল্য ওরা চলে যাওয়ার পরেই। আস্তে, নিঃশব্দে।

ঘৃণা-ক্রোধ বা আর মুখদর্শন কবতে না-চাওয়া শত্রুর পিছনে দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল সেভাবে নয়। কিছুটা যেন ভয়ে, নিজের ফ্ল্যাট আর নিজেকে লুকোতে, আশঙ্কায়, সংকোচে।দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ, সূক্ষ্ম-ধারালো কাঁটাটাও খোঁচাখুঁচি করল বুকের মধ্যে, কিছু যেন উড়ে এসে পড়ল একসঙ্গে দু চোখে—চিরক্রুদ্ধ, অসূয়াগ্রস্ত, আত্মসর্বস্ব, হঠকারিণী মেয়েটা কি জানে, কোন অতলের আহ্বানে জীবন ওকে ডেকে নিয়ে গেল কিংবা যাবে এর পর! ও যে জানে না, ওর বিশ্বাস নেই, ওর নির্ভরতা নেই, এই বিদেশবিভুঁই-এর...।

না-না-না। দুই মুঠি এক করে কপালে *ঠেকিয়েছিল* দেবমাল্য, ভাবনার শেষ হোক ওর নিজের, বাঁচতে হবে দেবমাল্য বাগচিকে। বাঁচতে গিয়ে ধিকৃত, অপমানিত, এমনকী মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার মতো হৃদয়বান ও হতে পারবে না, চায় না। যতটা চেয়েছিল, যতটা পেরেছিল,তাও করেছিল নিজেকে নিংড়ে, অতিক্রম করে, বাবা-মার কথা ভেবে। শ্বাস পড়ে গেল, কুন্তলার কথা ভেবেও কি নয়?

আলতো করে ফ্রিজের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এল দেবমাল্য। মৃদু শব্দ করে মেশিনটা কাজ করতে শুরু করল। এখন আর কিছুই ও করতে পারবে না।

নীরব ধকলের পরে এই মুহূর্তে যে স্বস্তি, জোর করে মনের মধ্যে সেটাকে ধরে রেখেই শরীরটা বিছানায় টেনে নিয়ে গেল। যেন ঢিলে আর অবশ হয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। আহ কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছে।

বাবা-মা কলকাতায় গেছে আজ দশ-বারো দিন। পৌঁছানো সংবাদের পরে আর টেলিফোন করা হয়নি। ওঁরাও করেননি। নিশ্চয়ই দেবতোষ

কুন্তলাদের বাড়িতে যাবেন, ওঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। বিচ্ছেদ-ভাঙাভাঙি ঠেকানোর জন্য পারিবারিক উদ্যোগে একবার চেষ্টা অন্তত করা হবে। তাই কথা ছিল। কিন্তু এখন কি আর সেই চেষ্টা করে লাভ আছে!

একটা ব্যাপার টের পাচ্ছিল দেবমাল্য। অনেক কিছুই কুন্তলা নিজের বুদ্ধিতে করছিল না। কেউ ওকে পরামর্শ দিচ্ছিল, এদেশের ডিভোর্সের আইনকানুন বিষয়ে প্রাথমিক খবরাখবর দিচ্ছিল, আর সচেতন করে তুলছিল ওর প্রাপ্তিযোগ সম্বন্ধে। এদেশে ওকে সেরকম উপদেশ-নির্দেশ দেওয়ার লোক একজনই। কিশলয়। হয়তো কলকাতার বাড়ি থেকেও কেউ কেউ ওকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। যখন-তখন কুন্তলা যে কলকাতায় টেলিফোন করে কথা বলে, সেটা বিল দেখেই দেবমাল্য বুঝতে পারে।

আসলে কুন্তলাদের বাড়ির লোকদের অবস্থাটা 'চোরের মায়ের বড় গলা'র মতন ও জানে। ওঁরা ধরে নিয়েছেন কুন্তলা-দেবমাল্যর সম্পর্কের পরিণতি অনিবার্য ভাঙন। সুতরাং অন্য আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামানোর আগেই ওঁরা আর্থিক দিক দিয়ে ওকে সুরক্ষিত করার কথাটাই ভেবেছেন এবং সেটাও নিজেদের বাঁচানোর স্বার্থে।

কুন্তলার মানসিক বৈকল্য নিয়ে ওঁদের পরিষ্কার ধারণা আছে। এরপর বিবাহবিচ্ছিন্না হলেও, অর্থ কোনও সমস্যা নয়, এই নিশ্চিন্তিটুকু পেলেই সম্ভবত ওঁরা বাড়ির মেয়েটি সম্পর্কে হাত ধুয়ে ফেলতে পারেন।

নিজেদের পরিবারের একজন সদস্য সম্পর্কে মানুষ কি এতখানি হৃদয়হীন, স্বার্থকেন্দ্রিক হতে পারে!

অথচ কুন্তলাকে সেটা বোঝাতে গেলেও যে, ও আরও বেপরোয়া দুর্বিনীত হয়ে উঠছে।

ওভারডোজ নিয়ে হাসপাতালে কুন্তলা ভর্তি হওয়ার পরের দিন বিকেলে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল দেবমাল্য। অফিসে যায়নি। একবার শেষ চেষ্টার মতো ওকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল। বলার চেষ্টা করেছিল, যা যা ও ভাবছে সেগুলো ভিত্তিহীন এবং যাদের পরামর্শে যে

সব সিদ্ধান্ত ও নিচ্ছে বা নিতে চেষ্টা করছে, সেগুলো ওকে বাঁচাবে না, ভবিষ্যৎকেও সুরক্ষিত করবে না।

দুজনের জন্য কফির মগ নিয়ে শোওয়ার ঘরে এসে বসেছিল দেবমাল্য। বিছানার ওপর কুন্তলা। ওর হাতে কফির মগ দিয়ে সোজাসুজি প্রসঙ্গে ঢুকেছিল দেবমাল্য :

কুন্তলা তোমাকে আমার কিছু কথা জিগ্যেস করার আছে আর সিরিয়াসলি কিছু বলারও আছে।

বড় চোখ তুলে একবার তাকাল কুন্তলা। চেহারায়, চোখেমুখে ওর ক্লান্তি নেই। বসার ভঙ্গিতেও নেই আড়ষ্টতা। কৃতকর্মের জন্যও কোনও সংকোচ কিংবা দেবমাল্যর ওপর দিয়ে গতকাল থেকে যে ধকল গেছে তার জন্য অনুশোচনা আছে বলেও মনে হল না। কিন্তু মানসিকভাবে ও যে সজাগ বোঝা গেল উত্তর শুনে। কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, তোমার যা জিগ্যেস করার করতেই পারো, উত্তর দেওয়া না-দেওয়াটা আমার ব্যাপার।

বেশ, বলে দেবমাল্য জিজ্ঞেস করল, কালকে তুমি যে কাণ্ডটা করলে, তার এফেক্ট বা ইমপ্যাক্ট কী আর কতখানি তুমি জানো?

কিছুই না। আয়াম অলরাইট।

শুধু তোমার কথা না। অন্যদের ওপরেও এই ঘটনার রিয়্যাকশন...?

অন্য কে? তোমার গার্লফ্রেন্ড, তৃষা?

সত্যি সত্যি অসহায় বোধ করল দেবমাল্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোনও উত্তর দিল না। সামান্য একটু ভাবল। কফির মগে চুমুক দিয়ে বলল, তৃষা ইজ নট মাই গার্লফ্রেন্ড।

হু কেয়ারস? হলেই বা আমার কী যায়-আসে?

দেবমাল্য ঠান্ডা গলায় বলল, যায়-আসে তো বটেই। কিন্তু সেটা কথা নয়। তুমি কি জানো গার্লফ্রেন্ড কাকে বলে?

অফকোর্স জানি। যাকে নিয়ে বিছানায় শোওয়া যায়... অথচ বিয়ে করতে হয় না।

তোমার কি সত্যিই ধারণা তৃষার সঙ্গে আমার সেরকম সম্পর্ক?

তলে তলে কী ঘটছে আমি জানব কী করে? ...নয়তো আমার মনে হবে কেন?

তোমার বিশ্বাস থেকে, তোমার কনফিডেন্স থেকে তুমি কি কিছু বুঝতে পার না?

ও সব তো থিয়োরিটিক্যাল কথা। লুকিয়ে-চুরিয়ে তুমি কী করছ কে দেখতে যাচ্ছে? ও-ই বা আমেরিকা ছেড়ে এ দেশে এসে বসে আছে কেন?

সেটা আমার ভাবনার বিষয় কি?

ওইটাই তো মজা। ফুর্তিফার্তা হচ্ছে, আবার বিয়ে করা বউ-এর মতন দায় ঘাড়ে নেই। ভাবনা ভাবতে হবে কেন?

হাসির মতো শব্দ বেরিয়ে পড়ল দেবমাল্যর মুখ দিয়ে। বলল, তুমি কি আমার দায়?

সামান্য থতমত খেল কুন্তলা। কিছু না ভাবার মতো তারপর বলল, দায়ই তো। না হলে চিকিৎসা, থেরাপি করাতে হচ্ছে কেন?

লিসন কেয়ারফুলি কুন্তলা, দেবমাল্য বলেই ফেলল, ওয়াইফের কোনও অসুখ করলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা তো হাজব্যান্ডের ডিউটি। সেটা দায় হতে যাবে কেন?

কিন্তু আমার তো কোনও অসুখ করেনি, আয়াম ফাইন। তা সত্ত্বেও আমাকে...

দেবমাল্য বলল, আমি জানি তোমার কোনও অসুখ করেনি। কিন্তু মনের মধ্যে তুমি একটা অসুখ পুষে রেখেছ দীর্ঘদিন ধরে, পসিবলি ফ্রম ইওর চাইল্ডহুড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্স।

খুব সহজভাবে কুন্তলা বলে দিল, ঠিক আছে। তোমার সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধু তাহলে সারাক সেটা।

সারানোটা তখনই সম্ভব, যখন রুগি সত্যি সত্যি সেরে উঠতে চায়। তাকে কো-অপারেট করতে হয়। কিন্তু তুমি সেটা করছ না।

এটা কি তোমার বন্ধুর কমপ্লেইন্ট?

না, মানস তোমার প্রতি খুবই সিমপ্যাথেটিক।

সিমপ্যাথেটিক? আমি ওর সিমপ্যাথি চাই কে বলল? ইন ফ্যাক্ট আমি কারও সিমপ্যাথি চাই না।

একটু সময় নিল দেবমাল্য। ভাল করে নিরীক্ষণ করল কুন্তলাকে। বলল, তুমি কি জানো, তোমার পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার আছে, অ্যান্ড ইটস অ্যান ইলনেস, ইট রিকোয়ারস ট্রিটমেন্ট?

কুন্তলা বলল, জানি। কিন্তু আয়াম নট রেসপনসিবল ফর মাই ইলনেস। অ্যাম আই?

মে বি নট। কিন্তু চিকিৎসাটা কনটিনিউ করা তোমার রেসপনসিবিলিটি। তোমায় সেরে উঠতে হবে।

ভেবে দেখব।

দেবমাল্য জোর দিয়ে বলল, ভেবেটেবে দেখার কোনও সুযোগ নেই কুন্তলা। অনেক আগেই তোমার চিকিৎসা করানো উচিত ছিল। আমাদের বিয়ের আগে এসব কিছুই আমাদের জানানো হয়নি।

এখন তোমরা ফেঁসে গেছ তো? আই ডোন্ট কেয়ার। আমাদের ডিভোর্স হয়ে যাওয়া উচিত। আয়াম ফেড আপ।

অবাক চোখে তাকাল দেবমাল্য। বলল, আমি কিংবা বাবা-মা কেউ সেভাবে ভাবিনি। কিন্তু তোমাদের বাড়ি থেকে সচেষ্ট হওয়া উচিত ছিল অনেক আগেই। এটুকুই বলার।

আমার বাড়িকে ক্রিটিসাইজ করবে না! কফির মগে চুমুক দিয়ে একসঙ্গে অনেকটা গিলে ফেলল কুন্তলা। গম্ভীর হয়ে বলল, এখন আমি তোমার ওয়াইফ, তুমি তোমার ডিউটি করবে।

একটু চুপ করে থেকে দেবমাল্য বলল, ওকে। কিন্তু তোমাকে আমার কয়েকটা কথা শুনে চলতে হবে। তুমি আমাদের সম্পর্ক নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করবে না। বাবা-মাকে যা ইচ্ছে তাই গিয়ে বলে আসবে না। ডিভোর্সের কথা মাথা থেকে তাড়াও, সলিসিটরের কাছে যাওয়া বন্ধ করো।

কয়েক মুহূর্ত গুম হয়ে রইল কুন্তলা। তারপর বলল, তুমি আমায় থ্রেট করছ এবং আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছ।

তোমার যা ইচ্ছে ভাবতে পারো কুন্তলা। দেবমাল্য বলল, কিন্তু আমাদের ডিভোর্সের পরিণামটা কী, তুমি ভাবতে পারো?

হলে তখন ভাবব।

না, তখন আর ভাববার কিছু থাকবে না। দ্যাট উড বি আ ডিজাস্টার। অনেক কিছু তুমি জান না। যারা বা যে তোমাকে ওশকাচ্ছে, পরামর্শ দিচ্ছে, তোমার সিকিউরিটির কথা বোঝাচ্ছে, তারাও সব জানে না।

কিছুক্ষণ দুজনের কেউ কোনও কথা বলল না। মনে মনে হাতড়াল দেবমাল্য, আর কী জিগ্যেস করা যায় কিংবা বলা যায় কুন্তলাকে।

হঠাৎ জিগ্যেস করল, তুমি ওভারডোজ, হাতে স্ক্র্যাচ— এসব করেছিলে কেন? কী লাভ হল তাতে?

একটু ভেবে নিয়ে এবার কুন্তলা বলল, ফ্রাস্ট্রেশন থেকে প্রতিবাদ করেছিলাম। অল্প হলেও তার যে ইমপ্যাক্ট হয়েছে, সে কথা তুমিই তো বললে। এবার থেকে নিশ্চয়ই সমঝে যাবে।

হতাশভাবে শ্বাস ফেলল দেবমাল্য। তারপর বলল, ইমপ্যাক্ট যা হওয়ার, হয়েছে আমার মা-বাবার ওপর। তোমার কোনও ধারণা নেই যে ওঁরা কতখানি কষ্ট পেয়েছেন এবং কী যন্ত্রণার মধ্যে আছেন।

দেবমাল্যর মুখের দিকে চুপ করে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কুন্তলা। তারপর বলল, য়্যু আর হ্যান্ডসাম কিন্তু তোমার কোনও পার্সোনালিটি নেই।

অ্যাট লিস্ট পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার নেই, সেটা আমি জানি। এনিওয়ে... দেবমাল্য বলল, একটা কথা তোমার সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত। দু বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে। আমি তার আগের কথা নিয়ে, ভুলভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু এই দু বছরে আমাদের সম্পর্ক যেদিকে, যেভাবে চলেছে, সেটা আর চলতে দেওয়া যায় না।

ব্যাস আর কথা কী? কুন্তলা বলল, তার মানেই তো ডিভোর্স ফাইল করা। আমি অলরেডি...।

না কুন্তলা, তার মানেই ডিভোর্স ফাইল করা নয়। ডিভোর্স হচ্ছে শেষ পন্থা।

আমরা তো সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। তোমার আমার মিল হচ্ছে না সবাই জানে, আমার সাইকিয়াট্রিক ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, তোমার বাবা-মা হ্যাপি নয়, আমিও ওদের পছন্দ করি না, তোমারও অন্য একটা... পরিষ্কার কথাটা তুমি আর কী বলবে! এখন হিসেবনিকেশ দরকার।

নাহ আর কিছুই বোধহয় বলতে পারবে না দেবমাল্য। চুপ করে বসে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথা বলতে বলতেই ওর মনে হচ্ছিল, মাঝে মাঝে কুন্তলা একটু সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠলেও, ওর অধিকাংশ যুক্তি আর কথার মধ্যে যেন কোনও সামঞ্জস্য নেই। ও নিজে যেটাকে ঠিক বলে ভাবছে, সেটা যে ঠিক নাও হতে পারে, এ বোধটা ওর নেই। হয়তো কোনও সময় ওর মনে হবে, যা কিছু এখন ধরে নিচ্ছে বা নিয়েছে, তা ঠিক নয়! কিন্তু তখন কি আর শোধরানোর উপায় থাকবে!

চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে কাচের জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিল দেবমাল্য।

কনকনে ঠান্ডা আর কালো আকাশের নীচে আসন্ন ক্রিসমাসের ঝলমলে শহরতলি নিথর দাঁড়িয়েছিল বাইরে! রাস্তা দেখা যায় না এই ফ্ল্যাটবাড়ির ওপর থেকে, শুধু সার সার ভেপারল্যাম্প-এর আলোগুলো চড়াই-উৎরাই ভেঙে মিশে গেছে দূর থেকে দূরান্তরে। নির্জন দেশটাকে নির্জনতর মনে হচ্ছিল দেবমাল্যর। একই সঙ্গে মৃদু অস্থিরতার কাঁপুনি টের পাচ্ছিল নিজের মধ্যে। কোথায়, কোন দুর্গম, জটিল জীবনের পথে ছুটে চলেছে দেবমাল্য! এর শেষই বা কোথায়!

জানালা থেকে সরে এসে ও বলেছিল, তুমি যা ভাল বোঝো তাই করো কুন্তলা, আমার তোমায় আর কিছু বলারনেই।

কী ভেবেছিল কুন্তলা ও-ই জানে। কিন্তু দেবমাল্য খেয়াল করল দুদিন পর থেকে ও নিজেই উৎসাহ নিয়ে মানসের কাছে যাতায়াত শুরু করেছে। কিন্তু কদিনের জন্য!

এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই অফিসের ঠিকানায় কুন্তলার পক্ষে

সলিসিটরের চিঠি পেয়ে আকাশ থেকে পড়েছিল দেবমাল্য। বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত।

তোমার ওয়াইফ তোমার এবং তোমাদের ফ্যামিলির বিরুদ্ধে তার প্রতি ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল টর্চারের অভিযোগ নিয়ে এসেছে। কোর্ট প্রসিডিং-এর পূর্বে তুমি কিংবা তোমার সলিসিটর এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং/অথবা তোমাদের বক্তব্য জানাতে পারো।

রাগ নয়, ক্ষোভ নয়, এমনকী অপমানও বোধ করেনি দেবমাল্য।

নিদারুণ হতাশায় ভাঙতে ভাঙতে যেন নিজের জীবনের ওপরেই ঘেন্না ধরে যাচ্ছিল দেবমাল্যর। বাবা-মাকে কিছুই বলেনি। কিন্তু মানসকে খুলে বলেছিল সবকিছু। কীভাবে মনে হয়েছিল, নিজেকে বাঁচানোর জন্যই এবার ওর একটা আশ্রয় দরকার। ভাঙন ধেয়ে আসছে ওকে লক্ষ করে। অবুঝ অবাধ অথচ হিংস্র আক্রমণের মতোই সে ভাঙন এবার ওকে ভাসিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে উদ্যত।

কিন্তু কোথায় আশ্রয়?

কী একটা শব্দ হতেই ঝিমুনির ঘোর কেটে গেল দেবমাল্যর। প্যাসেজের দিকে তাকিয়ে দেখল। লেটার-হোল দিয়ে কেউ একটা কাগজ ফেলে গেছে, বোধহয় ফ্ল্যাট সংক্রান্ত কিছু হবে। গা করল না, যেমন পড়ে ছিল অগোছালো বিছানায়, তেমনই পড়ে রইল। নাহ, এবার আর তলিয়ে যেতে পারছে না। বরং সকাল থেকে ঘটতে থাকা বিভীষিকাময় ঘটনাগুলোর স্মৃতি ওকে জাগিয়ে রাখছে।

কার বিরুদ্ধে এত রাগ কুন্তলার? কীসের বিরুদ্ধে, কার ওপর?

দেবমাল্যর ওপরেই কি? দেবতোষ কিংবা নির্মলার ওপর? নাকি ওর নিজের ওপরেই? তৃষার নামই বা ও বলে কেন!

কিছু কথা মানস বলেছিল, কিন্তু শোনার বা মন দিয়ে শোনার মতন মানসিকতা ছিল না তখন দেবমাল্যর। হয়তো সাইকিয়াট্রিস্ট বলেই তা বুঝতেও পেরেছিল। সময় নিয়ে যেতে বলেছে এক দিন। কী হবে আর গিয়ে? যত দিন ওকে সারিয়ে তোলার কথা ভেবেছিল, আগ্রহটা অদম্য ছিল তখন। তার পরেও কৌতূহলটা বাঁচিয়ে রেখেছিল—

আপাতসুস্থ, শারীরিকভাবে স্বাভাবিক একটা মেয়ের ভাবনায় মননে এমন কী ঘটতে পারে যে, তার নিত্য নিয়মিত জীবনযাপনের সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল ভাবেই আর একটা ক্রুদ্ধ সহ্যশক্তিহীন অনিয়মিত অসূয়াগ্রস্ত মানসিকতার মানুষ দিনরাত বিরাজ করছে! আর এমনভাবেই, যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার প্রকাশ বিস্ফোরণের চেহারা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাদের ওপরেই, যারা ওকে রক্ষা করতে চাইছে। এ কী দুরন্ত গোপন সুপ্ত মনের ব্যাধি! কোথায়, কোন কোষ বা স্নায়ুতন্ত্রের তন্তুজালে জড়িয়ে থাকে!

যত দূর জানে দেবমাল্য, অধিকাংশ মনের অসুখকেই সাম্প্রতিক কালে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট এলাকার কোষের বিভাজন, বিভিন্ন এনজাইমের ওঠানামা, ডি এন এ পদ্ধতির কার্যকারিতা ইত্যাদির সাহায্যে ব্যাখ্যা এবং চিকিৎসার চেষ্টা হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও শারীরিক অসুস্থতা, স্নায়ুতন্ত্রের গন্ডগোলও মনের অসুখের জন্য দায়ি, যার থেকে প্রভাবিত হতে পারে আচরণ, ভাবনা, আবেগ, উদ্বেগ। অথচ 'বর্ডারলাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার' নামের এই বিধ্বংসী অসুস্থতার যে তেমন কোনও ব্যাখ্যাও নেই। যা আছে, সবটাই কোনও নিবিড়, অপরিণত কিংবা অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়া— কোনও ঘটনা-দৃশ্য-সুপ্ত আঘাত, পারিপার্শ্বিকের অবুঝ চাপ বা প্রভাব থেকে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা, জমে যাওয়া, জমে থাকা অব্যক্ত উপলব্ধি— একটা সময়ের পরে যার অসহিষ্ণু বহিঃপ্রকাশ ছারখার করে দিতে পারে সম্পর্ক-সংসার-জীবন।

তবু তো কৌতূহলটা ধরে রেখেছিল দেবমাল্য। জ্ঞান আহরণের জন্য তো নয়, বাঁচার জন্য, বাঁচাবার জন্যও। ভালবাসেনি কি কুন্তলাকে? সহানুভূতি-দায়িত্ব-যৌনতা-সংস্কার— সব কিছু ছাড়াও ব্যাখ্যার অতীত কোনও একটা অনুভবের হাত কি মনুষ্য-সম্পর্কের আলোয় উদ্ভাসিত কোনও আকাশের পূর্ণতাকে ছুঁতে চায়নি! কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মতোই সাইকোথেরাপির হাজারটা পদ্ধতি আর প্রয়োগে সারিয়ে তোলা যেত কুন্তলাকে। হয়তো জীবনযাপনের পদ্ধতিও সাহায্য করত, ও

অন্তঃসত্ত্বাও হতে পারত, আর সব কিছুর সঙ্গে সময়েরও প্রভাব থাকতই...।

পায়ে দলে, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে মেয়েটা চলে গেল!

সবই কি শেষ হয়ে গেল? যায়? কিছুই কি অবশিষ্ট থাকে না? এখনও নেই?

যদি না-ই থাকে, তাহলে দেবমাল্য উঠছে কেন? অক্ষত টেলিফোনটাকেই বা-টানছে কেন? একটা খোঁজ নিতে হবে না... ও কোথায় গেল!

কিশলয়ই ধরেছে ফোনটা।

আমি দেবমাল্য বলছি।

জানি। বলো!

কুন্তলা আজ সকালে চলে গেছে। কিন্তু...।

তাও জানি।

ও কোথায় গ্যাছে,কিংবা আপনার ওখানেই কি না...খবরটা...।

তা তো বলা যাবে না।...ন্ না আমার এখানে নয়।

তাহলে? ওর তো খুব একটা কোথাও...আই মিন ওর বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে—।

কুন্তলার জলে পড়ার মতন অবস্থা নয়... এমনকী এদেশেও ওর তেমন কোনও অসুবিধে নেই।

তা হলেও একেবারে একা একা... অ্যাটলিস্ট আমার তো খোঁজটা জানা দরকার।

কোনও দরকার নেই। ও সলিসিটারের কাছে সাবমিট করা স্টেটমেন্ট অব এভিডেন্স-এর কপি রেখে যায়নি?

হ্যাঁ... মনে হচ্ছে রেখে গ্যাছে। আমি দেখিনি।

দেখে নাও। তা হলেই বুঝে যাবে।

তাতে কি ওর এখনকার অ্যাড্রেস...?

না, অ্যাড্রেস থাকবে না, কেননা তুমি ওর সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ বা দেখা করার চেষ্টা যাতে করতে না পারো।

লাইনটা কেটে দিল কিশলয়।

না, আর কোথাও টেলিফোন করবে না দেবমাল্য। ঝুম হয়ে বসে রইল। অন্তত কিশলয় নিশ্চয়ই জানে, ও কোথায় গেছে, আছে। ঘড়ি চলছে, টিকটিক, সময় পার হচ্ছে। ক্রিসমাস ডে আজ, নিবিড় নৈঃশব্দ্যে মেঘলা দিনটা ভিজছে... ঘরে ঘরে মোমবাতি জেলে ডিনার খাওয়া শুরু হবে... উৎসবেরই তো দিন আজ... মিলনোৎসব!

বিছানা ছেড়ে নামল দেবমাল্য। বুঝতে পারে কোথাও, নিজের মধ্যে একটা প্রতিরোধ তৈরি হচ্ছে। মানসের কথাটা মনে পড়ছিল— আসলে এখন তোর দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। আরও এক ধাপ এগিয়ে ভাবল— এবার দেয়ালটাও ভেঙে বেরিয়েছে ও। ভাবতে ভাবতেই কুন্তলার সলিসিটরের চিঠি আর কোর্ট অর্ডারের কাগজ হাতে তুলে নিয়ে পড়ছে।

কান মাথা গরম, চোখমুখ লাল হয়ে উঠছে দেবমাল্যর। কী অভিযোগ এ সব? কার মস্তিষ্কপ্রসূত?

...নিজেকে সায়েন্টিস্ট বলে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে মিস্টার দেবমাল্য বাগচি দু বছর আগে মিস কুন্তলা রায়কে কলকাতা, ইন্ডিয়া থেকে বিয়ে করে ইংল্যান্ডে নিয়ে এসেছে... মিস রায় উচ্চ বংশজাত, ক্লাস ওয়ান সরকারি অফিসারের কন্যা, উচ্চশিক্ষিত, ইউনিভার্সিটির মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার, ইউ সি এল-এ পি এইচ ডি করার কথা থাকলেও তাকে যেতে দেওয়া হয়নি...বাড়িতে কাজ করার জন্য আটকে রাখা হয়... মিস্টার বাগচি এদেশে অন্য নারীতে আসক্ত...নিয়মিত মৌখিক-মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করা হয় মিস রায়ের ওপরে... আরও বেশ কিছু অভিযোগ, কিন্তু পরের লাইনটা পড়ে দেবমাল্য আর বাকিটা পড়তে পারল না।... মিস্টার বাগচির বাবা সুযোগ পেলেই ডটার ইন ল-কে সেক্সুয়ালি হ্যারাস করতে এবং উপভোগ করতে চায়... মাদার ইন ল সব জেনেও প্রতিবাদ করেন না...

কাগজ ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল দেবমাল্য। বুকের মধ্যে যে দুপদুপ, সারা শরীরে যে আগুন ধরে যাওয়ার মতো অনুভব, রক্তস্রোতে যে ফুটন্ত

কল্লোল...এর নামই কি মাথায় খুন চেপে যাওয়া! এত নীচে নামতে পারল!

সত্যি সত্যি মুখে-মাথায়-গায়ে ঠান্ডা জল ছিটিয়ে এল দেবমাল্য বাথরুমে গিয়ে। রেডিয়েটারের সেন্ট্রাল হিটিং বন্ধ করে দিয়ে এল। পুড়ে যাচ্ছে সমস্ত শরীর, ক্রোধে-লজ্জায়-অপমানে-অবিশ্বাসে কালো হয়ে যাচ্ছে। বড় একটা তোয়ালে দিয়ে গা-মাথা-মুখ ঢেকে নিঃশব্দে বসে রইল। কিছুতে সরাতে পারছে না মন থেকে, এমনকী মা-বাবাকেও...

এক সময় স্থির হল দেবমাল্য। আর তো ফিরে দেখার, ভাববার কোনও সুযোগ নেই, কিছুই রেখে যায়নি কুন্তলা। ও কাগজ ফেলে দেওয়াও যাবে না। পরের পৃষ্ঠায় চোখ রাখল আবার।

—যাবতীয় অভিযোগের ভিত্তিতে শ্রীমতী কুন্তলা বাগচি আমাদের মাধ্যমে হার ম্যাজেস্টি অব কোর্টের কাছে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করেছে... তোমাদের স্টেটমেন্ট অব এভিডেন্স-সহ, তোমার সলিসিটর আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে...আপাতত তিন মাস সেপারেটেড... তারপরে যদি মিউচুয়াল সেটলমেন্ট অব ফাইনান্স অ্যান্ড প্রপার্টি— কোর্ট থেকে ডিক্রি এন আই এস আই... ডিক্রি অ্যাবসল্যুট... আদারওয়াইজ ট্রায়াল...। ধীরেসুস্থে কাগজগুলো রেখে দিল দেবমাল্য। শুধু ক্লান্তি না, মাথাটা কেমন হালকাও যেন। খিদে তেষ্টারও বোধ নেই। গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। ভাবনারা কেমন এলোমেলো মাথার মধ্যে। কাউকে টেলিফোন করবে কি? অফিসে কয়েকজন কলিগ আছে যারা ডিভোর্সি, নিয়মকানুন সব জানে, ভাল সলিসিটর বাতলে দিতে পারবে... মানসকেই কি আগে জানানো উচিত?

কিন্তু আজ এখন তো হবে না... আজ তো পারিবারিক মিলনোৎসব, ক্রিসমাস ডে, ঘরে ঘরে এখন...।

অবসাদ, নাকি বিভ্রান্তি, একাকিত্ব, শূন্যতা কিংবা নিথর ঝড় থেমে যাওয়া প্রশান্তি দেবমাল্যর? কোথায় ভেসে যাচ্ছে এ জীবন, জীবদ্দশা, অস্তিত্ব-যৌবন-পরিচিতি...! বাবা-মা কী করছে কলকাতায়? কতজনের বাড়িতেই আজ ক্রিসমাস ডিনারের ডাক ছিল... ওয়াইন-রোস্টটার্কি-স্টাফিং-পুডিং— মোমবাতির মৃদু আলো, ঝিকমিক

তারা, পিয়ানোর টুংটাং— ঝাউগাছে টুনি বালব—সান্টাক্লজ-এর হাসি...। আঁধারে আলোর উৎসব যে আজ।

টেলিফোন বাজার শব্দেই সচেতন দেবমাল্য। কতক্ষণ সময় কেটেছে! মেঘলা দিনের মরা আলো ঘরের মধ্যে...ঠান্ডা ভাব। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিল শুয়ে শুয়ে। —হ্যালো!

ও মা, এখনও বিছানায় পড়ে ঘুমোচ্ছিস নাকি?

বলো জেঠিমা... ঘুমোচ্ছি না...তবে শুয়ে আছি।

হ্যাঁ রে শরীর খারাপ নাকি?

নাহ।

তবে এখন শুয়ে আছিস যে! ক্রিসমাস-এর দিন... আমি তো ভাবলাম তোদের বাড়িতেই পাব না। হ্যাঁ রে, বাবা-মা নাহয় কলকাতায়... কিন্তু বছরকার দিন বুড়ো জেঠা-জেঠিকে 'মেরি ক্রিসমাস' বলে একটা টেলিফোন অন্তত করবি তো! কী হয়েছে রে?

কিছু না তো!

মিছে কথা বলিস না টিপলু। আবার ঝগড়া হয়েছে কুন্তলার সঙ্গে?

না জেঠিমা। ঝগড়ার কোনও সুযোগ নেই।

মানে? কুন্তলা কোথায়?

ও নেই। চলে গ্যাছে।

বন্দনার গলায় উদ্বেগ। আবার চলে গ্যাছে? কোথায়?

জানি না।

একটু স্পষ্ট করে বলবি টিপলু... কী ব্যাপার?

গলা পরিষ্কার করে, স্পষ্ট করেই কথা বলল দেবমাল্য। ও এবার সত্যি সত্যি চলে গেছে জেঠিমা। ডিভোর্সের নোটিশ দিয়ে, কোর্টঅর্ডার-এর কপি রেখে, এসকর্ট নিয়ে চলে গ্যাছে...কোথায় আমি জানি না।

বন্দনার কণ্ঠও স্পষ্ট এবার। বললেন, সত্যিই তা হলে...। বাড়ি ছেড়ে গ্যাছে কবে?

আজ সকালেই।

বন্দনা নির্বাক রইলেন কয়েক মুহূর্ত। দেবমাল্যর মনে হল শক্তি জেঠুর সঙ্গে দ্রুত কথা বলছেন জেঠিমা।

একটু পরেই বললেন, তুই কী করছিস এখন বাড়িতে?

কিছু না। শুয়েছিলাম।

বন্দনার কণ্ঠস্বর কিছুটা নির্দেশের মতো বাজল।

শোন টিপলু, তুই এক্ষুনি আমাদের এখানে চলে আয়। আমি না, তোর জেঠুও বলছেন।

একটু ভাবল দেবমাল্য। বলল, আচ্ছা দেখি...।

কোনও দেখিটেখি নয়, টিপলু। এক ঘণ্টার মধ্যে তুই না এলে, এই শরীর নিয়ে তোর জেঠুকেই বিলারিকে যেতে হবে।

আচ্ছা.. ইচ্ছে না করলে তোমাদের টেলিফোন করব।

কেন অবাধ্য হচ্ছিস টিপলু? বাবা-মা না থাকলেও, আমরা এখানেই রয়েছি সেটা ভুলে যাস না। শুনতে পাচ্ছিস কী বলছি?

হ্যাঁ শুনছি।

এখনই উঠে চলে আসবি। ছাড়ছি আমি।

দেবমাল্য দ্রুত বলল. শোনো জেঠিমা, তোমাদের ওখানে আর কে আছে কিংবা আসছে?

আর কে আসবে? আমরা তিনজন। পাপু তো চার মাসের জন্য বাঙ্গালোর গেছে জানিস। থাকলে ওরাই আসত।

সত্যি বলছি জেঠিমা... এমন একটা দিনে...এরকম মনের অবস্থা নিয়ে—।

যে অবস্থা সৃষ্টির জন্য তুই দায়ি না, তাকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকায় কোনও গৌরব নেই টিপলু। তাইতে তোর দুর্বলতাই প্রমাণ হয়। ...আর যে বা যারাই হোক, প্রথম থেকে আমরা তো সবটাই জানি। নিমু আর. তোর বাবা ব্যাসিলডনে থাকলে, তুই কি একা নিজের ফ্ল্যাটে বসে থাকতিস? আর কথা বলে দেরি করিস না, চলে আয়।

আবছা আঁধার মেখে ঝিমিয়ে রয়েছে ভেজা দিনটা। জেঠিমার কথাগুলো কানে বাজছে। সত্যি কি দুর্বল দেবমাল্য? এ অবস্থা সৃষ্টির

জন্য ও দায়ি নয় ঠিকই, কিন্তু দু বছর ধরে সহ্য আর কিছুটা প্রশ্রয়ই দিয়ে এসেছে কি? না কি এটুকু না করলে সূক্ষ্মভাবে নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হত! কিন্তু আজ তো তার জবাবদিহি করার কিছু নেই। কার জন্য, কেন প্রাণপাত করবে ও?

বিধ্বস্ত ঘর যেমন পড়ে থাকার পড়ে রইল। স্নান সেরে নিল দেবমাল্য। পরিচ্ছন্ন হয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। ভেতর থেকেই যেন কয়েক ঘণ্টা আগের স্বস্তিবোধটা উঠে আসছে। বাঁধনহীন, উৎকণ্ঠাহীন, যেন অনেক দিন পরে একটা স্বাধীন মানুষের মতন আজ রাস্তায় বেরিয়েছে দেবমাল্য। বন্দনা ঠিক বলেছেন। এ পরিস্থিতি তো ও সৃষ্টি করেনি! তা হলে কীসের সংকোচ, কেন দুর্বলতা, কেন একা বসে থাকা! ধারাবাহিকভাবে ও আড়ষ্ট হয়ে থেকেছে তৃষার সামনে, যেন কুন্তলার আচরণে লজ্জায় কুঁকড়ে থাকত। সে লজ্জা যে ওর আত্মবিশ্বাসেরই পরিপন্থী। আজ প্রাণ খুলে গল্প করবে তৃষার সঙ্গে।

১০

টেলিফোনের অপর প্রান্তে ভারী কণ্ঠস্বরে হ্যালো শুনেই দিবাকর রায়কে চিনতে পারলেন দেবতোষ। পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি দেবতোষ বাগচি বলছি।

হ্যাঁ, বলুন দেববাবু।

মাঝখানে কয়েকদিন আপনার সঙ্গে আর কথা হয়নি... ভাবলাম একটা টেলিফোন করে কনফার্ম করে নিই। আপনার মনে আছে তো?

কী ব্যাপার বলুন তো!

সামান্য অস্বস্তি বোধ করলেন দেবতোষ। যাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা, তিনি যদি অতিথির আগমনের ব্যাপারটা ভুলে গিয়ে থাকেন, তাহলে কোথায় যেন একটু হীনমন্যতা অনুভূত হয়। বিশেষ করে অতিথিটি যখন তাঁর বেয়াই দেবতোষ বাগচি স্বয়ং এবং তিনি থাকেন

বিদেশে, এসেছেন মাত্রই কিছুদিনের ছুটিতে এবং আমন্ত্রণটাও ছিল দিবাকর রায়ের তরফ থেকে— সংকোচটা একটু বেশি বোধ করাই স্বাভাবিক।

কিন্তু প্রয়োজন এবং তাড়া দুটোই দেবতোষের বেশি। অস্বস্তিটা গায়ে না মেখে বললেন, আজকে আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল... মানে... আপনিই তাই বলেছিলেন...।

ওহ্ তাই বলেছিলাম বুঝি? দিবাকর যেন স্মরণ করার চেষ্টা করছেন, অন্তত কণ্ঠস্বরে মনে করার সুরটাই ফুটিয়ে তুলছেন। বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, কবে কথা হয়েছিল বলুন তো?

শুধু অস্বস্তি না, সম্পর্কের নিরিখে একটু অপমানিতও বোধ করতে পারতেন দেবতোষ। কিন্তু নিরুপায় তিনি, আপাতত পরিস্থিতি অনুযায়ী দায়টাও যে তাঁরই। বললেন, আপনার সঙ্গে এবারে একবারই দেখা হয়েছে, আপনাদের পিকনিক-এর দিন। সেদিন বলেছিলেন।

হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ ঠিক, হেসে উঠলেন দিবাকর, তার মানে গত বছর কথা হয়েছিল বলুন!

সন তারিখের হিসেবে তাই দাঁড়ায় বটে। দেবতোষ যোগ করলেন, তবে এই দিনটি আপনারই বিশেষ করে মাথায় থাকবে বলে জানিয়েছিলেন। আপনার বোধহয় কোর্ট-কাছারিতে কিছু কাজ থাকবে এবং তারপর আমাদের দেখা হবে বলেছিলেন।

একেবারেই ঠিক বলেছেন। আপনার মশাই স্মরণশক্তিটি বেশ ভাল।

দেবতোষ বললেন, না রেখে উপায় কী বলুন! দিন তো গোনাগুনতি।

আপনার মশাই এত তাড়াহুড়োরই বা কী?

দেবতোষ না বলে পারলেন না, আর্জেন্সিটা যার যার, তার তার, রায়বাবু। টেলিফোনে সেটা বোঝানো কি সম্ভব!

অ, তা হবে। গলার সুর পালটে দিবাকর বললেন, সেদিন পিকনিক-এও তো আপনি আমার মাথাটি হেঁট করে দিয়ে এলেন।

তা নয় রায়বাবু, দেবতোষ বললেন, সেদিন আপনাদের, আমার মন মেজাজ অন্য রকম ছিল। আমি নেহাত আপনার কথা রাখতেই...।

কথা আর রাখলেন কোথায়! যে সমস্ত লোকজন সেদিন ছিলেন

ওখানে... তাঁদের সামনে অপদস্থই হতে হল আমায়।

সামান্য দেখা হওয়ার কথাটা নিশ্চিত করতে গিয়ে, এই আলাপচারিতা বা চাপানউতোরটা ভাল লাগছিল না দেবতোষের। মনের মধ্যে উদ্বেগ-হুতাশ চাপা পড়ে রয়েছে। সময়ও বসে থাকছে না। আবার দিবাকর রায় এমনই একটা প্যাঁচ কষে বসে আছেন এবং কেনই বা, ভাবতে ভাবতে ঘুম চলে গেছে দেবতোষের। কিন্তু সামনাসামনি এবং একান্তে কথা না হলে, সব প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেও তাঁর বাধছে। অথচ দিবাকর যেন বুঝেও বুঝতে চাইছেন না দেবতোষের প্রয়োজন আর আগ্রহটা। সত্যি কথা বলতে কী, বেয়াই মশাইটির যে আসল উদ্দেশ্য কী, পুরোপুরি সেটাও আঁচ করতে পারছেন না দেবতোষ।

অথচ ইংল্যান্ড থেকে আসার আগে পর্যন্ত দেবতোষের ধারণা ছিল, পুলিশ অফিসার হিসেবে দিবাকর রায়ের ব্যক্তি বা কর্মজীবন যে স্তরের আর যেমনই থাকুক না কেন, নিজের মেয়ের বিবাহিত জীবনের আসন টলমল অবস্থার কথা জানলে এবং কুন্তলার আচার-আচরণ, জীবনযাপনের প্রকৃত ছবিটা দেখতে পেলে, ভদ্রলোক উৎকণ্ঠায় বিচলিত হবেন অনেক বেশি। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই দেবতোষের সঙ্গে আলাপ আলোচনার উৎসাহ দেখাবেন। কিন্তু বাস্তব ঘটনাগুলো ঘটছে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে। দিবাকর রায় যে শুধু একটি নিশ্চিন্তির আর উৎকণ্ঠাহীন আবহে বাস করছেন, তাই না। ওঁর কথাবার্তা এবং ছোটখাটো আরও যেসব পন্থা অবলম্বন করছেন বলে দেবতোষ ভাবছেন, তাতে বরং মনে হচ্ছে, নানাভাবে দেবতোষদের হয় এড়িয়ে যাওয়া, নয়তো পর্যুদস্ত করাতেই ওঁদের আগ্রহ বেশি। এটা কি খুব সুস্থ পিতৃসুলভ ভাবনা দিবাকরবাবুর! নাকি বেয়াইসুলভ!

টেলিফোনে আর কী-ই বা বলবেন দেবতোষ! দেখা হওয়াটাই বড় জরুরি এখন। ফ্ল্যাট-এর কাগজপত্রও ওঁর কাছে। রেজিস্ট্রেশন সেরে যেতে না পারলে, আবার তো সেই কথা হওয়া এবং কথা ফলপ্রসূ না হওয়ার পুনরাবৃত্তি।

দেবতোষ বললেন, আচ্ছা বেশ, আপনার সঙ্গে দেখা হলেই না হয় বিস্তারিত কথা বলব। কটা নাগাদ তাহলে...?

আপনি একটা কাজ করুন দেববাবু, দিবাকর বললেন, বাড়িতে আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব সুবিধে হবে না—।

দেবতোষ সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, আপনি আমার ফ্ল্যাটেই আসুন না, আমরা খুব খুশিও হব তাহলে।

আপনার ফ্ল্যাটে... মানে... ও-হো-হো... না মশাই, ওখানেও তো সেই ব্যাপার। আমার তো মনে হয় নিরিবিলিতে বসেই আমাদের... মানে শুধু আপনার আর আমার মধ্যেই কিছু কথা সারার দরকার। কী বলেন আপনি?

আমার কোনওটাতেই আপত্তি নেই, দেবতোষ বললেন। একটু আমতা আমতা করে আবার বললেন, আসলে... টিপু-কুন্তলার সম্পর্ক-টম্পর্ক যেদিকে যাচ্ছে... ওদের নিয়েই তো মেইন কথাবার্তা... সেখানে পরিবারের অন্যরা, বিশেষ করে মিসেসরা থাকলেই কি ভাল হত না! ঢাকঢাক-গুড়গুড় করার তো কিছু নেই—।

শুনুন দেববাবু, দিবাকর বললেন, ঢাকঢাক-গুড়গুড় আমারও কিছু নেই, ওদের সম্পর্কের বিষয়েও আমি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। এখন গার্জিয়ান হিসেবে আপনার আমার আলোচনাটাই ইম্পর্টান্ট। এসব প্র্যাকটিক্যাল কথার মধ্যে মেয়েছেলেরা থাকা মানেই ভেজাল বাড়ানো।

কথাগুলো ভাল লাগল না দেবতোষের। কিন্তু সেসব উচ্চবাচ্য না করে বললেন, তাহলে আপনিই বলুন কোথায় দেখা হওয়া সম্ভব।

আপনি বরং আমার ক্লাবে চলে আসুন। ডিরেকশন দিয়ে দিচ্ছি, আপনার ওখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়... একটু ফ্রি মুডে কথা বলা যাবে।

রাস্তার নির্দেশ লিখে নিয়ে দেবতোষ বললেন, ঠিক আছে, সাড়ে সাতটা নাগাদ পৌঁছে যাব।

টেলিফোন ছেড়ে দিলেন দেবতোষ। ঘণ্টা তিনেকের মতো সময় আছে। হিসেব করে দেখলেন, লেক গার্ডেন্স-এর ওপর নতুন ব্রিজ দিয়ে

পৌঁছতে মিনিট পনেরো-কুড়ির বেশি সময় লাগা উচিত নয়। আলোচনার বিষয়গুলো মনে মনে একটু ঝালিয়ে নেওয়া দরকার।

একটা ব্যাপার নিজের মধ্যে অনুভব করেন দেবতোষ, যত দিন যাচ্ছে, কথাবার্তা বলতে গিয়েই কোথায় যেন রায়বাবুর সঙ্গে একটা রুচিগত পার্থক্য টের পান। কখনও ওঁর কথার মধ্যে হালকা ভাব থাকলেও, কোনও কোনও সময় যেন শিষ্টাচারের বোধটা হারিয়ে যায় ভদ্রলোকের। কঠিন এবং কর্কশ উচ্চারণেও যেন বাধে না। অথচ ওঁদের সম্পর্কটা খুবই নিবিড় আন্তরিকতারই কি হওয়া উচিত নয়!

মনের গভীরে একটা গোপন খচখচানি হয় দেবতোষের। সেই দেখেশুনেই যখন ছেলের বিয়ে দিতে হল, আর একটু জানাশোনা, খোঁজখবর বোধহয় দরকার ছিল। ওপর ওপর দেখা, আলাপ পরিচয়ের থেকেও, ওঁদের সামাজিক এবং পারিবারিক ছবিটা বোঝা উচিত ছিল। চেষ্টা করলে এবং কিছুটা সময় দিলে, সেটা অসম্ভবও ছিল না। একটু তাড়াহুড়োই করে ফেলেছিলেন কি?

আসলে তখন রায়বাবুদের তরফ থেকেই ব্যগ্রতা ছিল বেশি। টিপলুও নিজে মেয়ে দেখে গিয়ে দিব্যি খুশি। একমাত্র পাপিয়ার বর, ভগ্নিপতি তাপস বলেছিল, আপনাদের ওখানে সামারেই তো বিয়ে থাওয়ার ভাল সময়, ছ-সাত মাস দেরিতে আর কী যাবে আসবে! আমরাও একটু খোঁজখবর করি। তা ছাড়া ওঁদেরও তো মেয়ে, বিয়ের পরে বিদেশে চলে যাবে... আজকাল যেরকম সব লেখালিখি হচ্ছে কাগজপত্রে... আপনাদের সম্পর্কেও ভাল করে জেনেটেনে নিতে পারবেন... একটু স্যাটিসফ্যাকশন আর কী!

আসলে ওঁদের তরফে কিশলয় তত দিনে সব খবরাখবরই সংগ্রহ করে ফেলেছিল, টিপলুও আর অপেক্ষা করতে চায়নি। কুন্তলাকে দেখে ওঁদেরও অপছন্দের কিছু ছিল না, সুতরাং ভাল লাগার আবেগেই তখন কল্পনার ডালপালা গজাচ্ছিল প্রতিদিন। তা ছাড়া বিদেশবিভুঁই থেকে কতটাই বা...।

কিন্তু দিবাকরবাবুদের দিক থেকে তখন যে তাড়া পড়ে গিয়েছিল,

পাত্র হাতছাড়া করতে চাইছিলেন না, সেটা পরে বুঝতে পেরেছেন দেবতোষ। মেয়ের পার্সোন্যালিটি প্রবলেম আছে ওঁরা জানতেন। সময় দিলে আবার কোথায় কী জানাজানি হয়ে যায়, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়লেই, বলা যায় না, বিয়ে ভেস্তে যেতে পারে। দেখাশুনোর মাস ছয়েকের মধ্যেই বিয়ের আয়োজন হয়ে গিয়েছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে গেল দেবতোষের। দেশে-বিদেশে বৈবাহিক সম্পর্কের পরে, মেয়েরা অনেক সময় অপ্রত্যাশিত দুর্ভোগের খপ্পরে পড়ে বলেই বেশি শোনা যায়। তাঁদের ক্ষেত্রে ঘটনাটা উলটো হয়েছে। কিন্তু এখন আর কী-ই বা করার আছে!

দিবাকরের আমন্ত্রণে সেদিন ডায়মন্ডহারবার রোডের সেই পিকনিকে গিয়েও ভাল লাগেনি দেবতোষের। মনে হয়েছিল বেয়াই হিসেবে তাঁকে আপ্যায়িত করার বদলে, দিবাকরের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য যেন ছিল, তাঁর স্ট্যাটাস আর কী রকম ভিআইপি মহলে তাঁর অবাধ মেশামিশি সেই সবই বেশি করে দেখানো। আর সেই সূত্রে তাঁর ওজনটাও আর একবার বুঝিয়ে দেওয়া।

অনেক কিছু মিলিয়েই সূক্ষ্মভাবে দেবতোষের মাথায় আসে... এবার কি খানিকটা সুপরিকল্পিত উপায়েই দিবাকর রায়, তাঁর এবং তাঁর পরিবারের ওপর কিঞ্চিৎ চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন? টিপলু-কুন্তলার টলমল দাম্পত্য সম্পর্কের জন্যই কি পরোক্ষভাবে তাঁদের একটু ভয় দেখানোও, এমনকী একটু শাসানিরও প্রবণতা রয়েছে ওঁর কথায়-আয়োজনে-আচরণে!

ডায়মন্ডহারবার রোডের বাগানবাড়িতে একটু দেরি করেই পৌঁছেছিলেন দেবতোষ।

উঁচু পাঁচিল দিয়ে চারদিকে ঘেরা, খোলামেলা চমৎকার বাগানবাড়ি। গোটা কয়েক কটেজ, নানা ধরনের ফলের গাছের সমারোহ, মাঝখানে সবুজ ঘাসের লনে রঙিন ছাতা, নীচে চেয়ার, একদিকে কৃত্রিম জলাশয়, বাঁশবাগান ও কৃত্রিম জঙ্গল বানানো... সব মিলিয়ে একটি শীতের দিন উপভোগ করার নিখুঁত আয়োজন। মূল বাড়ির একতলায় ক্যাটারারদের

রান্নাবান্নার আয়োজন, পিছনে পাতকুয়ো, টিউবওয়েল। বোঝা যায়, অর্থবান কোনও ব্যক্তি ভাবনাচিন্তা করেই শহর থেকে একটু দূরে এমন একটি নিবিড় আনন্দাশ্রম রচনা করেছেন।

অথচ পৌঁছনোর কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেবতোষের মনে হয়েছিল, পারিবারিক পিকনিক-এর নাম করে প্রকৃতপক্ষে ওই সুন্দর সীমাবদ্ধ বাগানবাড়িতে একটি মোচ্ছবের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং আরও কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝে গিয়েছিলেন, তথাকথিত ক্ষমতাবান এবং লোভী কিছু মানুষকে ওখানে পান-ভোজনের মাধ্যমে দুরন্ত উপায়ে আপ্যায়নের নামে তোষণ এবং তৈলমর্দন চলছে।

এহেন আয়োজন নতুন কিছু না। দেবতোষও জানেন এবং শুনেছেন। কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতাটি নতুন।

দিবাকররা নিশ্চয়ই সময়মতোই পৌঁছেছিলেন, দেবতোষ অনুমান করলেন। কেননা, পানের প্রভাবে বেলা সাড়ে বারোটা পৌনে একটার মধ্যে নইলে ওঁদের মধ্যে অনেকেরই ততখানি মুক্ত পুরুষ হয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। মুক্ত নারীরাও ছিলেন না, তা নয়।

কিছুটা আগন্তুকের মতোই হাজির হয়েছিলেন দেবতোষ। অজানা-অপরিচিতদের মধ্যে অপ্রতিভ না হলেও আড়ষ্টতা একটু থাকাই স্বাভাবিক। বোধহয় সেটুকু কাটিয়ে দেওয়ার জন্যই দায়িত্ব নিয়ে ফেললেন দিবাকর।

দেবতোষকে আসতে দেখেই ঈষৎ স্খলিত পায়ে এগিয়ে এলেন।

ব্যাপার কী মশাই, বিলেত থেকে বেয়াই আসছে বলে রেখেছি... এত দেরি? অতিথিদের সামনে প্রেস্টিজ পাংচার! আসুন দেখি, আগে দু পাত্তর চাপিয়ে লেবেল হয়ে যান তো!

ঠিক আছে, আপনি ব্যস্ত হবেন না, বলতে বলতেই আরও বেশ কয়েকজনের মধ্যে ছাতার নীচে বসে পড়লেন দেবতোষ।

দু-একজন হাত বাড়িয়ে করমর্দন করতেই দিবাকর পানীয় ঢালতে ঢালতে আলাপ করিয়ে দিতে লাগলেন। অতনু চ্যাটার্জি, আই পি এস, জয়েন্ট কমিশনার, হিরালাল কোঙার, ডায়মন্ডহারবারের এম পি,

দেবেশ ভট্টাচার্য, রিটায়ার্ড চিফ সেক্রেটারি, ভবশঙ্কর দাঁ, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী, যিশু পালচৌধুরী মেগা সিরিয়াল মেকার, রফিক হায়দার আই টি ও... মুনমুন চৌধুরী, অভিনেত্রী ও তাঁর মা মীনাক্ষী দাস, বসন্ত সোয়াইকা—বিজনেসম্যান..। পরিচয়পর্ব শেষ হওয়ার আগেই দেবতোষ বুঝে গেলেন স্মরণশক্তির ওপর চাপ পড়ছে। কখনও হাত বাড়িয়ে, কখনও নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত তুলে পরিচিত হলেন দেবতোষ। কিন্তু ঝাঁকের কই হতে পারলেন না। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই হাতে বা সামনে গ্লাস, সোনালি তরলে ভর্তি বা অর্ধভর্তি, সোডা-বরফ-মিনারাল ওয়াটার এবং খুবই সাধারণ মানের কয়েকটি স্কচ হুইস্কির বোতল, জিন-ভদকা-রামও আছে, রয়েছে স্যালাড-ফিশ ওরলি-সস... যেমন থাকে।

দেবতোষ সম্ভবত মূর্তিমান রসভঙ্গের মতো হাজির হওয়াতেই মজলিশি পরিবেশটার তাল কেটে গিয়েছিল সাময়িকভাবে। কিংবা পানের প্রভাবে কী কথা বা আলোচনা চলছিল, তাও হয়তো মনে নেই কারও কারও। তার মধ্যে দিবাকর প্রায় আধগ্লাসটাক হুইস্কির মধ্যে কিছু বরফ মিশিয়ে বাড়িয়ে ধরলেন দেবতোষের দিকে। জল ব্যতীত।

আসুন স্যার... সবাইয়ের মঙ্গল হোক।

কার এবং কেনই বা দিনদুপুরে মদ্যপান করে মঙ্গল হবে কিছুই বুঝতে পারলেন না দেবতোষ। এমনিতে আগে তিনি ছিলেন মফস্‌সলবাসী, আর এখন ইংল্যান্ডে থেকে ঠিক কলকাত্তাই বোলচালগুলো ধরতে পারেন না। তা ছাড়া স্পিরিট সেবনেও ততটা তুখোড় নন। দিবাকরের বাড়ানো গ্লাস দেখে সংকুচিত হলেন।

সসংকোচেই বললেন, আমাকে আর ওই বস্তুটি... মানে আমি খুব একটা...।

সে কি মশাই, ছুটির দিনে পিকনিকে এসে মাল খাবেন না! এমন অবিশ্বাস্য ঘটনাটির পক্ষে আরও জোরদার সওয়াল করার মতোই দিবাকর বললেন, ফালতু জিনিস নয়, খোদ আপনাদের দেশেরই জিনিস, ফাইনেস্ট স্কচ...।

কোয়ালিটির আলোচনায় না গিয়ে দেবতোষ সবিনয় বললেন, না-না, তার জন্য নয়, সে তো দেখতেই পাচ্ছি... আসলে দিনের বেলায় ঠিক অভ্যাসও নেই—।

অভ্যাস তো আমাদেরও নেই... পিকনিক বলেই তো ব্যবস্থা।

দেবতোষের মুখ দিয়ে অভ্যাসের মতো বেরিয়ে পড়ল, আমি আবার গাড়িও চালাচ্ছি কি না...।

গাড়ি নিজে চালাচ্ছেন? বললাম সেদিন কত করে একটা গাড়ি... তো সে যাকগে, ধরুন, আমাদের এখানে এখনও তত কড়াকড়ি নিয়ম হয়নি। আসুন।

দেবতোষ অনুনয়ের সুরে বললেন, ওটা থাক রায়বাবু।

অতনু চ্যাটার্জি বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে রায়, ওঁকে তাহলে বরং জিন-লেমোনেড দিন না।

হিরালাল কোঙার পাশ থেকে প্রগলভ কণ্ঠে বললেন, দিনের বেলা ডাবের জল দিয়ে রামটাও কিন্তু অতি উপাদেয়।

দিবাকর অপ্রতিভ। হাত সরিয়ে নিতে নিতে বললেন, দেখুন তা হলে আপনার কী চলবে! বিলেতে থাকা লোক মালের ব্যাপারে এমন উদাসীন হয় বলে তো শুনিনি... ওখানে তো জলের বদলে লোকে মদ খায় বলেই জানি।

বিলেতে থাকলেই লোককে কেন মদ খেতে হবে, এ প্রশ্ন দেবতোষ করতে পারেন না। তা ছাড়া এখানকার তুলনায় ইংল্যান্ডে অ্যালকোহল-এর ব্যবহার যে বহুগুণ কম, করলেও সেটা অনেকখানি বিয়র-লাগার-ওয়াইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, হুইস্কি-জিন-রাম-এর মতো স্পিরিট নয়, সেই সংবাদও এই আড্ডাতে অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু হংস মধ্যে বক যথা হয়ে বসে থাকাও ভারী অস্বস্তির।

মীনাক্ষী দেবী ইতিমধ্যে প্লেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আচ্ছা একটা ফ্রাই নিন, এটাতে আপত্তি নেই তো?

দেবতোষ ফ্রাই নিয়ে বললেন, থ্যাঙ্ক য়্যু। আপত্তি কিছুতেই নেই—।

যিশু বললেন, আপনাকে বরং আমার মতন কয়েক কুচি কাঁচালঙ্কা

দিয়ে একটা ভদকা বানিয়ে দিই। ট্রাই করে দেখবেন নাকি?

একই সঙ্গে বিপন্ন আর সংকুচিত হয়ে পড়ছিলেন দেবতোষ, তাঁর পানীয় নির্বাচন নিয়ে সবার এই জড়িয়ে পড়ায়। আসলে বোধহয় অন্য জমাটি কোনও বিষয়ও ছিল না আলোচনার। নিজে থেকে বললেন, আপনারা কেউ বিয়র কিংবা লাগার খাচ্ছেন না?

দিবাকর ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সুরেই বললেন, কেউ না খাক, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে সাত সকালে ওই ঘোড়ার পেচ্ছাপ খেয়ে কে আর পঞ্চাশবার টয়লেটে ছুটবে বলুন! এটুকু বলেই বাড়ির যে দিকে রান্না হচ্ছে সে দিকে ঘুরলেন দিবাকর। ওখান থেকেই হাঁক দিলেন, অ্যাই, সামন্তকে একবার আসতে বলো তো!

সাফারি স্যুট, ভুঁড়িওয়ালা, লম্বাচওড়া, পেলব গাল লোকটি প্রায় অনুগত সারমেয়টির মতোই হাসিমুখে হাজির। —বলুন স্যার, আপনাদের যে আজ বড্ড স্লো চলছে! কী পাঠাব?

দিবাকর বললেন, স্টক-এ বিয়র আছে!

কী বলেন স্যার! ঠান্ডা, না নরম্যাল? ক্যান, না কি বোতল?

সামান্য হকচকিয়ে গেলেও, দেবতোষই উত্তর দিলেন। —ঠান্ডা একটা ক্যান যদি... ছোট ক্যান হলেই চলবে।

সাফারি স্যুট বললেন, ছোট কেন স্যার? একটাই বা কী হবে? ফ্রিজে তো ভর্তি পড়ে আছে... এখানে তো কেউ... এক্ষুনি পাঠাচ্ছি স্যার।

টুকটাক কথাবার্তা, হাসি ঠাট্টা আবার শুরু হয়েছে। সেন্টার অব অ্যাট্রাকশন তাঁর দিক থেকে সরে যাওয়ায় স্বস্তি বোধ করলেন দেবতোষ। মন্ত্রীমশাই সুন্দরবনের ব্যাঘ্র বিষয়ক একটা আদি রসাত্মক গল্প জুড়েছেন। শেষ হতেই অভিনেত্রী মুনমুন অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে হাসলেন। আলোচনার মোড় ঘুরে যাচ্ছে সুন্দরবনে লঞ্চ ট্রিপ করতে যাওয়া নিয়ে। এর মধ্যেই বিশালবপু নিয়ে টুকটুকে ফর্সা মহিলাটি এসে চেয়ার দখল করলেন। বসন্ত সোয়াইকা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, হোয়াট উড য়্যু লাইক ম্যাডাম?

দেবেশ বললেন, জিগ্যেস করছ কেন? সোডা-হুইস্কি বানিয়ে দাও।

আলাপ হল দেবতোষের সঙ্গে। যথারীতি ইংল্যান্ডে থাকেন শুনে, তারপরেই সনাতন মধ্যবিত্ত আলোচনা শুরু হল। ...আমার ছোটমাসির বড় ছেলে থাকে নটিংহামে... স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ডাক্তার... বছর পাঁচেক আগে গিয়েছিলাম... আমার অবশ্য গানের অনুষ্ঠান ছিল...।

অতনুর অনুরোধ, বউদি একটা হবে না কি?

মুনমুন সায় দিল, প্লিজ কাকিমা... এই আকাশে আমার মুক্তি... দিয়েই শুরু করো—।

কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ বলে এম পি উল্লসিত হলেন। বসন্ত চেঁচিয়ে বলল, এ সামোন্তো ভাই, এক ট্রে পকোড়া ভেজ দো...।

নিজের মধ্যে একা হয়ে যাচ্ছিলেন দেবতোষ। দেখতে দেখতে দুসপ্তাহ হয়ে যাচ্ছে। কোনও কাজই এগোয়নি। যে উদ্দেশ্য নিয়ে পিকনিকে এসেছিলেন, তার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারবেন না, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ওদিকে উদ্বেগ অহরহ তোলপাড় করছে মাথার মধ্যে। ভিখিরিকে পেট্রল পাম্প-এর কাছে তিনি টাকা দিতে যাননি, ফ্ল্যাটেও কেউ এসে হুজ্জোতি করেনি, নির্মলাও যথারীতি সাঁইবাবার আশ্রমে যাচ্ছেন-আসছেন... শুধু সঙ্গে কাজের মেয়েটিকে নিয়ে যেতে বলেছেন দেবতোষ।

সাময়িক উত্তেজনায় মুষড়ে পড়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু বাস্তববোধ থেকেই বুঝেছিলেন, ও সবই ছিল ফাঁকা আওয়াজ। তবে একটা ব্যাপার তো অনস্বীকার্য যে, তাঁদের ওপর কেউ নজর রাখছে। উদ্দেশ্যও সাধু না। নিজের দেশে এসে এই অনুভূতি কি খুব সুখের! আর পার্থসারথিও যে খবরটি দিয়ে গেল, তাতেও তো আশ্বাসের অধিক অজানা উদ্বেগই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফ্ল্যাটের কাগজ সব দিবাকরের কাছে।

টিপলুকে ফোন করা হয়নি বেশ কদিন। একটু ভরসার কথা বলতে না পারলে কীই বা জানাবেন! অবশ্য শক্তিদার শরীরের খবর নেওয়ার জন্য টেলিফোন করেছিলেন। নিশ্চয়ই ওঁদের কাছ থেকে টিপলুরা খবর পাবে। মামণিটা ঠিক আছে তো? আসার আগে তো শুনে এসেছিলেন, মানসের কাছে নাকি আবার গিয়েছিল। কে জানে কন্টিনিউ করছে কি না!

দিবাকরের প্রশ্নেই বাগানবাড়িতে ফিরে এসেছিলেন দেবতোষ।

আপনি যে গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন বলছিলেন... কোথায় সে গাড়ি?

দেবতোষ সামান্য ঝাঁকানি খেয়ে বললেন, ওই... ফটকের বাইরে... দারোয়ানই বলল, বাইরে রাখতে।

মাথা নেড়ে একটা হতাশ হওয়ার মতো শব্দ করেছিলেন দিবাকর। আর কিছু না বলে, দেবতোষের পাজামা-পাঞ্জাবি-শাল আর চপ্পল-এর দিকে একবার নজর বুলিয়েছিলেন।

দেবতোষের কি বাকিদের মতো স্যুট পরে, ড্রাইভার নিয়ে পিকনিকে আসা উচিত ছিল!

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লেও, রোদের তেজ কমে এলেও এবং সেই সাফারি স্যুট সামন্তর বার কয়েক— খাবার ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে স্যার— অনুরোধ সত্ত্বেও, দেবতোষ বুঝতে পারছিলেন, অধিকাংশ মাননীয় অতিথিদেরই তখনও ভাবখানা— যাব না, যাব না, যাব না ঘরে... পিকনিক করেছে পাগল মোরে। দু-একজনের সঙ্গ নিয়ে, দেবতোষও দুচামচ বিরিয়ানি মুখে দিয়ে আর পিছন ফিরে দেখেননি সেদিন। টালমাটাল অবস্থায় পিকনিক-এর শেষ দৃশ্য অভিনীত হওয়ার আগেই তিনি বাগানবাড়ি পরিত্যাগ করছিলেন। বুঝতেই পেরেছিলেন, কখন আর কোন ফাঁকে তিনি অন্তর্ধান করলেন, অন্তত দিবাকর আর তা খেয়াল করতে পারবেন না।

যথারীতি পারেনওনি, এমনকী পরের দিকে টুকটাক যেসব কথাবার্তা হয়েছিল বেমালুম সে সবও বিস্মরণ হয়েছিলেন দিবাকর। আজকে দেখা হওয়ার কথাটা সেইজন্যই বিশেষ করে আর একবার ঠিক করে নেওয়ার দরকার ছিল।

হাতের ঘড়ি দেখলেন দেবতোষ। সময় আছে। কলকাতার তুলনায় জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শীত জাঁকিয়ে পড়েছে বলা উচিত। গতকাল টিভিতে শুনেছিলেন, তাপমাত্রা বারোয় নামবে রাতে, হিমপ্রবাহ নাকি আরও কয়েকটা দিন চলবে। এই সময়টা রোজ দু-আড়াই মাইল হাঁটতে বেরোন দেবতোষ। লেকগার্ডেন্স-আনোয়ার শা রোড-যোধপুর পার্কের

মধ্যেই, সোয়েটার গায়ে দিয়ে গলায় একটা মাফলার জড়িয়ে এদিক ওদিক হেঁটে নেন। কোনও কোনও দিন ফ্ল্যাটের কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কলকাতায় অনেক মানুষেরই হাঁটার ব্যাপারে সচেতনতা এসেছে। জামাকাপড় পরতে পরতে দেবতোষ ভাবছিলেন, প্রতি বছর কলকাতা এসে প্রায়ই এদিক সেদিক বেরিয়ে পড়েন। ভাটপাড়া নৈহাটি যাওয়া তো হয়ই, দুর্গাপুরে পাপিয়ার বাড়িতেও দু-একটা দিন, আবার ওখান থেকে শান্তিনিকেতন-মাসাঞ্জোর...। কিছু না হোক কলকাতার মধ্যেই রবীন্দ্রসদন-অ্যাকাডেমি-শিশির মঞ্চ, কখনও ময়দানের মেলাগুলোয় ঘুরে আসতেন। ভাল নাটক, গানের অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দেখে ছুটতেন। এখনও ময়দানের দিকে গেলে সেই পুরনো স্মৃতি আর দৃশ্যগুলো চোখে ভাসে। কোথায় পাতাল রেল তখন! শীতের দুপুরে ময়দানের গাছতলায় বসে দেখা যেত, দূরে আলিপুরের ট্রামগুলো চলে যাচ্ছে। রোদের সঙ্গে উত্তুরে হিমেল হাওয়া...।

এবার এসে পর্যন্ত কোথাও যাওয়ার সেই মনটাই যেন নেই। অথচ এই ফ্ল্যাট কেনার সময় থেকেই কতরকম ভাবনা ভেবে রেখেছিলেন। নিজেরা এসে বেশিদিন থাকবেন, পুরনো বন্ধুবান্ধবদের ডাকবেন, সুযোগ পেলেই টিপলুরা এসে থাকবে, দূরে দূরে বেড়াতে যাবেন। নাহ, আজ রায়বাবুর সঙ্গে দেখা করে আসার পরে, কোথাও বেরিয়ে পড়তেই হবে... কটা দিনই বা আর ঠান্ডা থাকবে...!

ফ্ল্যাটের নীচের ছেলেটার কাছ থেকে জামাকাপড় ইস্ত্রি করিয়ে নিয়ে নির্মলা আর কাজের মেয়েটি ফিরে এল। পয়সা বার করতে এসে নির্মলা বললেন, তুমি বেরুচ্ছ?

এক চক্কর হেঁটে আসি, দেবতোষ বললেন। রায়বাবুর সঙ্গেও দেখা করতে যাব, কাজের কথা তো আর হচ্ছেই না।

কাজের মেয়ে শঙ্করীকে পয়সা বার করে দিলেন নির্মলা। ও চলে যাওয়ার পরে বললেন, শোনো, তুমি যখন সকালে বাজার করতে গিয়েছিলে, আমাদের নীচের ফ্ল্যাটের প্রিয়া বলে মেয়েটা... মেয়ে মানে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের বউ... ও এসেছিল। এমনি দেখা করতেই এসেছিল।

কিন্তু কথা বলতে বলতে হঠাৎ জিগ্যেস করল, মাসিমা, আপনারা কবে ছেড়ে দিচ্ছেন এ ফ্ল্যাট?

দেবতোষ শুনছিলেন সব এতক্ষণ। এবার ঝটিতি ঘুরে দাঁড়ালেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, তার মানে? তুমি জিগ্যেস করলে না...?

করেছি। সেই কথাটাই বলছি। জিগ্যেস করলাম, এ খবর কার কাছ থেকে শুনলে আবার! ও খুব সরলভাবেই বলল, কেন মাসিমা, এ খবর তো ফ্ল্যাটের সবাই জানে। আপনারা এদেশে থাকেন না বলে নাকি কীসব অসুবিধে আছে...!

দেবতোষ অসহিষ্ণুর মতো বললেন, আরে খবরটা কার কাছ থেকে শুনেছে জিগ্যেস করলে না?

করেছি, বলছি তো! ওর বর ইউ বি আই, পার্ক সার্কাস ব্রাঞ্চ-এর ম্যানেজার। সেখানেই টিপুর শ্বশুরবাড়ির কে নাকি কাকে বলেছে... ভদ্রলোক শুনে এসে প্রিয়াকে বলেছেন... কোঅপারেটিভের মিটিংয়েও নাকি এ সব আলোচনা হয়েছে। ...রায়বাবুকে জিগ্যেস কোরো, এসব কী ব্যাপার!

শুধু গুম হয়ে যাওয়া নয়, উত্তেজনা-আশঙ্কা সব মিলিয়ে যেন ফ্যাকাশে দেখাল দেবতোষকে।

কয়েক মিনিট সময় নিলেন ধাতস্থ হতে। জামাকাপড় পরা শেষ করলেন। একটু পরে বললেন, খানিকটা স্বগতোক্তির মতোই, অপরাধ কিংবা ভুল নাকি পাপ... সচেতনভাবে কিছু করেছি বলে তো কখনও ভাবিনি... তবু নিজের দেশে এসে এমন বিদেশবিঁভুই-এর মতো মনে হবে কেন... রায়বাবুর মতো লোকেরা কী ভাবছেন... কী জানি... লাভটাই বা কী ওঁদের!

বেরিয়ে পড়লেন দেবতোষ। টের পাচ্ছেন অশান্তিটা ছুঁয়ে রয়েছে সর্বক্ষণ।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে আলোছায়া মেশানো খারাপ রাস্তা আর বড় বড় গাছের তলা দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গাটায় পৌঁছতে অসুবিধে হল না দেবতোষের। ভেতরের পরিবেশটা অবশ্য খারাপ না। ছোট ছোট সিমেন্টের চাতালের ওপর ছাতা, সামনে লেক-এর জল। শীতের দিন

বলেই হয়তো অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। পরিবারবর্গসহ বেশ কিছু ক্লাবসদস্যরা সম্ভবত দোতলার ক্লাবরুমে আড্ডা জমিয়েছেন। দিবাকর আগেই এসে পৌঁছেছিলেন। ওয়েটার গোছের একজন দেবতোষকে পৌঁছে দিয়ে গেল চাতালের ছাতার নীচে। দেবতোষের মনে হল, নিরিবিলিতে কথা বলার আদর্শ জায়গাই বটে!

আসুন, আসুন দেববাবু, চেয়ারে বসেই হাত বাড়ালেন দিবাকর। বসুন।

দেবতোষ বসলেন মুখোমুখি চেয়ারে। —আপনাদের ক্লাবের পরিবেশটা চমৎকার। একটু অন্ধকার-অন্ধকার এই যা।

ক্যাটকেটে আলোর চেয়ে এই তো ভাল, তাই না? দুই আছে, আলো এবং অন্ধকার। দিবাকর সিগ্রেট ঠুকতে ঠুকতে বললেন, আপনার সঙ্গে কথাবার্তার বিষয়ও তো আলো-কালো মিশিয়ে।

কালোটা দূর করতেই আমার আসা। দূরে থাকি বলেই অনেক কিছু অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে।

ওসব নিয়ে বেশি ভাববেন না দেববাবু, দিবাকর বললেন, সব অস্পষ্টতা ঘোচেও না, তার মধ্যেই মানিয়ে গুছিয়ে চলা। এনিওয়ে... কী নেবেন? আজ তো আর দিনের বেলা নয়, গাড়িও চালাচ্ছেন না নিশ্চয়ই। হুইস্কি বলি?

দেবতোষের চোখটা সয়ে এসেছিল আবছা অন্ধকারে। বুঝলেন দিবাকর হুইস্কি নিয়েই বসেছেন। বললেন, আচ্ছা বলুন একটা দিতে, শুধু জলটা যেন...।

ওসব নিয়ে ভাববেন না। এখানকার জলে কোনও ভেজাল নেই। পরিচিত ওয়েটারকে ডেকে হুইস্কি-জল-সোডা-বরফ, কিছু বাদাম, আদাকুচি আর স্ন্যাকসও দিতে বলেন দিবাকর। দেবতোষ ভদ্রতা করে বললেন, কিছু মনে করবেন না রায়বাবু, আজকের বিলগুলো কিন্তু আমায় পেমেন্ট করতে দেবেন।

ধুর মশাই... শব্দ করে হাসলেন দিবাকর। ওসব ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে কে দিচ্ছে আপনাকে? কাজের কথা বলুন... কী বলছে আপনার ছেলে? ডিভোর্স মেনে নিচ্ছে? মানে মিউচুয়াল...?

প্রায় চমকে উঠলেন দেবতোষ প্রথম কথাতেই। ডিভোর্স! আপনাকে ডিভোর্সের কথা কে বলল! ওদের ও সমস্ত রাগ-ইমোশনের কথা ছাড়ুন তো... ডিভোর্স ব্যাপারটা যে কতখানি সিরিয়াস... ডিজাস্টার... ও সব ওদের মাথায় আছে নাকি?

নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে দিবাকর শান্ত গলায় বললেন, আপনার এদেশে আসার পরে কবে কথা হয়েছে দেবমাল্যর সঙ্গে?

বেশ কয়েকদিনই হয়নি। দেবতোষ বললেন।

ওয়েটার জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে। টেবিলে সাজিয়ে গুছিয়ে দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন দিবাকর। দেবতোষের হাতে গ্লাস তুলে দিয়ে বললেন— চিয়ার্স। দেবতোষও চিয়ার্স বলে চুমুক দিলেন। ওয়েটার চলে গেছে।

দিবাকর প্রসঙ্গে চলে এলেন। বললেন, কুন্তলা আর দেবমাল্যর যে প্রথম থেকেই বনিবনা, অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে না, আমি জানতাম। এ নিয়ে আপনার সঙ্গেও অল্পসল্প কথা, আলোচনা হয়েছিল, চিঠিও লিখেছিলাম আপনাকে। ভেবেছিলাম সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। হল না, এ আমাদের দুর্ভাগ্য।

দেবতোষ বললেন, আসল আনফরচুনেট ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, মামণির কিন্তু অ্যাডজাস্ট করার কেপাসিটিটাই সামহাউ বড্ড কম।

সেটা তো এক-একজনের এক-এরকম হতেই পারে দেববাবু।

একশো বার! দেবতোষ বললেন, কিন্তু আর কিছু না... আপনাদের মতো আমাদেরও যদি সেটা আগে থেকে জানা থাকত...।

দিবাকরের গলা সুর পালটাল। হোয়াট ডু য়্যু মিন... আগে থাকতে জানা থাকত?

দেবতোষ স্পষ্টই বললেন, মামণির পার্সোনালিটি প্রবলেমের ব্যাপারটা তো বিয়ের পরে হয়নি, অনেক আগে আপনারা জানতেন। এ নিয়ে কিশলয় আর বিদিশার সঙ্গেও আমার কথা হয়েছে—।

তা হলে তো আপনারা জানতেই পেরেছিলেন যে ওর একটু মুডের...আপ-ডাউন হয়।

হ্যাঁ... কিন্তু সেটার জন্য যে ট্রিটমেন্টের দরকার হবে, এতটা তো আগে থাকতে অনুমান করিনি।

করেননি, সেটা আপনাদের নেগলিজেন্স। বিয়ের পরে কলকাতা থেকে লন্ডনে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে মেয়ে কীভাবে অ্যাডজাস্ট করছে, সেটা তো আর আমার দেখার কথা না। ইন ফ্যাক্ট, আপনাদেরই বা অত নাক গলানোর কী ছিল বলুন তো? ওদের ব্যাপার ওরা বুঝত।

দেবতোষ শুধু বিরক্ত না, একই সঙ্গে বিভ্রান্ত এবং হতাশ হলেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, রায়বাবু, বিয়ে হয়ে গেলেই যদি সন্তানদের জন্য আমাদের সব দায়িত্ব চলে যেত, তাহলে কি আজকে আপনাকে-আমাকে এখানে বসে কথা বলতে হত? আমরা সাহেব হয়ে যাইনি, ভারতীয় এবং বাঙালি এবং ফ্যামিলি ভ্যালুজগুলো আছে বলেই তো ছেলে-মেয়েদের জীবন, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবি। সেটাকে আপনি নাক গলানো ভাবছেন কেন?

এক চুমুকে গ্লাস ফাঁকা করে দিবাকর বললেন, নাহয় দায়িত্ব পালনই বলা গেল। কিন্তু দুবছরে তাতেও তো লাভ কিছু হল না।

সেই না-হওয়ার দায়িত্বটা নিশ্চয়ই আপনি আমাদের ওপর চাপাতে পারেন না। দেবতোষ বললেন।

ওয়েটারকে ডেকে পানীয় নিয়ে আসতে বললেন দিবাকর।

দেবতোষ আবার বললেন, বরং এখনও চেষ্টা চলছে, আমরা হাল ছাড়িনি... সেইজন্যই আপনার কৃতজ্ঞতা আর কোঅপারেশনও দরকার।

কোঅপারেট আমি তো এখনও করছি, করতে চাইছি। দিবাকর বললেন, কিন্তু পরিস্থিতির বিচারে তার ডাইরেকশন এখন যে ঘুরে গেছে!

কীরকম?

আপনাদের চেষ্টা, দায়িত্ব পালন যা-ই বলুন, তাতে পজিটিভ রেজাল্ট তো কিছু হল না।

দেখা যাক সেটা। সাইকিয়াট্রিস্ট তো এখনও..।

কিন্তু তার মধ্যেই তো সিচুয়েশন পালটে যাচ্ছে দেববাবু। নতুন গ্লাসে

চুমুক দিলেন দিবাকর। দেবতোষের মনে হল, ভদ্রলোক একটু দ্রুত পান করছেন।

দিবাকর বললেন, কারেন্ট অ্যাফেয়ার সবই আমার জানা, মশাই।

দেবতোষ বললেন, সেটাই তো স্বাভাবিক। ওদেশে ছেলে-বউ রয়েছে। মামণির সঙ্গেও আপনার যোগাযোগ হয় নিশ্চয়ই।

সেই জন্যই দুটি ইম্পর্টান্ট ইস্যু এখন আমার কাছে পরিষ্কার। দিবাকর বললেন। এক, আপনার ছেলের নতুন অ্যাফেয়ার। দুই, এই অবস্থায় কুন্তলা আর ওদের রিলেশনশিপের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। ...নিন, ড্রিঙ্কটা শেষ করুন।

গ্লাস তুলে নিয়ে দেবতোষ বললেন, মামণির আস্থার বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করছি না। কিন্তু টিপলুর অ্যাফেয়ার বলতে আপনি যা শুনেছেন, মনে হচ্ছে সেটা নেহাতই কারও ধরে নেওয়া পার্সোনাল ওপিনিয়ন।

হতে পারে। কিন্তু ডিপেন্ডিং অন দ্যাট, আপনি আসার পরে এই সপ্তাহ দুয়েকে অবস্থার কিছু পরিবর্তনও ঘটেছে। আপনি জানেন না।

বলুন, শুনি।

কুন্তলা সলিসিটর মারফত ডিভোর্স নোটিস সার্ভ করেছে এবং কোর্ট অর্ডার নিয়ে অন্যত্র বসবাস করছে।

দেবতোষ মনের ভেতরের তোলপাড় যথাসম্ভব চেপে রাখলেন। গ্লাসে চুমুক দিলেন। তারপর পূর্ণচ্ছেদ দেওয়ার ইঙ্গিতে বললেন, না, এই ডেভেলাপমেন্টের ব্যাপার জানা ছিল না। একটু থেমে আবার বললেন, এই প্রসঙ্গে তাহলে আপনার সঙ্গে আর কথা বলছি না।

সেই ভাল। দিবাকর হুইস্কি গিললেন। তারপর বললেন, ও ভাঙা কাচ আর জোড়া লাগবে বলে মনে হচ্ছে না। আপনি চাইলে বরং আমরা তার পরের ব্যবস্থাগুলোর আলোচনা খানিকটা এগিয়ে রাখতে পারি। আপনার তো ফেরারও তাড়া আছে।

না রায়বাবু, দেবতোষ বললেন, ওসব আলোচনাও আমি করব না। চাই না। আগে ছেলের সঙ্গে কথা বলি।

করলে ভাল করতেন! দিবাকর যেন এবার পুলিশ অফিসারের মতোই অদৃশ্য লাঠি হাতে ঠুকতে ঠুকতে বললেন। কাজটা অ্যাডভান্স হয়ে থাকত। পিস অব মাইন্ড নিয়ে বিলেতে ফিরতে পারতেন। এনিওয়ে... যখন আপনি চান না...করবেন না।

দিবাকরের শাসানির সুরটা ধরতে ভুল করলেন না দেবতোষ। হুইস্কির গ্লাসটা হাতে তুলতেও কেমন বিবমিষা হচ্ছিল। নিজেকে কিছুটা দমিয়ে রেখেই বললেন, আপনার সঙ্গে অন্য আর একটা কথা ছিল।

বলুন, বলুন। কথা বলার জন্যই তো আজ...। হাতে গ্লাস তুলে নিলেন দিবাকর।

দেবতোষ সোজাসুজি বললেন, পার্থসারথি বলল, আমার ফ্ল্যাটের সব কাগজপত্র আপনি ওর কাছ থেকে চেয়ে নিজের কাছে রেখেছেন, ওগুলো যে দরকার আমার। টাকাপয়সা দেওয়া আছে, ওদিকে রেজিস্ট্রেশনটা পড়ে আছে। এবার কাজ মিটিয়েই ফিরব।

এই তো আপনি আবার আগের কথাতেই ঘুরে আসছেন। আমি তো ওই সব ব্যাপারেই কথা বলতে চাইছিলাম।

কেন বলুন তো? ওটা তো আমাদের কাজ, আমরাই করব।

ফ্ল্যাট রেজিস্ট্রেশন তো করতেই হবে। কিন্তু ও আর আপনার নামে করিয়ে কী হবে! দেবু-কুন্তলার ডিভোর্স হয়ে গেলে, মেয়ে যদি এদেশেই ফিরে আসে...ভবিষ্যতে ওর একটা ব্যবস্থার শর্ত তো থাকবেই। ওদেশের কী হবে না-হবে সে সব সলিসিটার, কোর্ট বুঝবে। কিন্তু এখানে শুধু ফ্ল্যাটটা সোজাসুজি ওর নামেই রেজিস্ট্রি করে দিন। আপনাকে কিছুই করতে হবে না। একটা চিঠিতে কনসেন্ট দিয়ে দেবেন... বাকি কাজ এখানে করিয়ে নিতে আমার.. বুঝতেই পারছেন অসুবিধে হবে না।

স্তব্ধ হয়ে গেলেন দেবতোষ। একটু পরে বললেন, আর যদি আমি লিখে না দিই?

তাতেও আমার পক্ষে কলকাতায় খুব একটা...আমার সার্কলটা তো আপনি জানেন। এখানে সবই হয়, তা ছাড়া কাগজপত্র তো আমার কাছে রয়েছেই। কিন্তু অহেতুক হাঙ্গামায় যাবেন কেন?

হাঙ্গামাটা কার? আপনার, না আমার?

গ্লাসে চুমুক দিয়ে দিবাকর বললেন, পুলিশ অফিসারকে আপনি আর কী হাঙ্গামায় ফেলবেন দেববাবু? কিন্তু এ রকম আনকম্প্রোমাইজিং অ্যাটিচুডে থাকলে... ধড়ে প্রাণ নিয়ে কি কলকাতা ছেড়ে পালাতে পারবেন! কে বাঁচাবে আপনাকে?

আর বসে থাকা সম্ভব হল না দেবতোষের। অনেক চেষ্টা করেও ভিতরের কাঁপুনি উত্তেজনা ঠেকাতে পারছেন না। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ কেন করতে দিলেন না, বুঝতে দেরি হল। আপনার কাগজগুলো হাতিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যও বুঝলাম। কপি আছে আমার কাছে, তা ছাড়া জলজ্যান্ত আমি মানুষটিও আছি। আর কলকাতাতেও আপনি, আপনাদের মতন লোক ছাড়াও এখনও মানুষ বসবাস করেন বলে বিশ্বাস করি।

উত্তেজিত হবেন না দেববাবু। বসুন, দিবাকরের কণ্ঠস্বরে চাপা মৃদু গর্জনেরই আভাস। খুব ধীরে সুস্থে বললেন, আমার মতন লোককে ইনসাল্ট করে আজ পর্যন্ত কেউ পার পায়নি... আর আপনি তো আবার বিদেশি... এই পথটুকু পেরিয়ে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতেও পারবেন তো?

পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলেন দেবতোষ। শীতের ঝরা পাতারা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে ওঁর পায়ের নীচে। কোথাও একটা ভাঙচুর ঘটে যাচ্ছে ভেতরে ভেতরে। চেনা মুখগুলো যাতায়াত করছে চোখের ওপর। একইসঙ্গে কানে বাজছে দিবাকর রায়ের শাসানোর শব্দগুলো। বিগত কয়েক দিনের উড়োফোন, নানানভাবে তাঁদের উত্ত্যক্ত করা, ভয় দেখানো, শান্তি নষ্ট করার স্বরূপগুলোও যেন চিনতে পারছিলেন। অথচ অপরাধ তো কিছু করেননি!

সোজা হেঁটে এসে আলো-আঁধারি পথটা পেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলেন দেবতোষ।

যেমন দ্রুত সময় কেটে যাচ্ছিল, তেমনই টাকা খরচ হচ্ছিল জলের মতো।

জানুয়ারির প্রথম থেকে এই মার্চ পর্যন্ত কীভাবে কোথা দিয়ে জীবনের দুটো মাস দিশেহারার মতো চলে গেছে, আজ ভাবতে গিয়ে নিজের কাছেই অলীক, অবিশ্বাস্য মনে হয় দেবমাল্যর। অথচ সত্যিই তো দুটো মাস পরে আজ যেন ঝঞ্ঝায় বিধ্বস্ত নাবিকের দৃষ্টিতে দূরের তীরভূমি দেখতে পাওয়ার মতো, কোনও একটা নিশানার হদিশ পাচ্ছে দেবমাল্য। তাহলে যা ছিল অলীক, তাই কি সত্যের রূপ নিচ্ছে! অবিশ্বাস্য মনে হলেও, আসলে বুঝি কোথাও একটা বিশ্বাসেরই জমির স্পর্শ পায়ের নীচে। বেঁচেই তো আছে!

অফিসে আজ হাফ-ডে দেবমাল্যর। ইয়াং সলিসিটার পিটার বার্টন তা সত্ত্বেও ওকে থাকতে বলেছে যতক্ষণ পর্যন্ত পিটার টেলিফোন না করে। বলেছে, লেট আস হোপ ফর দ্য বেস্ট, হাওএভার উই নিড টু বি কশাস।

দেবমাল্য জিগ্যেস করেছে, তোমার কি এখনও কোনও ওয়ারিজ আছে পিটার?

আমি তোমাকে কোনও ফলস হোপ দিতে চাই না ডেভ, নাইদার আই ওয়ান্ট টু টার্ন য়্যু ডাউন। তোমার এক্স-ওয়াইফের সলিসিটর ইজ আ ট্রিকি পারসন। হি টুক দ্য অপরচুনিটি অব হার অ্যারোগ্যান্স অ্যান্ড ইওয়োর ইগনর‍্যান্স।

কিন্তু আমি তো ওদের নোটিশ ইগনর করিনি!

আই ডিডনট সে দ্যাট ডেভ, পিটার বলেছে, কিন্তু তোমার অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়েছিল, অ্যান্ড স্কেয়ারড য়্যু। ডিডনট দে?

মাথা নেড়েছে দেবমাল্য।

এনিওয়ে, পিটার বলেছে, জাস্ট ওয়েট ফর মাই কল। ব্যাসিলডন ফিরে যাওয়ার আগে তুমি কনফার্মড নিউজটা শুনে যাও, আমি তাই চাই... নয়তো আবার তোমাকে সেন্ট্রাল লন্ডনে ছুটে আসতে হোক, সেটা চাই না।

আইন ব্যবসায়ী হবে, আবার বন্ধুর মতো অনুভূতিসম্পন্ন, হৃদয়বানও হবে এতটা আশা করেনি দেবমাল্য। হ্যাঁ, প্রথম দিনের আধঘণ্টা কনসালটেশনের সময় বাদ দিয়ে, প্রতিটি খেপেই যখন যেরকম টাকার দরকার হয়েছে বিল দিয়েছে পিটার, টাকা নিয়েছে। কিন্তু সত্যিই কখনও মনে হয়নি, ও চোরকে চুরি করতে এবং গৃহস্থকেও সাবধান হতে বলার মতো পন্থা অবলম্বন করেছে।

পিটার বার্টন দেবমাল্যর সলিসিটর, একমাত্র ওরই প্রতিনিধি হয়ে ডিক্রি নিতে চায়। আসলে পিটার নেহাতই ছোকরা, নতুন সলিসিটার। আইন পাশ করে বছর দুয়েক একটা ল-ফার্মে শিক্ষানবিশি করেছে, তার পরেই ছপ্পড় খুলে বসে পড়েছে। ম্যাট্রিমোনিয়াল অর্থাৎ বিবাহসংক্রান্ত কেস নিয়েই ওর প্র্যাকটিস। ঝানু হয়নি বলে, ক্লায়েন্ট প্রায় নেই। কিন্তু এক-আধটা পেলেই, যাকে বলে, জান লড়িয়ে দেয়। দেবমাল্যর ঠিক এরকম একজনেরই দরকার ছিল। শার্লট প্যাডলি বলে অফিসেরই এক বান্ধবী, নিজের ডিভোর্সের পরে দেবমাল্যর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছে। প্রথম ধাপের একটা নিশ্চিত খবর আজ আশা করছে দেবমাল্য।

বিবাহ বিচ্ছেদের অর্থ আসলে যে এক ধরনের যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার মতো ব্যাপার, দেবমাল্য জানত না। তা ছাড়া সত্যি সত্যি নোটিশ পাওয়ার পরেও কিছুটা অজ্ঞতাবশতও, দ্বিধা দোলাচল ছেড়ে ও কি জ্বলে উঠতে পেরেছিল? সলিসিটরের সঙ্গে কুন্তলা এবং সম্ভবত কিশলয়েরও যোগসাজসে, ওরা যে দেবমাল্যর পায়ের তলা থেকে মাটিটাই সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল, ওর কোনও ধারণা ছিল না। দিশেহারা ভাব, ক্লান্তি-অবসাদ কাটিয়ে প্রাথমিক একটা স্বস্তির ভাব হয়েছিল অনেকদিন পরে, মনে হয়েছিল, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

কিন্তু কোথায় স্বস্তি! বছরের গোড়াতেই দেবমাল্য টের পেয়ে গেল, দু বছরের সুধা-বিষে মেশানো সম্পর্কের জের প্রায় অভিশাপের মতো এবার ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হয়েছে ওর জীবন-জীবিকা-আশ্রয়টুকু

পর্যন্ত। একই সময়ে কলকাতা থেকেও খবর এসেছিল, দিবাকর রায় প্রায় পথে বসানোর চেষ্টা করছেন দেবতোষ-নির্মলাকে, প্রাণ সংশয়ের হুমকি দিতেও কসুর করেননি। মনে হয়েছিল, মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে যেন আচমকা ছুটে আসা ঢেউ-এর উচ্ছ্বাসে ছারখার হয়ে গেল ছোট্ট নিবিড় এক পরিবার, শান্তিপ্রিয় কয়েকটা মানুষ। ভয়-আশঙ্কা-শাসানি-উৎকণ্ঠায় তলিয়ে যাওয়ার অনুভবের সঙ্গেই মিশে গিয়েছিল বিভ্রান্তি। এ কোন গোপন সন্ত্রাস ধেয়ে এল তাদের লক্ষ করে!

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বার করে একবার দেখে নিল দেবমাল্য। পিটার কোনও মেসেজ রাখেনি তো? পুরো চার্জ আছে তো টেলিফোনটায়? সবই ঠিক আছে। কিন্তু পিটার-এর না, অন্য একটা মেসেজ। একটা হার্ট বিট মিস করল কি দেবমাল্য?

কাম হোয়েন ফ্রি, ওয়েটিং। টি।

এই এক অদ্ভুত অচেনা আবেগ। সরল-স্পষ্ট-খোলামেলা-ঘরোয়া, আঁধারে ডোবা শীতল দিনে সখ্যেরই আহ্বান। তবু তৃষার এমন ডাক পাঠানো মেসেজকে অচেনা মনে হয় কেন! আসলে তৃষা নয়, দেবমাল্যই কি অচেনা হয়ে উঠেছে নিজের কাছে! মাঝেমধ্যে আগে কখনও তৃষা ওকে ফোন করেনি তা তো নয়! কোনও খবর দিতে, কিংবা কিছু জানতে, এমনকী শুধু আসতে বলার জন্যই। যেমন এখনও মেসেজ রেখেছে। ইচ্ছে করেই রিং করেনি, জানে ও কাজে আছে। তৃষাও হয়তো ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার পথেই মেসেজ পাঠিয়েছে। একঘেয়েমি কাটাবার জন্য, কিছুক্ষণ বকবক করার জন্য এই ঠান্ডা, কেজো দেশে মানুষ তো হাঁপিয়ে ওঠেই। তাহলেও একটা শব্দ বারবার দেখছে দেবমাল্য—ওয়েটিং।

কী আশ্চর্য, এটা নিয়ে ভাববার কী হল? মাথার মধ্যে নাড়াচাড়া করছে শব্দটাকে নিয়ে। কোনও আর্তি মিশে আছে কি শব্দটায়? একটি ব্যাকুলতা? ...আচ্ছা জরুরি কিছু নয় তো? জেঠুর শরীর...! দেবমাল্যকে টেনশনে না ফেলার জন্য অথচ সময়ও যাতে নষ্ট না হয়...। নিশ্চয়ই না।

জরুরি কিছুর আন্দাজ দেওয়ার মতো শব্দচয়ন তৃষা করতে পারে। সত্যি এত ভাবছে কেন দেবমাল্য!

আলাপ হয়ে পর্যন্ত আড়ষ্ট তো দেবমাল্যই হয়ে থাকত। অবশ্যই বাইরে থেকে দেখা তার অন্যতম কারণ ছিল কুন্তলার অদম্য পরশ্রীকাতরতা, অপ্রত্যাশিত আচরণ। ওর মনগড়া কাল্পনিক অসুস্থ ভাবনায়, আলাপ হওয়া মাত্র যে কোনও যুবতীই ছিল ওর প্রতিপক্ষ। দেবমাল্য হেসে কথা বললে তো আর রক্ষে নেই। তৃষা তার ওপর সপ্রতিভ, সহজ এবং নিজের কথা-হাসি-সৌন্দর্যকে কখনও তথাকথিত সুন্দরী মহিলাসুলভ সচেতনতার মোড়কে ঢেকে রাখতে জানে না বা শেখেনি। তা সত্ত্বেও দেবমাল্যর আড়ষ্টতা কি শুধুমাত্র কুন্তলারই ভয়ে? না কি নিজের স্বাভাবিক ভাললাগা, মুগ্ধতাটুকুও দুর্বলতা মনে করে পাশ কাটাতে চাওয়ার অপপ্রয়াস ছিল!

সুন্দরী মহিলারা সাধারণত তেমন বুদ্ধিমতী হয় না। তৃষা সম্ভবত কিঞ্চিৎ বিরল ব্যতিক্রম। কিছুদিন মাসির বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করার জন্য ওর যেমন হীনমন্যতার কোনও কারণ ছিল না, তেমনই ও বাড়ির অতিথি বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশাতেও বাধা ছিল না। কিন্তু কুন্তলার মানসিকতা ওর মেপে নিতে সময় লাগেনি। দেবমাল্যর আড়ষ্টতা এবং স্বতঃস্ফূর্ত মুগ্ধতাটুকুও। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কুন্তলার ব্যাধি অনেকেরই অগোচরে ছিল না। কিন্তু দেবমাল্যর দুর্বলতাটুকুও যে তৃষা শুরুতেই পড়ে নিয়েছিল, মাত্র গত ক্রিসমাস-এর আগে দেবমাল্যই কি তা জানত?

সামনে টেবিলের ওপর কফির মগ। হাতে মোবাইল। খোলা ম্যাগাজিন পড়ে রয়েছে। এক নিশ্চিন্তির বার্তা আসার প্রতীক্ষা দেবমাল্যর। নিশ্চিন্তিরই কি? চলমান এ জীবনে নিশ্চিত বলে কিছু আছে?

বন্ধ দরজার কাচের ঘরে একা, জীবনের অনুষঙ্গে ঢেউ-এর উপমা মনে আসে দেবমাল্যর। স্রোতের সঙ্গে ছুটে আসছে, ভেঙে পড়ছে, আবার ফিরে যাচ্ছে। অনেকদিন আগে জেঠিমার শেখানো গানটাও মনে

পড়ে। একটু গুনগুনিয়েও ফেলে। ..."শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা, শুধু আলো-আঁধারে কাঁদা-হাসা।" গুনগুন থেমেও যায়।

আপনার গলা কিন্তু বেশ মেলোডিয়াস। তৃষা বলেছিল ক্রিসমাসের দিন বিকেলে। মাঝে মাঝে গান না কেন?

নীচের ঘরে একা বসেছিল দেবমাল্য। ঝুপসি আঁধার নামতে শুরু করেছিল চারটের মধ্যে। তৃষা আর বন্দনা মিলেই ক্রিসমাস ডিনারের আয়োজন করেছিলেন। ধরেই নিয়েছিলেন টিপলু-কুন্তলা দুজনেই আসবে। ঘটনা জানা ছিল না ওঁদের। কিন্তু জানামাত্র শক্তি-বন্দনা কেউ চাননি ছেলেটা একা বাড়িতে বসে থাক এমন দিনে, এই অবস্থায়। প্রায় নির্দেশ দেওয়ার মতোই চলে আসতে বলেছিলেন দেবমাল্যকে।

কোথায় যেন একটা প্রস্তুতি সারা হচ্ছিল দেবমাল্যর কুন্তলা চলে যাওয়ার পরে। উদ্ধার পেতে চাইছিল টানাপোড়েন থেকে। ভেঙে পড়তে পড়তেই যেন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল। হু-হু নেমে যাচ্ছিল জড়ানো প্যারাসুটে, ঝটাস করে খুলে গেল ঢাকনা— ভাসছে, ভাসতে ভাসতে পৌঁছে যাচ্ছে... কোথায়? কোনও এক অজানা, আন্দাজি ঠিকানাতেই কি? বেরিয়ে পড়েছিল... আহ, একা-স্বাধীন-জড়তাহীন... প্রতি মুহূর্তের টেনশনহীন।

ডিনার সেরে বিশ্রাম নিতে গেছেন জেঠিমা, জেঠু। তৃষা বরাবরের মতো সেদিনও সহজ, ঘরে ঢুকেছিল। গান না,গুনগুন থামিয়ে দেবমাল্য বলেছিল, জি ইউ এন গানটা রপ্ত করতে পারলে ভাল হত।

সোফায় বসে পড়েছিল তৃষা। —কী করতেন? চালানোর ধাত আপনার নয়, বেশ বোঝা যায়। মাথা নেড়েছিল দেবমাল্য।

একটু পরে বলল, সেটাও ভুল না। বোধহয় হতাশ মনেরই ভাবনা ওগুলো।

তাও না, তৃষা বলল, শুধু হতাশা থেকেই কি বন্দুকবাজ তৈরি হয়? ওদের মধ্যে চাপা লুকোনো নিষ্ঠুরতা থাকে। আপনার তা নেই।

দেবমাল্য পা টান করে উলটো দিকের সোফায় বসতে বসতে বলল, 'গান' শব্দটা হঠাৎ মুখে এসে গেল তাই বললাম। মনের অবস্থাটা কীরকম

তো বুঝতেই পারছ। তুমি সব জানো বলেই বলছি, আজ সকালের পর থেকে সত্যি মনে হচ্ছে, দু বছর ধরে কী করে টানতে পারলাম!

তৃষা যেন সরল এক বন্ধুর ভাবনা থেকে বলল, আসলে আপনার কমিটমেন্টে তো ঘাটতি ছিল না।

মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানো তো, দেবমাল্য বলল, আমি বোধহয় ঠিক জোর খাটাতে পারিনি সবসময়। জোর না খাটালে, হয় অন্যের অযৌক্তিক দাবিকে মেনে নিতে হয়, নয়তো নিজের প্রত্যাশাগুলো ছেড়ে দিতে হয়!

বউ-এর ওপর জোর খাটিয়ে কি সম্পর্ক বাঁচিয়ে রাখা যায়?

কুন্তলার মতো বউয়ের ক্ষেত্রে বোধহয় যেত।

আমার মনে হয়, তা-ও যেত না। কেন বলব? এক হচ্ছে, আপনার নেচার...মানে এত দিনে যেরকম দেখেছি, সেরকম নয়। মাসি-মেসোর কাছেও শুনেছি তো! আর দুই হচ্ছে, কুন্তলা তো আসলে সিক। জোর খাটালে হয়তো আপনাদের সম্পর্ক আরও আগেই ভেঙে যেত।

দেবমাল্য বলল, কী জানি...তাতে ভালই হত বোধহয়।

হত না। আপনি গিলটি কনসাশনেসে সাফার করতেন।

সাফারিংস কি এখনও নেই?

অফকোর্স আছে। কিন্তু গিলট নেই। ইটস য়োর হিউম্যান রিয়্যাকশন।

এমন হিউম্যান্ রিয়্যাকশনেরই বা কী দাম বলো! দু বছর সময়ের থেকে, যে স্ট্রেস আর যে আতঙ্কের অভিজ্ঞতা হয়ে গেল, সেই ক্ষতিটা কি কোনওদিন পূরণ হবে! অথচ এর জন্য আমার কোনও অপরাধ ছিল না।

তৃষা চুপ করে রইল। একটু পরে পা নাচাতে নাচাতে বলল, কী জানি! দেখুন... এখন একেবারে সদ্য-সদ্য এই অবস্থাটায় পড়েছেন... সব নেগেটিভ চিন্তাগুলোই মনে আসছে। কিন্তু আপনার লাইফ তো আর এখানেই থেমে থাকবে না।

হয়তো তা থাকবে না। দেবমাল্য বলল। কিন্তু চললেও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবে কি না...।

উলটোটাও তো হতে পারে! কিছুটা যেন ভরসা দেওয়ার মতো তৃষা বলল, অতীতের কষ্টের অভিজ্ঞতা ভ্যালুজ অনেক স্ট্রং করে না?

দেবমাল্য উত্তর দিতে পারল না। কথাটা নাড়াচাড়া করতে লাগল মনে মনে।

হঠাৎ তৃষাই আবার বলল, অত ভাবছেনই বা কেন এক্ষুনি? সব তো মিউচুয়ালও হয়ে যেতে পারে!

না তৃষা, তা আর হবে না। দেবমাল্য স্পষ্ট গলায় বলল, যেভাবে আর যতদিন ধরে এই সম্পর্ক আলগা হতে হতে, ভুগতে-ভুগতে, হিউমিলিয়েটেড হতে হতে ভেঙেছে, এ আর জোড়া লাগবে না। অন্তত আমি তার চেষ্টাটুকুও হতে দেব না।

মাথা দোলাতে দোলাতে তৃষা খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, সেই। ভেতরে ভেতরে পার্মানেন্ট ড্যামেজ হয়ে গেলে, আর রিপেয়ার করা যায় না।

হালকা হাসির মতো শব্দ করে দেবমাল্য বলল, অভিজ্ঞতা আছে বুঝি?

তৃষা তক্ষুনি বলল, ছাব্বিশ পেরিয়ে সাতাশ চলছে, জীবন সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা থাকবে না? দু-চারটে সো-কলড প্রেমটেম হয়নি, আমাকে দেখে তাই মনে হয় নাকি?

তা-তা নয়, দেবমাল্যই যেন লজ্জা পেয়েছে, বলল, আসলে সেভাবে কখনও ভাবিনি। মানে...।

একেবারেই ভাবেননি? যাহ... আমার সেলফ কনফিডেন্সটাকেই যে... বউয়ের ভয়ও ছিল নিশ্চয়ই।

ভয়? না...ভয় ঠিক না। তা ছাড়া বউ-এর ভয় কি কারও সম্বন্ধে ভাবনাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে? অশান্তির ভয় বলতে পারো। সুস্থ স্বাভাবিক বন্ধুর মতো সম্পর্ককেও কুন্তলা যে পল্যুটেড করে তুলত। ভাবনা তাই প্রকাশও হয়নি।

এই তো ধরা পড়ে গেছেন টিপলুদা।

দেবমাল্য এমনিতেই ফর্সা। তৃষার কথায় সত্যি সত্যি এবার কান লাল

হয়ে উঠল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলে ফেলল, হেসেই বলল, তোমার মতন একজন মহিলাকে...না না একটি মেয়েকে, কাছ থেকে দেখেও একেবারে কিছুই ভাবব না, মনে হবে না...আমাকেও বুঝি ততটা হাঁদা আর আনস্মার্ট মনে হয়?

তাই বলুন! তৃষা দিব্যি হেসে বলল, ছেলেদের চোখে সব মেয়েই নিজেকে একটু যাচাই করে নেয়। আমিও নিয়েছিলাম।

তা হবে। দেবমাল্য সরলভাবেই বলল, আমার সাইকিয়াট্রিস্ট বন্ধু মানস বেশ কিছুদিন আগেই বলেছিল, আমি নাকি খুব গদগদ হয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলছিলাম...আর কুন্তলা খুব খেপে যাচ্ছিল...।

আমি অবশ্য সেটা জানি না।

আমারও তা মনে হয়নি। তবে সাইকিয়াট্রিস্টের নজর তো...!

কিছুক্ষণের নৈঃশব্দ্যের পরে কথা বলল তৃষা। বাইরের আঁধার ঘন হয়ে এসেছে। বাড়িতে বাড়িতে ক্রিসমাসের রঙিন আলোয় ঘুমন্ত নিঝুম উৎসবের দিন সেজে উঠেছে। মাঝারি সাইজের ক্রিসমাস ট্রি-র ওপরে গোটা কয়েক টুনি বাল্‌ব জ্বলছে এই ঘরেও। তারই টিমটিমে আলোয় ছায়া ছায়া ভাব। তৃষা বলল, আমার অভিজ্ঞতাটা যদিও খুব বিপজ্জনক হয়নি, তা হলেও বিশ্বাসের ভিতটা নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল ইনিশিয়ালি। আমার থেকে প্রায় বারো বছরের বড় এক মেক্সিকান আমেরিকানকে গত বছর বিয়েই করে ফেলছিলাম... মাঝেমাঝেই ওর কিংবা আমার ফ্ল্যাটে একসঙ্গে থাকতাম।

বাবা-মা একটু টেনশন করত...কিন্তু বিয়ে করব ঠিক করে ফেলায় বাবা-মা খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল। কেন কী জানি, আমারই হঠাৎ মনে হল...তৃষা হেসে ফেলল...আবার বলল, বাঙালি তো, ভাবলাম, যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি, সত্যি তার সম্বন্ধে কতটাই বা জানি! এনিওয়ে, টু কাট আ লং স্টোরি শর্ট, সিটিজেনস অ্যাডভাইস ব্যুরোতে খবর নিয়েছিলাম। শুনলাম লোকটা ফ্রড, ইল্‌লিগাল ইমিগ্রান্ট, ফলস পরিচয় দিয়ে একটা হাইড্রোলজি প্ল্যান্টে চাকরি করে। মেইনলি আমার আমেরিকান সিটিজেনশিপ আছে বলেই... এই

আর কী, নতুন কিছু নয়। আসলে অ্যাপারেন্টলি লোকটা ছিল কাইন্ড, চার্মিং... ভেতরে ভেতরে বদ। কিন্তু আমি ওকে সত্যি খুব...। হাওএভার, একটু একটু করে আই গট রিড অব অল মাই ইমোশনস অ্যাবাউট হিম। আমেরিকায় এমন ঘটনা বেশ কমন, তবু...। যাকগে; কেমন লাগল গল্পটা?

দেবমাল্য হাসল না। আস্তে আস্তে বলল, গল্প তো নয়, ফ্যাক্ট।

তৃষা বলল, কিছুদিন ইংল্যান্ডে আসার প্ল্যানটাও তখন করেছিলাম। বড্ড হিউমিলিয়েটেড হয়েছিলাম, ক্যালাস মনে হয়েছিল নিজেকে। তবু বাঁচোয়া, পুরো ফেঁসে যাইনি, প্রেগন্যান্ট হয়ে যাইনি...।

তৃষার সরল স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে অবাকই হচ্ছিল দেবমাল্য।

একটু পরে বলল, এদেশে কেমন লাগছে?

তৃষা হেসে বলল, একটু ন্যাড়া ন্যাড়া আর ছোট ছোট লাগছিল প্রথম প্রথম। এখন বেশ ভালই লাগে। কিছুটা দেখতে দেখতে, কিছুটা শুনে, এখন আমার মনে হয়, দেশ হিসেবে আমেরিকার চেয়ে ইংল্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্কটা যেন বেশি হয়। হয়তো ছোট দেশ বলেই। ওখানে স্টেটের বাইরে লোকের সঙ্গে লোকের সম্পর্ক বাইরের দেশের মতো। টাই আপ কম। তা ছাড়া শুধু আমেরিকান বলে তো একটা জাত আগে ছিল না, সব রকম, সব দেশের লোক মিশে আমেরিকান...কিন্তু সবাই কি সত্যি সত্যি মিলে মিশে গ্যাছে! মনে হয় না।

দেবমাল্য বলল, কিন্তু এখানেও তো... আমরা যারা সিটিজেন... সত্যি সত্যি ব্রিটিশ হতে পেরেছি কি?

তা আবার হয় নাকি? কিন্তু ইন্টার‍্যাকশনটা মেইনলি একটা জাতির সঙ্গে, হুইচ ব্রিংস আদার এথনিক পিপল ক্লোজ টু দেম। আর একটা ব্যাপারও মনে হয়। ব্রিটিশরা টলারেন্ট বেশি, কম্পোজড এবং ভদ্রতা এদের কাছে শেখার মতন।

হঠাৎ কথা থামিয়ে তৃষা বলেছিল, আপনার সঙ্গে বিগত এত দিনেও এত কথা হয়নি, আজ একদিনে যত হচ্ছে।

ইচ্ছে থাকলেও উপায় ছিল না। দেবমাল্য বলেছিল, সত্যি যা

রিল্যাক্সড লাগছে...। আর মুখে কথা না হলেও...তুমি বুঝতে নিশ্চয়ই খুব কনশাস হয়ে থাকতাম।

উঠুন, চা খাবেন তো?

হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম বকবক করতে করতে।

তা হলে কিচেনে গিয়ে বসান। আমি মাসি-মেসোকে ডেকে তুলি। দরজার বাইরে পা দিয়েই তৃষা হাসতে হাসতে আবার বলেছিল, মাসি-মেসো বোধহয় ভাবছেন, আমাদের মধ্যে একটু প্রেমটেম হচ্ছে কি না!

দেবমাল্যর মুখে কথা এল না। বোধহয় আবার কান লাল হয়ে যাচ্ছিল।

তৃষা তার পরেও বলেছিল, ন্যাড়া কবার বেলতলায় যায় বলুন!... পারবেন তো চা বসাতে?

চা-এর কথা মনে হতেই নিজের টেবিলে পড়ে থাকা কফির মগের দিকে চোখ পড়ল দেবমাল্যর। তুলে চুমুক দিল। ঠান্ডা জল একেবারে। আর এক কাপ বানিয়ে না এনে উপায় নেই। পিটার টেলিফোন না করা পর্যন্ত থাকতে তো হবেই। কফি করতে করতে ভাবল, মানসকে একটা ফোন করবে কি? অনেক দিন আগে ও দেবমাল্যকে বলেছিল, একদিন সময় করে আসিস, কুন্তলার পাস্ট, ওদের ফ্যামিলি এসব ব্যাপারে যা জেনেছি, বলব। বর্ডারলাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার কীভাবে ডেভেলাপ করে একটা আন্দাজ পাবি।

কফি নিয়ে ফিরে আসতে আসতে মনে হল, সম্পর্ক তো চুকেই গেছে, কাগজে কলমে হয়ে যাবে বলেও মনে হচ্ছে, তা সত্ত্বেও কি কুন্তলা সম্বন্ধে ওর জানার আগ্রহ রয়ে গেছে? যে দিশেহারা তিক্ত অসহ্য অভিজ্ঞতা পেরিয়ে এসেছে, তার জন্য কোনও আগ্রহ, কৌতূহল কি আর বেঁচে থাকা উচিত! কোনও দুর্বলতা আছে কি দেবমাল্যর এখনও? না, দু বছরের যাবতীয় ক্ষত অসম্মান যন্ত্রণা স্মৃতির শিকড়গুলো উপড়ে তুলে ফেলা কিংবা তুলে ফেলার চেষ্টার পরেও যা জেগে আছে তা নেহাতই এক বিভ্রান্ত বিস্মিত জিজ্ঞাসা। দুর্বলতার প্রশ্ন নেই। কৌতূহল আর

জিজ্ঞাসার মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম তফাত নিশ্চয়ই আছে। আবেগহীন কিছু একটা জানার ইচ্ছেই যেন...।

ছোট্ট পাখিটা ডাকছে বুক পকেট থেকে...হালকা মিষ্টি টুই টুই কুক... টুই টুই কুক...

মোবাইল বার করে, দেখে নিয়েই দেবমাল্য কানে ধরল। ইয়েস পিটার?

কংগ্রাচুলেশনস ডেভ। উই হ্যাভ গট দ্য ডিক্রি নাইসাই।...

চারপাশের কোলাহল থেমে যাওয়ার মতো একটা অনুভূতি টের পেল দেবমাল্য। পিটার আরও কিছু বলছে টেলিফোনে, কিন্তু কান থেকে মাথা পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না ওর। বেশ কয়েকটা কথার পরে পিটার বলল, ডেভ, আর য়্যু উইথ মি? শুনছ কী বলছি!

সামান্য সংকোচের গলায় বাজল দেবমাল্য।...ওহ ইয়েস পিটার... না, আসলে ভাবছিলাম। শোনো, নাইসাই কথাটার মানে কী বলো তো?

পিটার হাসল অপর প্রান্তে।—ডোন্ট আস্ক মি, জানি না। এন আই এস আই কোনও ইটালিয়ান কথার অ্যাব্রিভিয়েশন—এটুকুই জানি। আর যা জানি, তা হচ্ছে ডিক্রি নাইসাই পাওয়ার মানে হচ্ছে, তোমার ফার্স্ট স্টেজ অব ডিভোর্স কমপ্লিট হয়ে গেল।

আর কী বাকি রইল কিংবা পড়ে রইল পিটার?

সাধারণত এর পরে যা যা সর্ট আউট করতে হয়, সেগুলো হচ্ছে— অ্যাসেটস, ফাইনান্স, চিলড্রেন এটসেটরা। মনে হচ্ছে না তোমাদের কেসে ওগুলো খুব প্রবলেম হবে। আমরা সলিসিটররা কথা বলে মিটিয়ে নিতে পারব, অ্যান্ড দেন য়্যু গেট দ্য ডিক্রি অ্যাবসল্যুট।

কত দিন লাগবে পিটার?

ডোন্ট ওয়ারি ডেভ। তোমার হাতে সময় আছে? তা হলে এবার তোমাকে কয়েকটা কথা জানাব।

ওহ ইয়েস, আয়াম ফ্রি পিটার, ক্যারি অন।

ডেভ, তুমি বোধহয় জানো না, তোমার এক্স-ওয়াইফ, সাম অব হার রিলেটিভস অ্যান্ড হার সলিসিটর সবাই মিলে দে ওয়ান্টেড টু পুট য়্যু অ্যান্ড য়োর ফ্যামিলি ইনটু রিয়েল ট্রাবল!

সে তো অলরেডি ফেলেছে পিটার। দেবমাল্য বলল, আমি জানি আমার অ্যাসেট-এর শেয়ার দিতে হবে কুন্তলাকে, ফাইনান্সিয়াল সাপোর্টও...

তুমি কিছুই জানো না। পিটার বলল, ওরা তোমাদের ফ্যামিলির টোটাল অ্যাসেটস-এর ফিফটি পারসেন্ট ক্লেম করে ট্রায়ালে যাবে বলে ঠিক করেছিল।

কী বলছ পিটার? সেটা কখনও সম্ভব নাকি?

সম্ভব হত কি হত না, সেটা পরের কথা। কিন্তু কেসটা ড্র্যাগ করে নিয়ে যেতে যেতে তোমরা রুইনড হয়ে যেতে। ওদের সলিসিটর সাইকোলজিক্যালি তোমাদের ওপর প্রেশার ক্রিয়েট করে ফেড-আপ করে দেবে—এ রকম প্ল্যান ঠিক করেছিল।

দেবমাল্য বলল, কিন্তু অত দিন ওরাই বা কেস চালাবার ঝুঁকি নিত কী করে? টাকা পেত কোথায়?

সেটাই কথা। পিটার বলল, ওদের সলিসিটর বলেছিল, তোমার এক্স-ওয়াইফ লিগ্যাল এইড পাবে, যেহেতু ওর রোজগার নেই। সুতরাং ওরা ট্রায়াল কনটিনিউ করবে গভর্নমেন্টের পয়সায়, অ্যান্ড বাই দ্যাট টাইম তোমরা পথে বসে যাবে। শুধু টাকা খরচ তো না, স্ট্রেস টাইম হেলথ . এ সব কথাও তো ভাবতে হবে...।

তারপর? ওরা কি পিছিয়ে গেছে এখন?

সেটা পরের কথা। পিটার বলল, ডেভ, তোমার মনে আছে, লাস্ট ক্রিসমাসের সময় ওরা যে ডিভোর্স ফাইল করেছিল, তাতে কি ডেঞ্জারাস অ্যালিগেশন এনেছিল? নট ওনলি এগেইনস্ট য়্যু, এগেইনস্ট য়োর ফ্যামিলি টু-উ।

মনে নেই আবার! খুব নোংরা অভিযোগ করেছিল আমার বাবা, এমনকী মার বিরুদ্ধেও। আনবিলিভেবল!

ডেভ, ওরা শুধু অ্যাসেট আর প্রপার্টি নয়, তোমাদের এগেইনস্টে ক্রিমিনাল চার্জ আনারও চেষ্টা করেছিল। এখানে কিছু কিছু বাংলাদেশি এবং ইন্ডিয়ান কম্যুনিটিতে ও রকম টর্চারের এগজাম্পলও তো আছে।

হ্যাঁ, কিছু কিছু আমিও শুনেছি।

আর একটা কী জানো তো, এসব ক্ষেত্রে উইমেনদের ফেভারে একটু সফ্‌ট টাচ থাকে। ... তোমার কেস টেকআপ করার পরে প্রথম দিকে আই ওয়াজ সো কনফিউজড ডেভ... মনে হয়েছিল ডিক্রি নাইসাই পাওয়ার তো কোনও চান্স নেই, ট্রায়ালে যেতেই হবে এবং সেই ট্রায়ালের ভারডিক্ট যে কোন দিকে যাবে...।

তুমি তো এসব কিছু আমাদের বলোনি!

ইচ্ছে করে বলিনি। তোমাকে দেখে, তারপর এন্ড অব লাস্ট মান্‌থ তোমার বাবা-মাকেও দেখে আমি বুঝেছিলাম, য়্যু আর দ্য ভিকটিম অব সাম ক্রুয়েল অ্যান্ড ক্রুকেড প্ল্যানিং। আই পার্সোনালি ডিডনট বিলিভ দ্য অ্যালিগেশনস।

তারপর কী করলে?

ওহ্‌, গড সেভড আস। এনিওয়ে, ব্রিফলি বলছি, আমি একজন মুসলিম ব্যারিস্টারকে চিনতাম, মিস্টার আমিন। উনি ক্রিমিনাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইমিগ্রেশন ল-ইয়ার। হি গেভ মি সাম টিপস।তার মধ্যে একটা ছিল, তোমার এক্স ওয়াইফের ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস চেক করা। আর সেইটা করতে গিয়েই, ওয়ান আফটার দ্য আদার... তোমার অনেক সময় নিয়ে নিলাম।

দেবমাল্য তাড়াতাড়ি বলল, ডোন্ট স্টপ পিটার, হোয়াট হ্যাপেন্ড দেন?

পিটার বলল, আমি জানতাম না, তোমার ওয়াইফ তোমার সিটিজেনশিপ স্ট্যাটাস পায়নি। এখন নিয়ম হয়েছে, ব্রিটিশ সিটিজেন অন্য দেশের কাউকে বিয়ে করলে, তিন বছরের মধ্যে স্পাউস-এর স্ট্যাটাস পায় না। ...দ্যাটস দ্য পয়েন্ট অব মাই রিকভারি। আমি প্রথমেই ওদের সলিসিটরকে জানিয়ে দিলাম, শি উইল নট গেট' দ্য লিগ্যাল এইড, অ্যাজ শি ইজ নট আ সিটিজেন ইয়েট। তোমরা ট্রায়ালে যেতে পারো, কিন্তু পকেট থেকে টাকা খরচ করতে হবে...। ওরা তার পরেও ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিল, হিউম্যান রাইট ইত্যাদি বলে, কিন্তু বাই

দ্যাট টাইম আমি ওদের লুপ-হোলসগুলো বার করতে শুরু করেছিলাম। সাইকিয়াট্রিস্ট-এর রিপোর্টও খুব কাজে দিয়েছে।

দেবমাল্য বলল, তার পরেই কি ওরা মিউচুয়ালি সেট্‌ল করতে রাজি হল?

ওয়েল, নাইসাই তো পেয়েছি আমরা, এখন ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাসেট-ও ওরা ক্লেইম করতে পারবে কি না ডাউট আছে। ... কিন্তু ডেভ, একটা কথা মাথায় রেখো, ওরা কিন্তু আবার ইন্ডিয়ান সিস্টেমের কথা বলে তোমাদের ট্রাবল দিতে পারে।

সেটা অলরেডি দেওয়ার চেষ্টা করেছে। ক্রিসমাস-নিউ ইয়ারস- এর সময় আমার বাবা-মা যখন ইন্ডিয়ায় ছিলেন, তখন আমার এক্স ইন ল-দের ফ্যামিলি ওঁদের লাইফ হেল করার চেষ্টা করেছিল।

হোয়াট আ পিটি! পিটার বলল, ডেভ, হোয়েনএভার আই মেট দেয়ার সলিসিটর, আই ইউসড টু ফিল, দে আর কিপিং ইন কনট্যাক্ট উইথ সামবডি ইন ইন্ডিয়া। হাওএভার, তোমার বাবা-মা ভাল আছেন তো!

দে আর অলরাইট পিটার। কিন্তু কলকাতায় ওঁদের যা হ্যাসেল হয়েছিল, সেই শকটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগছে।

দ্যাটস ভেরি ন্যাচারাল। পিটার বলল, এমনিতেই তোমাদের এই অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ, তারপর ডিভোর্স... ওঁদের কাছে বিগ শক। তার ওপর তোমরা এদেশের সিটিজেন হলেও, ইন্ডিয়া তোমাদের দেশ। নিজের দেশে গিয়ে কাউকে যদি ও রকম ট্রাবল ফেস করতে হয়, তার থেকে দুঃখের আর কী হয়!

দেবমাল্য বলল, তুমি জানো, আমার বাবা এতটাই ফ্রাস্টেটেড যে, কলকাতায় আমাদের যে-ফ্ল্যাট আছে, সেটা বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

কেন? কলকাতায় তোমাদের ফ্ল্যাট রাখার অসুবিধে কী?

অসুবিধে কিছু নেই, রাদার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নন-রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ানদের দেশে প্রপার্টি কেনার জন্য এনকারেজ করে। কিন্তু একটা

মাফিয়া গ্রুপ সব সময়েই এন আর আই-দের হ্যারাস করার চেষ্টা করে। লোকাল এক্সপ্লয়টেশনের কথা তো ছেড়েই দিলাম। তা সত্ত্বেও নিজের দেশ তো...।

পিটার বলল, ডেভ, একটু উঁচু কোয়ালিটির হিউম্যান বিয়িং না হলে, সেন্স অব জেলাসি অধিকাংশ মানুষেরই আছে... সে তুমি ইন্ডিয়া-ইংল্যান্ড-আমেরিকা-চায়না-আফ্রিকা যেখানেই বলো। অতদূর যেতে হবে না, এখানে এদেশেও নিজেদের কম্যুনিটির মধ্যে কি এক্সপ্লয়টেশন, জেলাসি নেই?

খুব সত্যি কথাই বলেছ। সম্ভবত তোমাদের থেকে আমাদের কম্যুনিটিতেই সেটা বেশি।

এনিওয়ে আজ আর তোমাকে আটকাব না। কংগ্রাচুলেশন ওয়ানস এগেইন, এনজয় দ্য ইভনিং।

টেলিফোন ছাড়ার পরেও কিছুক্ষণ বসে রইল দেবমাল্য।

পিটার-এর 'কংগ্রাচুলেশন' শব্দটার ব্যঞ্জনা যেন নিজের কানে এক বিচিত্র অর্থে বাজছে। বিচ্ছেদের অনুষঙ্গে তো সহানুভূতিই জানানো রীতি। অথচ এ এমনই এক বিচ্ছেদ, প্রকৃতপক্ষে যা মুক্তির স্বাদে ভেসে যাওয়ারই আয়োজন যেন। সত্যি, মুক্ত আর স্বাধীন অনুভবটাই যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পুরোপুরিই কি? শতকরা একশো ভাগ? ভাবতে চাইল না দেবমাল্য।

খবরটা বাড়িতে জানিয়ে দেওয়া দরকার। বাবা-মা উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছে। ল্যান্ড লাইন থেকেই টেলিফোন করল।

সংক্ষেপে খবরটা জানিয়ে দেবমাল্য বলল, আমার ফিরতে একটু দেরি হবে বাবা, মাকে বোলো।

দেবতোষ বললেন, ঠিক আছে। আমরাও একটু বেরোব।

অফিসের বাইরে এসে মনে হল, আবহাওয়ায় যে এর মধ্যে পরিবর্তন এসেছে দেবমাল্য অনেক দিন খেয়াল করেনি তো। ঠিকই মার্চ মাসের দশ তারিখ আজ, পরিবর্তন তো হওয়ারই কথা। বেলা বড় হয়েছে। মাঝেমাঝেই জমাট বাঁধা ধূসর মেঘেরা বেপাত্তা। কয়েক মাস ধরে প্রায়

ভুলতে বসা আকাশের রং আজ সুনীল হয়ে হাসছে। ঠান্ডা আছে, তবে কনকনানি কম। হাওয়ায় শুকনো উদাস ভাব, বৃষ্টি নেই। কিছু কিছু ন্যাড়া গাছেও যেন ফিকে সবুজের উদ্ভাস, কাঠি কাঠি সরু শাখার ডগায় পাতা গজানোর আয়োজন।

মধ্য লন্ডনে অফিস ভাঙার জ্যাম হওয়ার আগে, দেবমাল্য এ-থার্টিন-এর দিকে ছুটল গাড়ি নিয়ে। তৃষার 'ওয়েটিং' শব্দটা মনে পড়ল।

দিনের আলো ফুরনোর আগেই ব্যাসিলডন পৌঁছে গেল। জেঠু-জেঠিমার বাড়ি ফারম্যান স্ট্রিট-এর দিকে যেতে যেতে দেখল পড়ন্ত সূর্যের হলুদ আলোয় গাছের ছায়ারা লম্বা। শহরের বাইরে বলে দেখা যায়, কয়েক মাসের হারানো পাখির ঝাঁক ডানা মেলেছে আকাশে। আজ সত্যি আকাশ মেঘহীন। ভিজে, মেঘলা আর ঠান্ডায় জমে না থাকলে দেশটা যে কী সুন্দর! আজ যদি আকাশে চাঁদ থাকত...।

শক্তি জেঠুর বাড়ির সামনে কয়েকটা গাড়ি দেখে অবাক হল দেবমাল্য। এমনকী নজরে পড়ে গেল দেবতোষের গাড়িটাও। তা হলে বাবা-মাও এখানে! বুকের মধ্যে মুহূর্তে ধক করে উঠল দেবমাল্যর।তা হলে কি জেঠুর... ইস্‌স তৃষা মেসেজটা...।

যাহোক করে গাড়ি পার্ক করে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল দেবমাল্য। বাইরের দরজা খোলা, ল্যান্ডিং-এর সামনেই বেশ কয়েক জোড়া জুতো। গেল কোথায় সবাই। ওপরে, না নীচে! বসার ঘর ফাঁকা, মুখ বাড়িয়েই স্টাডির পাশ দিয়ে কিচেনের দিকে এগোল। আর তখনই একসঙ্গে বেশ কয়েকজন, স্বপনদা-মুক্তি-সোহিনী-আশিস-পাঞ্চজন্য- রত্না এবং তৃষা প্রায় হইহই করে হাসতে হাসতে রংচং মেখে ওর সামনে হাজির, হাতে লাল-সবুজ-গোলাপি রঙের আবিরের প্যাকেট। জেঠিমার গলা শোনা গেল, ওরে তোরা সবাই বাইরে আয়!

বাগানের দিকে বারান্দায় আসতে আসতে গালে মুখে মাথায় আবির মেখে ভুত দেবমাল্যও। এদেশে থাকলে সত্যি তো কারই বা মনে থাকবে যে আজ দোল! অন্যদের প্যাকেট থেকেই সবাইকে আবির

মাখিয়ে দিতে দিতে দেবমাল্য তৃষাকে বলল, মেসেজটায় একটা হিন্ট দেবে তো, তৈরি হয়ে আসতাম!

তাহলে আর সারপ্রাইজটার কী থাকত? তৃষা বলল। বাগানে এসো টিপলুদা, মিনিট পনেরো থেকে, সবাই ভেতরে যাব।

বাগানে তখনও চেয়ার নিয়ে বসে আছেন শক্তি-বন্দনা, দেবতোষ-নির্মলা ছাড়াও দুই বয়স্কা মহিলা, নিশ্চয়ই কারও মা বা শাশুড়ি হবেন। বাকিরাও একসঙ্গে নেমে এল। যদিও ঠান্ডা, তা হলেও চমৎকার আবহাওয়া। ঝকঝকে আকাশ থেকে দিনের আলো বিদায় নিতে চলেছে, পশ্চিমের লাল আভায় সেজে গোধূলিও যাই-যাই করছে। তবু একসঙ্গে অনেকের কথা হাসাহাসিতে ভুলতে বসা দোলের দিনটা অন্য রকম একটা মাত্রা পেয়েছে।

বন্দনা বললেন, এই সব প্ল্যানই আজকে তৃষার। রত্না আর সোহিনী ছাড়া কাউকে কিছু বলেওনি।

আশিস বলল, মাসিমা, ইস্টএন্ড থেকে সব আবির কিন্তু আমি এনেছি।

তৃষা বলল, আসলে কয়েক দিন ধরে প্ল্যান করেও আমি শুধু ওয়েদার রিপোর্ট দেখছিলাম। যখন ফোরকাস্ট শুনলাম ব্রাইট অ্যান্ড সানি স্কাই ডিউরিং দ্য ডে, কোল্ড অ্যান্ড ক্লিয়ার স্কাই অ্যাট নাইট তখনই রত্নাদি আর সোহিনীকে বললাম। একটু পরে কী রকম চাঁদ ওঠে দেখবে।

স্বপন বলল, ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া করেছিস তৃষা, কিন্তু খেতেটেতে দিবি তো?

মুক্তি লাড্ডুর ট্রে নিয়ে বাইরে এল। বলল, বেশি খাই খাই করো না প্রথম থেকে। চাঁদ উঠলেই ঘরে গিয়ে গান নিয়ে বসা হবে।

ঘরোয়া, তবু অপ্রত্যাশিত আনন্দে-গানে-আড্ডায় জমে গেল সন্ধেটা। সোনার থালা হয়ে চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্নায় ভাসিয়ে দিয়েছে বাগান-উঠোন-বাড়ি। একজোট হয়ে ঘরে বসেছে সবাই। কোণের ছোট্ট আলো ছাড়া আর সব আলো আজ নেভানো। বন্দনার সঙ্গেই বাকিরা গলা মিলিয়েছে, 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো...'। গান চলতেই থাকল।

তৃষার সঙ্গে আলাদা করে খুব গল্প করতে ইচ্ছে করছিল দেবমাল্যর। মাঝেমধ্যেই আজকাল দেখা হয়। তবু আজকের দিনটায় কি বিশেষ কিছু বলার জন্য মনটা ছটফট করছিল! তৃষা আরও অনেক বেশি সহজ, ফ্রেন্ডলি এবং আন্তরিক এখন দেবমাল্যর সঙ্গে। আপনি থেকে কবে তুমিতে এসে গেছে বোধহয় নিজেও জানে না। রাতে ছিমছাম অথচ সুন্দর খাওয়াদাওয়ার আয়োজন মূলত তৃষাই করেছিল। পরোটা-ফুলকপির ছেঁচকি-মাংস আর চাটনি, রসমালাই এনেছিল সোহিনী।

এক এক করে বিদায় নিচ্ছিল সবাই। দেবমাল্য প্রায় বাড়িরই ছেলে। হাতে হাতে অনেকেই বাসনকোসন এগিয়ে দিয়ে গেছে, ঘরদোর গুছিয়ে দিয়েছে কিছুটা। বাসনগুলো ডিশ ওয়াশারে ভরে দিচ্ছিল দেবমাল্য, রান্নাঘর পরিষ্কার করে রাখছে তৃষা। টুকটাক কথাও চলছিল।

ওয়ান্ডারফুল ব্যবস্থা করেছিলে আজ তৃষা।

চার পাঁচ দিন ধরেই ভাবছিলাম... ওয়ারিজ-ও ছিল, উইক-ডে, সবাই আসতে পারবে কি না।

অকেশনটা কী ছিল, শুধু হোলি? দেবমাল্য জিগ্যেস করল।

আর কিছু করলেও হত... থাক, সেটা আমি একদিন আলাদা করে করব।

কী সেটা?

আমার ফেয়ারওয়েল... সামনের মাসে চলে যাচ্ছি তো! তাই নিজেই...।

মানে? কোথায় যাচ্ছ? কবে, কেন?

আমেরিকায়, আবার কোথায়? বাবা-মার কাছে, বাড়িতে, এপ্রিলের মাঝামাঝি...। এখানকার পাট শেষ। দ্যাখো, মুখটা কেমন গম্ভীর, দুঃখী দুঃখী করে রেখেছে! এই টিপলুদা... খুব মিস করবে আমায়?

হাত থেমে গেল দেবমাল্যর। লাগসই কী কথা ঠিক এই মুহূর্তে বলা যায়! ও বলতে পারে।

তৃষাই কথা বলল। আচ্ছা ঠিক আছে, আজকের অকেশনটা শুধু

দোলের-ই। ফেয়ারওয়েল পার্টিটা তুমি অর্গানাইজ কোরো। ওকে?

দেবমাল্য নীরব। বাইরে নীল জ্যোৎস্নায় ভিজে যাচ্ছে চরাচর। অবশ লাগছে ওর।

১২

বাড়ির কনজারভেটরিতে একা বসেছিলেন দেবতোষ। মাত্র এক দিকে ইটের দেয়াল ছাড়া, তিন দিকে ঝকঝকে কাচের স্বচ্ছ দেয়াল। ঢালু ছাতটাও শক্ত আর মোটা, স্বচ্ছ প্লাস্টিক শিট দিয়ে তৈরি। চতুর্দিক দেখা যায় এ ঘরে বসে। দেখার মতো হয়েই প্রকৃতি এখন সেজেছে। গাছে গাছে সবুজ চিকন পাতার সমারোহ, ওক-বার্চ-মেপল গাছের আনাচে কানাচে সেই কচি পাতার ঝাড় এখন হাওয়ায় দুলছে। একমাত্র রকমারি চেরি গাছগুলোতেই পাতা আসেনি, ওদের সরু সরু শাখার ডগায় আগে, এখন ফুল ফোটার আয়োজন। সাদা-লাল-গোলাপি ফুলে ফুলে ভরে যাবে গাছগুলো, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে কদিনের জন্য, তারপর ঝরে যাবে। পাতা গজাবে তারও পরে। বাইরের বড় গাছগাছালি থেকে নিজের বাড়ির বাগানে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলেন দেবতোষ।

নিজে এখনও তেমন যত্ন করতে পারেননি এ বছর। এনার্জি নেই, মন নেই বাগান করার। স্টুয়ার্ট এসে ঘাস ছেঁটে, ফুলগাছের গোড়ার মাটি উশকে, চারধারের সীমানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিয়ে গেছে। তাইতেই ফুলে ফুলে ছয়লাপ বাগান। নানা রঙের গোলাপ আর টিউলিপ। চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়াও ফুটতে শুরু করেছে। ফুল আসতে শুরু করেছে আপেল-পিয়ার্স-চেরি গাছেও। সবুজ ঘাস-কার্পেটের পটভূমিতে রঙিন ফুলের বন্যা, নরম আলোয় আকাশমুখী হয়ে হাসছে, বাতাসে দুলছে। বসন্ত এসে গেছে এপ্রিলের গোড়া থেকে।

হ্যান্ডসেট টেলিফোনটা নিয়ে এসে কনজারভেটারিতে মুখ বাড়ালেন নির্মলা। একা, উদাস মুখ করে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন

দেবতোষ। কাচের স্লাইডিং দরজা ঠেলে ভিতরে এলেন নির্মলা, ফোনটা বাড়িয়ে ধরলেন।

এই নাও। তাপস টেলিফোন করেছে।

তাপস! ব্যস্ত হয়ে টেলিফোন ধরতে ধরতে দেবতোষ বললেন, কোত্থেকে ফোন করছে? কলকাতা, না দুর্গাপুর?

দুর্গাপুরে ফেরেনি তো এখনও। কলকাতার ফ্ল্যাট থেকেই ফোন করেছে। কথা বলো।

সোজা হয়ে বসে, টেলিফোনের এরিয়ালটা টেনে তুলে দিলেন দেবতোষ। কানে ধরেই বললেন, হ্যাঁ তাপস, বলো! তুমি কলকাতায়, ফ্ল্যাটে?

তাই তো কথা ছিল দেবুদা। আপনাকে খবর দিয়ে তারপর ফিরব।

সব ঠিক আছে তাপস?

সব ঠিক আছে। আপনি কোনও টেনশন করবেন না। প্রিয়াদির হাজব্যান্ড আপনার নামে আমাকে একটা ব্যাঙ্ক ড্রাফট করে দিয়েছেন। সাড়ে সাত। আপনার অ্যাকাউন্টে সেটা জমা করে দিয়ে এসেছি। পাশবুকে ওরা আপ-টু-ডেট-ও করে দিয়েছে। ঠিক আছে?

হ্যাঁ ঠিক আছে। আর ...?

চার লাখ উনি ক্যাশ দিয়েছেন, আপনি যে রকম বলেছিলেন। সেটা আমার কাছেই আছে, দুর্গাপুরে নিয়ে চলে যাব, ওখানে গিয়ে ... ।

শোনো তাপস, অতগুলো টাকা নিয়ে ট্রেনে জার্নি করবে ...?

কিচ্ছু ভাববেন না দেবুদা, ওর থেকেও বেশি ক্যাশ নিয়ে আমরা হরদম দুর্গাপুর-কলকাতা করছি। আর শুনুন ...।

হ্যাঁ শুনছি, বলো।

এই সাড়ে এগারো ছাড়া, বাকি দশ, প্রিয়াদির দিদি আমেরিকা থেকে আপনার ওখানকার এইচ এস বি সি ব্যাঙ্ক-এর অ্যাকাউন্টে ডাইরেকট পাউন্ডে ট্রান্সফার করে দেবেন। বলেছেন, আজ আর কাল দুটো দিন অপেক্ষা করতে। পরশুদিন আপনি আমায় কিংবা পাপিয়াকে দুর্গাপুরে একটা টেলিফোন করে খবরটা কনফার্ম করবেন।

নিশ্চয়ই করব। থ্যাঙ্ক ইউ তাপস। আর কী বলব বলো!

কিছু বলবেন না দেবুদা, আমি নিজের লোক। এমনকী টেলিফোনটাও করছি আপনারই বাড়ি থেকে। 'থ্যাঙ্ক ইউ' যদি বলতেই হয়, তা হলে প্রিয়াদির হাজব্যান্ড মিস্টার সুপর্ণ মজুমদারকে বলবেন। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার এবং এ রকম অনেস্ট সিনসিয়ার লোক আমি দেখিনি দেবুদা। দেবতোষ শ্বাস ফেলে বললেন, ঠিকই বলেছ তাপস। অথচ আমাদের নীচের তলার ওই প্রিয়া ... মানে মিস্টার মজুমদারের স্ত্রী প্রথম যখন বলেছিল যে আমাদের ফ্ল্যাট বিক্রি হবে কানাঘুষো শুনেছে, তাইতে আমি খুব রুষ্ট হয়েছিলাম।

ওসব নিয়ে আর ভাববেন না দেবুদা। এত ভাল একজন বায়ার পেয়েছেন আপনারা ... সেটাই ঠাকুরের কৃপা।

হ্যাঁ তাই। তখন ভেবেছিলাম এক রকম ... অথচ সত্যি তিন মাসের মধ্যে সেই ফ্ল্যাট বিক্রি তো করতেই হল। যাক। তুমি রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্র সব ওদের দিয়েছ?

তাপস বলল, ও হ্যাঁ ... সেটাই তো বলা হল না। আমি সব দিয়ে দিচ্ছিলাম, মিস্টার মজুমদার নিজে থেকেই বললেন, এখনও ফুল পেমেন্ট হয়নি, পেপারস আপনাদের কাছেই থাক। এমনিতেও দেবতোষবাবুকে দিয়ে পরে সইসাবুদ করাতে হবে। আরও কী বলেছেন জানেন, আপনারা নেক্সট শীতে এসে স্বচ্ছন্দে এই ফ্ল্যাটেই উঠতে পারেন ... কেননা ওঁর শালি-ভায়রারা তার মধ্যে আসছেন না। আপনারা এই ফ্ল্যাটে থেকেই জিনিসপত্রের বিলিব্যবস্থা সব করতে পারেন।

দেবতোষ বলেই ফেললেন, তাপস, দিবাকর রায়ের মতো লোক আছেন যে শহরে, সেখানেই সুপর্ণ মজুমদারের মতো মানুষও বসবাস করেন ... এমন ভারসাম্য আছে বলেই পৃথিবীটা চলছে। ওঁদের আমার নমস্কার জানিয়ো, পরে আমি টেলিফোন করব।

আপনাদের ও দিকে সব ঠিক আছে তো দেবুদা? টিপলুদের কেসটেস সব ...?

আশা করছি ও সব মিটে যাবে শিগগিরই। তবে বিলারিকের ফ্ল্যাট

টিপলু তো আর রাখছে না। এস্টেট এজেন্টকে বিক্রির জন্য দিয়েছে ... তারপর ভবিষ্যৎ এখন কোন দিকে যায় ...।

ছোটখাটো আরও কিছু নির্দেশ, কাজের কথা বলে টেলিফোন ছাড়লেন দেবতোষ। তার পরেও কনজারভেটরিতে চুপচাপ বসে রইলেন। কিছু দিন ধরে এটাই যেন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে— চুপচাপ বসে থাকা, আর ঠিক দার্শনিক নয়, কিন্তু জীবন নিয়ে ভাবা। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার নিরিখেই ভাবনা, ভাবনার বিষয় বদলে যায়। কিন্তু একমাত্র ছেলের বিবাহ সম্পর্ককে কেন্দ্র করে তাঁর মধ্যবিত্ত জীবনের অভিজ্ঞতা এমনভাবে আলোড়িত হতে পারে, সেই ধারণা ছিল না দেবতোষের। জীবনকে কখনওই ঠিক ততখানি জটিল, আতঙ্কপূর্ণ মনে হয়নি তাঁর। ঝুঁকি আর অনিশ্চয়তা তো জীবনযাপনের সঙ্গেই কমবেশি মিশে থাকে, প্রায় প্রতিনিয়ত, তা বলে পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাওয়ার মতো অনুভূতি হবে কেন! একটা সময় কি সত্যি মনে হয়নি, আর কোনওদিন কি তেমন মুক্ত স্বাধীন মন নিয়ে দেশে এসে ঘুরে বেড়াতে পারব? সেই সময়টা পার হয়ে এসেছেন দেবতোষ। হয়তো অনুভূতিটাও আস্তে আস্তে আরও কেটে যাবে। কিন্তু অমন এক অভিজ্ঞতা কি কিছুমাত্র সমৃদ্ধ করল এই জীবদ্দশাকে! কে জানে, হয়তো করেছেও। ক্ষতি হল, কিন্তু বোঝবার শক্তিও হয়তো ...।

দিবাকর রায়ের ক্লাব থেকে ফিরে আসার পরে দেবতোষের মনে হয়েছিল, নিঃসঙ্গতা আর বিপদের ঝুঁকির সঙ্গেই তিনি যেন বিশ্বাস হারাচ্ছেন মানুষের ওপর থেকে। এক বিজন প্রবাস মনে হচ্ছিল আপন স্বদেশভূমিকেই। তিনি টের পেতেন ছায়ার মতো দৃষ্টি জরিপ করে চলেছে, প্রতিদিন তাঁদের প্রতিটি কাজ আর উদ্দেশ্যকে, অনুসরণ করে চলেছে তাঁর বাড়ি থেকে বেরোনো, যাতায়াত, ফেরা পর্যন্ত। কী যে অসম্ভব মানসিক চাপ সেই অনুভবের— কাউকে বোঝাতে পারেননি দেবতোষ।

অথচ এখন মনে হচ্ছে, ওই চাপ-ই বোধহয় তাঁকে পরোক্ষভাবে কোথাও শক্তি জুগিয়েছিল ঘুরে দাঁড়াতে। আর তার পরেই বোধহয়

সন্দেহ-ক্ষোভ-আশঙ্কা অতিক্রম করে মনুষ্যত্বের মূল্যবোধটাও হারাতে দেননি। দুদিন ভয়ে-ত্রাসে অন্তরীণ থাকার পরেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন দেবতোষ। কলেজ জীবনের পুরনো বন্ধু মিহির সরকারের বাড়িতে গিয়েছিলেন সল্টলেক-এ, কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার মিহির।

মনের মধ্যে কিছু দোলাচল থাকলেও, বর্তমান অবস্থা আর আসন্ন অপ্রত্যাশিত সংশয়ের কিছুই গোপন করেননি দেবতোষ। মন দিয়ে পুরনো প্রবাসী বন্ধুর কথা শুনেছিলেন মিহির! তারপর হঠাৎই তাঁর একটি মন্তব্যে যেন আলোর ইশারা দেখেছিলেন দেবতোষ।

মিহির জিগ্যেস করেছিলেন, এখন তোমার নাগরিকত্ব কোন দেশের দেবু?

বছর দশেকের ওপরেই ব্রিটেনের। বলার পরেই দেবতোষ টের পেয়েছিলেন সূক্ষ্ম অবিশ্বাসের কাঁটাটাই যেন তাঁর মধ্যে ফুটছে কোথাও। এ প্রশ্ন জিগ্যেস করছেন কেন মিহির! মুখ থেকেও সেটা বেরিয়ে পড়ল। সেটা জিগ্যেস করছ কেন?

সরাসরি উত্তর না দিয়ে মিহির বললেন, তার মানে দেশে আসার জন্য তোমাকে ভিসা নিতে হয় তো? এন্ট্রি পারমিট?

অফকোর্স! দেবতোষ বললেন। তবে প্রতিবছর নিই না। ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের জন্য একসঙ্গে পাঁচ বছরের ভিসা দেয় ইন্ডিয়া হাইকমিশন। আমাদের সবারই তাই নেওয়া আছে। প্রতিবছর একবার তো আসিই, তা ছাড়া খরচটাও কম লাগে।

অর্থাৎ তুমিও ফরেন সিটিজেনের মতো ...।

একটু অসহিষ্ণু হয়ে দেবতোষ বলে ফেলেন, হ্যাঁ ফরেন সিটিজেন, কিন্তু তার জন্য এখানে আমার প্রপার্টি রাখার কোনও বাধা নেই ... লিগ্যালি ...।

দেবতোষের দিকে একবার তাকালেন মিহির। বললেন, সে প্রশ্নে আমি যাচ্ছি না। ও নিয়মও আমার জানা।

একটু চুপ করে থেকে মিহির আবার বললেন, তুমি কি একবারও

ভেবেছ, ব্রিটিশ নাগরিক হিসেবে, তুমি পৃথিবীর যেখানেই যাও বা থাকো, তোমাকে প্রোটেক্ট করার দায়িত্ব আছে ব্রিটিশ সরকারের?

মুখ তুলে তাকালেন দেবতোষ, অভিজ্ঞ-অবসরপ্রাপ্ত-অফিসার বন্ধুটির দিকে। মাথা দোলালেন। হ্যাঁ ... মানে ... তাই তো ...।

আর এ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ববোধও সর্বজনবিদিত। আমাদের দেশের মতো উদাসীন নয় নাগরিকদের সম্পর্কে।

তুমি কী সাজেস্ট করছ?

ইমিডিয়েটলি হাই কমিশন অফিসে গিয়ে তোমার বিপদ, হ্যারাসমেন্ট আর ইনসিকিউরিটির কথা জানাতে হবে।

তারপর?

ইট উইল বি দেয়ার রেসপনসিবিলিটি টু প্রোটেক্ট ইউ, ইয়োর প্রপার্টি ... পুরো ব্যাপারটাই হবে সরকারি লেভেলে। তুমি দ্যাখোনি, কোনও ফরেনার এদেশে আসার পরে যদি নিরাপত্তার অভাব বোধ করে, তাকে সিকিউরিটি প্রোভাইড করা হয়। তোমার জন্যই বা হবে না কেন? তোমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ভিসা দিয়েছে এদেশের সরকার। এখন ব্রিটিশ হাইকমিশনার যদি ভারত সরকারকে জানান যে তাঁদের নাগরিক এসে হ্যারাসড হচ্ছে ... ইস্যুটা কোথায় দাঁড়াচ্ছে বুঝতে পারছ?

নিঃসঙ্গতা, দিশেহারা একাকিত্বের অনুভূতিটা ফিকে হতে শুরু করেছিল দেবতোষের মনে।

তার মধ্যেই মিহির বললেন, কাল সকালেই তুমি কলকাতার ডেপুটি ব্রিটিশ হাইকমিশনার্স অফিসে যাবে ... চলো, আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব ... জাস্ট সি হোয়াট হ্যাপেন্স ... দেশে কি আইনকানুন সরকার কিচ্ছু নেই? এমনকী এটা কাগজের খবরও হতে পারে ...। আমি তোমায় বলছি দেবু, ভারতীয়দের সম্পর্কে ভারত সরকার উদাসীন হতে পারে; কিন্তু একজন ব্রিটিশ নাগরিক সম্বন্ধে পারবে না ... এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জড়িয়ে আছে।

পরের দিন সকালেই মিহিরের সঙ্গে সেই বহুকালের পুরনো চেনা সাদা বাড়িটায় গিয়েছিলেন দেবতোষ। আর কী অদ্ভুতভাবেই তারপর

থেকে চাকা বিপরীত দিকে ঘুরতে লাগল ... সেও তো খুব সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাই বলা উচিত।

ফ্ল্যাটের নীচে পুলিশ পোস্টিং হয়েছিল পরের দিন থেকে। ভি আই পি হয়ে গেলেন দেবতোষ! ঘটনাবলি জানতে বাকি রইল না কারওরই। সেধে এসে আলাপ করে গেলেন অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা। আর তখনই যোগাযোগ হয়েছিল সুপর্ণ মজুমদারের সঙ্গেও। যেসব কথা ওঁরা শুনেছিলেন কানাঘুষোয় এবং জন্ম দিচ্ছিল অস্বচ্ছ কৌতূহলের, দ্বিধাহীন ভাবে দেবতোষ সবাইকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর দুর্ভোগের কথা। কিন্তু মনুষ্যচরিত্র সম্পর্কে যদি সত্যি চিত্তাকর্ষক কোনও অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে তাঁর, তা হয়েছিল, দিবাকর রায়ের পরবর্তী ভূমিকায়।

কলকাঠি কোথায় কীভাবে নড়েছিল দেবতোষ নিজেও সব জানতেন না। তবে কয়েকদিন পরে প্রায় কিছুটা ঢাকঢোল পিটিয়েই, আন্তরিক বন্ধুর মতো দিবাকর নিজে এসে হাজির হয়েছিলেন দেবতোষের ফ্ল্যাটে। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, হাতে মিষ্টির চ্যাঙাড়ি এবং অবশ্যই সঙ্গে উকিল পার্থসারথি এবং ফ্ল্যাট সংক্রান্ত সমস্ত আসল নথিপত্র। আর ভুল করেননি দেবতোষও। বন্ধু-প্রতিবেশী হিসেবে সুপর্ণ মজুমদারকেও সেইসময় একবার ডেকে নিয়েছিলেন। অথচ সব মিটে যাওয়ার কয়েক দিন পরেই দেবতোষ বুঝেছিলেন, তাঁর মন উঠে গেছে এই বাসস্থানটি থেকে। স্থির করেছিলেন বিক্রি করে দেবেন। তখনও অবশ্য জানতেন না ক্রেতা রয়েছেন হাতের কাছেই।

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ঘড়ির কাঁটা পিছিয়েছে এক ঘণ্টা। কাচের ঘরে বসে বসে দেবতোষ খেয়াল করলেন বসন্তের শুরু থেকে প্রকৃতির আয়োজন শুরু হয়ে গেছে বেঁচে ওঠার, সেজে ওঠার। অথচ কোথায় যেন এখনও ভিজে রয়েছে তাঁর মন মেজাজ। সাত-আট মাস আগে প্রথম যেদিন নিশ্চিত হয়েছিলেন টিপলু-কুন্তলার সম্পর্কে ভাঙন ধরে গেছে, এদেশে তখন আসন্ন শরৎকাল, একইসঙ্গে সাজ এবং সাজ

ফুরনোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল প্রকৃতিতে। আর আজ যখন আকাশে-বাতাসে গাছে গাছে যাবতীয় নতুনেরই স্পন্দন, তখনও তো তিনি একাত্ম হতে পারছেন না এই প্রকৃতির সঙ্গে, আয়োজনের সঙ্গে! এ কি নেহাতই আজন্মলালিত তাঁদের আবেগ, দুর্বলতা? ঝেড়ে ফেলতে না পারার ব্যর্থতা! স্নেহের প্রাবল্য?

হাওয়ার মতোই এলোমেলো হয় দেবতোষের ভাবনারা। প্রথমেই মনে আসে, টিপলুর কি কোনও একটা মানসিক প্রস্তুতি চলছে তৃষাকে নিয়ে? কিন্তু চললেও, খুব স্বচ্ছন্দে কি ও আর এগোতে পারবে! প্রতি মুহূর্তের সচেতনতাই এখন থেকে ওর বাধা হয়ে দাঁড়াবে না? কিছুটা হীনমন্যতা?

নাকি এ সমস্ত দেবতোষেরই পুরনোপন্থী ভাবনা! আধুনিক জীবনযাপনে, বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ দুই-ই হয়তো স্বাভাবিকতার ছন্দে সহনীয়! কে জানে ... এ প্রজন্মকে তিনি কিছুটা বুঝলেও, বেশ কিছুটা তো না বোঝার অন্ধকারেই হাতড়াতে হয়।

ভাবনা পালটে যায় দেবতোষের। তাঁরা কি দেশে ফিরে যাবেন এর পরে? গেলেও আর কোথায়ই বা উঠবেন এবার! নিজের একটা ডেরা না থাকলে প্রবাসীদের গোপন অভাববোধ তৈরি হয়। আচ্ছা, ভাটপাড়াতেই কি তিনি একটা ফ্ল্যাট কিনতে পারেন না! শুনেছিলেন, গঙ্গার ধারে, বলরাম সরকারের ঘাটের কাছাকাছি একটা আট না দশতলা ... আহ ... কী চমৎকার গা জুড়নো সেই হাওয়া ... রাতের অন্ধকারে দূরে নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে একটা নৌকো, টিমটিম লম্ফ জ্বলছে ... জলের শব্দ ...।

মেঘহীন ব্যাসিলডনের আকাশ, জ্যামিতিক রেখায় উড়ে যাচ্ছে একঝাঁক সিগাল— দেবতোষের চোখে পড়ে। কোন ঠিকানায় উড়ে যায় ওরা!

কোনও বিশেষ একটা ভাবনাই দানা বাঁধে না দেবতোষের মনে। কেমন এলোমেলো হয়ে যায় সব কিছু

মানস বলল, দ্যাখ টিপলু, পার্সোন্যালিটি ব্যাপারটা কী?

দেবমাল্য কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলে, পার্সোন্যালিটি ... মানে ব্যক্তিত্ব আর কী ... কে কেমন কথা বলে ... সেন্স অব প্রেস্টিজ ...

পার্সোন্যালিটি হচ্ছে, নানান ধরনের পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে কী রকম আচরণের দ্বারা একটা মানুষ তার পরিচিতি, কোয়ালিটি টিকিয়ে রাখতে পারে সেই কেপাসিটি। অফকোর্স এই আচরণের মধ্যে ধরতে হবে তার কথা, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ এটসেটরা ..., আর সেই কেপাসিটিটার গন্ডগোল হয়ে যাওয়ার অর্থ কোয়ালিটিগুলোও ঠিক থাকে না— সেটাই হচ্ছে পার্সোন্যালিটি ডিসঅর্ডার।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দেবমাল্য। তারপর বলল, কোয়ালিটিগুলো টিকিয়ে রাখার কেপাসিটি থাকবে না কেন?

সেই কেন-র উত্তর হচ্ছে— দ্য কজেস অব পার্সোন্যালিটি ডিসঅর্ডার। মানস বলল। কথা হচ্ছে, কজ হিসেবে অনেক কিছুকেই সাইকো অ্যানালিসিস করে বার করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ক্রমশ দেখা গেছে, বিশেষ কতকগুলো কারণের জন্য, বিশেষ এক ধরনের পার্সোন্যালিটি প্রবলেম হয়। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকমও হয়— কারণগুলো মেশামিশি হয়ে থাকে। সুতরাং খুব নিশ্চিত করেই যে কতকগুলো কারণকে ...।

দাঁড়া, মানস, দেবমাল্য বলল, তার মানে কিন্তু তুই নিজেই তোর কথাকে কনট্রাডিক্ট করছিস।

অ্যাপারেন্টলি তা মনে হলেও, আমি কিন্তু কনট্রাডিক্ট করছি না। আসলে যেটা আমরা করি, প্রথমে সাইন-সিমটমগুলো দেখে একটা ডায়াগনসিস করার চেষ্টা করি যে কী টাইপের পার্সোন্যালিটি ডিসঅর্ডার।

হ্যাঁ। যেমন কুন্তলার ডায়াগনসিস হচ্ছে বর্ডারলাইন পি ডি।

এগজ্যাক্টলি। এবার যেহেতু পার্সোন্যালিটির গন্ডগোলটা বোঝা যেতে শুরু করে উইথ গ্রোয়িং এজ, সেই হেতু কজগুলো আমরা খুঁজতে শুরু করি রেট্রস্পেকটিভলি অর্থাৎ অতীত হাতড়াতে শুরু করি। কেননা, অতীতের প্রভাবেই ...।

শোন মানস, আমার অত ফান্ডার দরকার নেই ... ইটস সিম্পলি মাই কিউরিওসিটি যে কুন্তলার কেন অমন সামঞ্জস্যহীন মানসিকতা? বিহেভিয়ার?

মানস হেসে ফেলল। সরি। তোকে অনেকক্ষণ থেকে বোর করছি।

ব্যাপারটা তা নয় মানস। দেবমাল্য বলল, বোরড আমি হচ্ছি না, কিন্তু খুব ডিটেল জানতে বা বুঝতে গেলে আমি কনফিউজড হতে পারি। আমি শুধু নিজেকে স্যাটিসফাই করতে চাই— এইটুকু জেনে যে আমার কিংবা আমাদের জন্য ওর কোনও ক্ষতি হয়নি। ওর সমস্যা ওর নিজের বা ওর পরিবারের এবং সেটা আগে থাকতেই ছিল। ব্যাস।

ঠিকই বলেছিস। মানস বলল। তোকে স্পেসিফিক্যালিই বলা উচিত। তবে প্রথম কথা, তোর কিংবা মাসিমা-মেসোমশায়ের ওর এই ইলনেস-এর ব্যাপারে কোনও রোল নেই। তোর কৌতূহলের জন্যই বলছি, কুন্তলার বিপিডি-র সমস্ত কারণগুলোই তৈরি হয়েছে কিংবা বলতে পারিস এসেছে ওর ফ্যামিলি থেকে। তুই নিশ্চয়ই জানিস না, ও ছোটবেলায় সেক্সুয়ালি অ্যাবিউজড হয়েছিল—।

মাই গড, তাই নাকি? বাই হুম?

সেটা ও আমায় স্পষ্ট করে বলেনি, কিংবা বলতে চায়নি। তবে ... বাই সামবডি ইন দ্য ফ্যামিলি।

থাক, আমারও জানার দরকার নেই।

আরও আছে। ও ছোটবেলা থেকে প্রচুর চুরি, করাপশন, মিথ্যে কথা বলা, অন্যকে থ্রেট করা, এমনকী কাউকে ধরে এনে মারধর করা ... এই সবও ঘটতে দেখেছে বাড়িতে। গোছা গোছা ক্যাশ ব্ল্যাকমানিও দেখেছে। আর সেই ছোটবেলা থেকেই বরাবর ওকে সাংঘাতিক ভাবে সাপ্রেস করে রেখে দেওয়া হয়েছিল। ও ছিল বাড়ির সবথেকে ছোট, অন্য ভাইবোনদের থেকে বয়সেরও তফাত ছিল বেশি। আর বুঝতে পারছিস, ছোট বয়সের কৌতূহল যেমন প্রবল, তার সঠিক ব্যাখ্যা না পেলে এবং সেগুলো তার কাছে জোর করে চেপে রাখলে, সেই সবের প্রতিক্রিয়াও

যথেষ্ট। সুতরাং যখন থেকে তার নিজস্ব বোধবুদ্ধি বা পার্সোন্যালিটি তৈরি হতে শুরু করে, সে ভায়োলেন্টলি রিঅ্যাক্ট করতেও শুরু করে। নানান রকম হতে পারে সেই রিঅ্যাকশন, কেননা অবচেতন মনের আঘাত কতখানি তীব্র, কিভাবে তাকে প্রভাবিত করেছে তার ওপরে নির্ভর করে ভায়োলেন্সের টাইপ।

দেবমাল্য বলল, ভায়োলেন্স ছাড়া আরও অন্য রকম আউটবার্স্ট কিংবা মানসিকতাও ...?

অফকোর্স, সেই কথাতেই আসছিলাম। মানস বলল, হেট্রেড, জেলাসি, রিভেঞ্জ এ সবও হতে পারে, আবার পুরো অন্য ধরনের রিঅ্যাকশনও ... যেমন কনফিউশন-ডিপ্রেশন-প্যারানয়া-উৎকণ্ঠা ... আর এইসব আউটবার্স্ট-এর ওপর নির্ভর করে পার্সোন্যালিটি ডিসঅর্ডারের ডিফারেন্ট টাইপ ঠিক করা হয়। এর সঙ্গে কখনও জেনেটিক ফ্যাক্টরও থাকতে পারে—।

আমার আর বুঝে কাজ নেই মানস। তবে যা যা বললি, তার থেকে কুন্তলার ব্যাপারগুলো আমি আন্দাজ করতে পারছি। একটু থেমে দেবমাল্য আবার বলল, চিকিৎসা করে ওর কোনও লাভ হত?

ডিটেল আর ভাল সাইকোথেরাপি, কাউন্সেলিং-এ কিছুটা উন্নতি আশা করা যায়। আর একটা হচ্ছে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু পার্সোন্যালিটির পরিবর্তন হয়, তেমনই ডিসঅর্ডারেরও পরিবর্তন হয়। কেউ কেউ অবস্থার সঙ্গে বেশি অ্যাডজাস্ট করতে শুরু করে। আবার কেউ হয়তো মদ ধরে, ড্রাগ ধরে ...। এসকেপ করতে চায়।

এ প্রসঙ্গটি এবার থাক মানস। দেবমাল্য বলল, আই হ্যাড সাম কিউরিওসিটি ... এখন মনে হচ্ছে, আই হ্যাড এনাফ।

মানস হেসে বলল, আমারও মনে হয় সেই ভাল। আসলে এখন আর তোকে বলতে আপত্তি নেই ... ওদের ফ্যামিলিটা হচ্ছে একেবারে ... এনিওয়ে ...।

একটু চুপ করে থেকে বলল, অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ সিস্টেমটারই গোড়ায় গলদ আছে। তা সত্ত্বেও যেহেতু আমাদের দেশে এটা এখনও

সিস্টেম, সেই হেতু মানুষ কেয়ারফুল হতেও শুরু করেছে। শুনেছি, পাত্রপাত্রী নির্বাচনের বিষয়ে বই-ও আছে। কিন্তু তোদের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, সেটার জন্য দূরত্ব এবং খোঁজখবরের অভাব এই দুটোই রেসপনসিবল। অফকোর্স ব্যাড লাক ছাড়া।

দেবমাল্য বলল, আরও বড় ডিজাস্টার-এর হাত থেকে বেঁচে গেছি, এখন মনে হচ্ছে সেটাই যথেষ্ট। হয়তো বাবার যে অবস্থা হয়েছিল ...। ইনফ্যাক্ট আমাকেও ওরা এখানে ডোবাতে চেয়েছিল, কিন্তু যখনই বুঝল লিগ্যাল এইড পাবে না এবং ওর স্ট্যাটাসটা ঠিক নেই, তারপর থেকেই পিছু হাঁটতে শুরু করল।

মানস জিগ্যেস করল, ডিক্রি অ্যাবসল্যুট পাচ্ছিস কবে?

মনে হয় শিগগিরই পেয়ে যাব। ওরা সেটা নিয়েও প্রবলেম ক্রিয়েট করার চেষ্টা করেছিল। আমার অ্যাসেট, প্রপার্টির ফিফটি-ফিফটি ক্লেইম করেছিল। কিন্তু কোর্ট সেগুলোও নাকচ করে দিয়েছে, কেননা, ডিভোর্সের পরে ওর তো আর এ দেশে থাকারই পারমিট নেই।

তার মানে তোর আর কোনও ফিনান্সিয়াল লায়াবিলিটিজ নেই?

একেবারে নেই তা নয়। দেবমাল্য বলল, এদেশ থেকে সব গুছিয়ে চলে যাওয়ার জন্য কোর্ট ওকে একটা সময় ফিক্সড করে দেবে। সেই সময়ের জন্য ওর মেনটেনেন্সের খরচ ইত্যাদি আমি দেব, যেহেতু ও কাজ করে না। তা ছাড়াও একটা কিছু লাম্পসাম দিতে বলবে, সেটা এমন কিছু না।

আর তোর বিলারিকের ফ্ল্যাট?

ও ফ্ল্যাট তো আমি বিক্রি করে দিচ্ছি ... ওখানে আমার পক্ষে আর ... ইমপসিবল।

ফ্ল্যাট বিক্রির টাকার শেয়ার দিতে হবে না?

না। কেননা ও ফ্ল্যাট কেনা হয়েছিল আমাদের বিয়ের আগে, তখন কুন্তলার কোনও রোল-ই ছিল না। এমনিতেও আমি তো মর্টগেজ দিয়ে যাচ্ছি, আর এখন সেই অবস্থাতেই বিক্রি করে দিচ্ছি। আমার নামে আর কোনও প্রপার্টিও নেই।

খুব বেঁচে গেছিস, মানস বলল, নয়তো ওরা আরও ক্লেইম তো করতই, হয়তো কোর্টও তখন একটু সফট হত।

দেবমাল্য বলল, আমি অবশ্য সলিসিটর মারফত জানিয়ে দিয়েছি, যেহেতু কুন্তলাও ওই ফ্ল্যাটে ছিল, আমি ওকে ... জাস্ট আমার নিজের সেন্টিমেন্টের জন্য একটা পার্সেন্টেজ টাকা দেব, কিন্তু সেটা ডিক্রি অ্যাবসল্যুট ফাইনাল হওয়ার পরে।

মানসদের হাসপাতালের কাছেই একটা কফিশপে বসে কথা বলছিল দুই বন্ধু। অফিসটাইম পার হয়ে গেছে। তা হলেও বেলা বড় এখন, তাইদিনের আলো রয়েছে। যথারীতি লন্ডনের আসন্ন সন্ধ্যাকালীন মুখরতাও জমে উঠছে। ঘড়ি দেখে মানস বলল, তার মানে ডিভোর্সের জন্য তোর আর টেনশন নেই। মিটে যাচ্ছে।

দেবমাল্য শ্বাস ফেলে বলল, আই হোপ সো। পিটার বার্টনও তাই বলেছে।

মানস সোজা তাকিয়ে আছে বন্ধুর দিকে। —এবার কী করবি?

কিচ্ছু না। একা থাকব। দু বছর ধরে আমার যা গ্যাছে ...।

পারবি না টিপলু।

কেন পারব না?

প্রথম হচ্ছে, দু বছর ধরে অনেক ধকল গেছে বলেই, নাউ ইউ নিড মেন্টাল সাপোর্ট। দুই হচ্ছে, যার বিয়ে হয়নি, সে একা থাকতে পারে। কিন্তু ভালমন্দ যে রকমই হোক, একবার যার বিয়ে হয়েছে, তার পক্ষে আর একা জীবন কাটানো নেক্সট টু ইমপসিবল রে।

নিঃশব্দে মানসের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল দেবমাল্য। তারপর বলল, ভেবে দেখি।

দ্যাখ। তবে আর্লিয়ার দ্য বেটার। —সামান্য হেসে উঠে পড়ল মানস।

গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরে আসতে আসতে আনমনা হয়ে পড়ছিল দেবমাল্য। এ-মার্টিন রাস্তাটা প্রায় মোটর-ওয়ের মতো। যেমন ব্যস্ত, তেমনই দ্রুত গতিতে ছোটে গাড়িগুলো। ও বাঁদিকের লেন-এ এসে গতি নিয়ন্ত্রণে রাখল। মাথায় আসছে মানসের কথাটা। আর্লিয়ার দ্য বেটার।

তৃষা আমেরিকা ফিরে যাবে আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি।

গত মাসে দোলের দিন হঠাৎই বলেছিল ও নাকি নিজের ফেয়ারওয়েল পার্টি দেবে। আকাশ থেকে পড়েছিল দেবমাল্য, অথচ কিছুই বলতে পারেনি, কিন্তু না-বলা কথাগুলোর যাবতীয় অভিব্যক্তিই বোধহয় মুহূর্তে ফুটে উঠেছিল মুখে। তৃষা খেয়াল করেছিল কি? বোধহয় করেছিল, কিন্তু তার পরেও ও ছিল দিব্যি সহজ। কথা ফিরিয়ে নিয়ে বলেছিল, ফেয়ারওয়েল পার্টিটা দেবমাল্যকেই ব্যবস্থা করতে।

বেশ কবারই তো তৃষার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তারপর। পার্টি দেওয়া হয়নি। ইচ্ছে করেই দেয়নি দেবমাল্য। যেন পার্টির অনুষঙ্গে ফেয়ারওয়েল শব্দটাই ওর বুকে ধাক্কা মারছিল বারবার। অথচ ইস্টএন্ড-এর সমুদ্রের ধারেও সেদিন ঘুরে এল।

সূর্য পাটে বসেছে। কমলা রঙের আলো দূর সমুদ্রের জলে। সেই জল ছুঁয়ে উঠে আসছে এলোমেলো ঠান্ডা হাওয়া। নিরিবিলিতে পাশাপাশি বসে ছিল দুজনে। গায়ে পুলওভার থাকলেও সঙ্গে স্কার্ফ এনেছিল তৃষা। সেটা মাথার ওপর দিয়ে ঢেকে নিতে নিতে বলল, তোমার খুব স্ট্রেস যাচ্ছে টিপলুদা। চোখমুখ দেখে বোঝা যায়।

দেবমাল্য তাকাল ওর মুখের দিকে। পড়ন্ত সূর্যের আলো ফুরনো আভা পড়েছে তৃষার মুখে। ও চোখ নামিয়ে নিল। কী একটা সংকোচে যেন ওর মুখের দিকে কয়েক পলকের বেশি তাকাতে পারে না দেবমাল্য। তৃষা সুন্দরী, আন্তরিক আবার সপ্রতিভও। এবং নিঃসংকোচ।

আস্তে আস্তে দেবমাল্য বলল, কী জানি, বোধহয় স্ট্রেস নয়, ডিপ্রেশন।

তৃষা বলল, স্ট্রেস থেকেই তো ডিপ্রেশন হয়।

তাহলে তো এখন আমার স্ট্রেস কেটে যাওয়ার সময়। ডিপ্রেশন হবে কেন?

কথাটা মুখে বলল বটে, কিন্তু যেন জোর নেই। একটা অবসাদ যে তাকে অধিকার করে রয়েছে দেবমাল্য জানে। আর এও জানে, আসলে পিছনের কারণটা অন্য। নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব। একটা মানসিক প্রস্তুতি ব্যর্থ হতে চলেছে, কুণ্ঠায়, ব্যক্ত হতে না পারায়। তৃষার ফিরে যাওয়ার

সিদ্ধান্ত আকস্মিকভাবে এক শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। অথচ ওকে বাধা দেওয়ার জোরটা যেন দেবমাল্য অর্জন করতে পারছে না। কিছু বলাও যে হয়নি!

নিজেকে আর একটু স্পষ্ট করার মতো দেবমাল্য বলল, আমার আসলে বড্ড ফাঁকা লাগছে তৃষা, নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে।

কথাটায় জড়াল না তৃষা। বলল, খুব স্বাভাবিক। যা-ই হোক, দুটো বছর তো একসঙ্গে ছিলে ... ফাঁকা লাগবেই।

তা নয় তৃষা, প্রায় মরিয়া হয়ে বলে ফেলে দেবমাল্য। কিন্তু পরের কথাটা হারিয়ে যায়। ইতস্তত করে বলে, ও দুটো বছর ছিল অভিশপ্ত।

তা হলেও ... কুন্তলার জন্য তোমার মনটা অকুপায়েড তো থাকত ... তার পরের চার-পাঁচ মাসও দেখেছি কী রকম টেনশনে ছিলে ...।

সেটা ছিল হ্যারাসমেন্ট আর অনিশ্চয়তার টেনশন।

তাই তো। তৃষা বলল, আবার নিশ্চিন্তির পরেও যে এক ধরনের শূন্যতা হওয়ারই কথা। সেটা থেকেই একাকিত্ব, ডিপ্রেশন। তাই হচ্ছে তোমার।

কী বলা যায় মাথায় আসছে না দেবমাল্যর। অথচ আকুলিবিকুলি একটা ছটফটানি চলছে নিঃশব্দে। সত্যি কি তৃষা বুঝতে পারছে না, ও কী বলতে চায়! এত দিন ধরেও পারছে না! নাকি ও বুঝলেও, বাধাটা দেবমাল্যর নিজের মধ্যেই? একটা ডিভোর্সি ছেলেকে ও বন্ধুর মতো সহানুভূতি দেখাতে পারে, হয়তো যেমন দেখাচ্ছে এখনও। তার বেশি কিছু নয়। সত্যিই কি, না? তা হলে এত ঘনিষ্ঠই বা ও হবে কেন! শুধুই ভদ্রতা, আর যতটুকু সম্ভব সঙ্গ দান করে, একটা বিপর্যস্ত মানুষকে কিঞ্চিৎ স্বস্তির প্রলেপ দেওয়া! না, তা নয়। তা হলে বুঝতে পারত দেবমাল্য।

সময় বয়ে যাচ্ছে। সামান্য অস্থিরতা নিয়ে দেবমাল্য বলল, আমি যেন কিছুতে ঠিক ... নিজের মতো হয়ে উঠতে পারছি না তৃষা।

যাহ্, তা কেন পারবে না টিপলুদা! তৃষা যেন অবলীলায়, কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই নিজের মনোভাব ব্যক্ত করে। বলে, তোমার এমনকী পরিবর্তনটাই বা হয়েছে!

একটা দাগ থেকে গেল না জীবনে! একটা খুঁত?

কেন? একবার বিয়ে করেছিলে বলে?

সেটা তো মিথ্যে নয়। একটা অ্যাডজেকটিভ সবসময় উচ্চারিত হবে আমার নাম, পরিচিতির সঙ্গে। ডিভোর্সি।

হু কেয়ারস? ওটা তো তোমার কমপ্লেক্স। বরং তুমি এখন আরও এক্সপিরিয়েন্সড, অ্যালার্ট হয়ে গেছ জীবন সম্বন্ধে। তুমি তো তোমার কমিটমেন্ট থেকে, ডিউটি থেকে কখনও ডিভিয়েট করোনি টিপলুদা। তাহলে বিয়েটাকে দাগ, খুঁত এসব ভাববে কেন?

সত্যি সত্যি এবার একটা স্বস্তি অনুভব করে দেবমাল্য। অন্তত ওই ঘটনা সম্পর্কে তৃষার কোনও নেতিবাচক অনুভব নেই। কোথাও যেন একটু শক্তি সঞ্চয় করল। আর সেই শক্তিতেই বলে ফেলল, তুমি ইংল্যান্ডে থাকলে খুব ভাল হত তৃষা।

মুখের থেকে চোখটাই বেশি ঘোরাল তৃষা। সামান্য কুঞ্চন দুই ভুরুর মাঝখানে। কোথায় যেন এক চিলতে হাসি, রহস্যমাখা—কেন?

তোমার কথার মধ্যে একটা পজিটিভ টোন, স্ট্রেংথ আছে, কনফিডেন্স পাওয়া যায়।

মুখ সোজা করল তৃষা। দিনের আলো নিবে আসা দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, ওটা নিজে অর্জন করাই ভাল টিপলুদা। আমি আমার ভাবনা থেকে কথা বলি। কিন্তু তোমার ব্যাপারগুলো তোমার নিজের মতো হওয়াই ঠিক।

মাথা দোলাল দেবমাল্য—ট্রু, তা হলেও ডিফিকাল্ট সিচুয়েশনে কারও সাপোর্ট খুব হেলপ করে।

সে ডিফিকাল্ট সিচুয়েশন তোমার ওভার হয়ে গেছে। তৃষা মুখ ঘোরাল দেবমাল্যর দিকে। হালকা হেসে আবার বলল, কিছুটা থাকলেও সেই সাপোর্ট, হেলপ-এর জন্য আমার ইংল্যান্ডে থাকার কোনও প্রয়োজন নেই।

বুকের মধ্যে কেমন একটা মৃদু আলোড়ন টের পায় দেবমাল্য। একটু চিনচিনে ব্যথাও বা। বোঝে, তৃষা সহানুভূতিশীল হতে পারে, ও

আন্তরিকও, কিন্তু আবেগ নিয়ে চলার মতো মেয়ে নয়। সুতরাং একটা কিছু এখনই বলার দরকার।

নিজেকে বেশি গোছানোর আগেই দেবমাল্য বলে, আর যদি অন্য কোনও প্রয়োজন থাকে?

কেন থাকবে? আমি তো কারও প্রয়োজনে লাগব বলে এখানে আসিনি। নিজেরই দরকার ছিল। কেন, তাও তোমায় বলেছি।

সেই দরকারটা কি ফুরিয়ে গেছে তৃষা?

সামান্য একটু ভেবে নিয়ে তৃষা বলল, কী জানো ... না ফুরলেও, ভেবে দেখলাম, আমার নিজের জায়গাতেই আমার মনটা বসানোর চেষ্টা করা উচিত। আপরুটেড হয়ে কোথাও গেলে, সমস্যার সমাধান হয় না। সেটা যেখানকার, সেখানেই পড়ে থাকে। তা ছাড়াও একটা কারণ আছে।

কী সেটা?

যে কোনও জায়গাতে সেখানকার নিজস্ব কিছু সমস্যা থাকবেই। সেগুলোর সঙ্গেও জড়িয়ে পড়তে হয়।

শুধু কি সমস্যাই? আর কিছু নয়? প্রীতি সম্পর্ক নির্ভরতা ভালবাসা ...?

হেসে ফেলল তৃষা। বলল, এক দিক থেকে ওগুলোও তো সমস্যা। নয়? মাঝখান থেকে টানাপোড়েন।

দেবমাল্য হাসতে তো পারলই না, বরং খুব কষ্ট করে নিজেকে দমিয়ে রেখে বলল, তুমি আমেরিকায়, বাড়িতে যাও তৃষা। ছ-সাত মাস এখানে রয়েছ ... সত্যি অনেক দিন। কিন্তু ... তুমি আবার ফিরে এসো। তখন সমস্যাগুলোকে সমস্যা না-ও মনে হতে পারে।

তৃষ্ণা বলল, ইংল্যান্ড-আমেরিকায় আমার তেমন কোনও তফাত মনে হয় না টিপলুদা ... সবই প্রায় একই রকম ... হয়তো সেটা বেসিক্যালি আমরা ইন্ডিয়ান বলে। কিন্তু এত বছর ওখানে থেকে, এঁদেশে ফেরার জন্য একটা জোরালো কারণ তো পেতে হবে। যে কারণে ইউ সি এল-এর অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছিলাম, যদিও আরও প্রায় ছ-মাস সেটা আছে, তা হলেও সেটাকে আর তত ইম্পর্টান্ট মনে হচ্ছে না।

আর পারল না দেবমাল্য। বুকের ভেতর থেকে কেউ একটা ধাক্কা দিয়ে বলাল, তুমি কি আমার জন্য ফিরে আসার কথা একবার ভাববে? একবার?

তৃষা সময় নিল। তারপর বলল, তোমার কি মনে হয় না, এতদিন সে কথাটা আমি একবারের বেশিই ভেবেছি? উইদাউট এনি হিপোক্রিসি?

হ্যাঁ মনে হয়েছে, কিন্তু জিগ্যেস করতে পারিনি। সেই কারণটা কি তোমার ইম্পর্টান্ট মনে হয় তৃষা?

আমি নিশ্চিত নই টিপলুদা। তুমি আমায় ভুল বুঝো না ... কিন্তু মনে হয়েছে ইমোশনালি রিঅ্যাক্ট করছি কি না!

সদ্য আঁধার নামতে শুরু করা আকাশের নীচে, সমুদ্রের মুখোমুখি এই প্রথম তৃষা নিজের হাত দিয়ে স্পর্শ করল দেবমাল্যকে। বলল, আমার জীবনের ওপর দিয়ে একটা ঝড় গেছে, হয়তো তার তীব্রতা কমেও এসেছে এখন। আমি তোমার শূন্যতা, নিঃসঙ্গতাটাও টের পাই টিপলুদা। কয়েক মাস ধরে এই পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে নিজের ভূমিকাটাও আমার না বোঝার কোনও কারণ নেই।

দেবমাল্য দ্রুত বলল, তোমার ভূমিকা মানে ... তুমি কি কখনও আমার প্রবলেমের জন্য নিজেকে রেসপনসিবল মনে করেছ?

ওহ্ নো-নো, তা নয়। তৃষা বলল, আমি নিজের ইনভলভ্মেন্ট, দুর্বলতা, তোমাকে ভাল লাগার কথাই ভেবেছি। হয়তো ইমোশনালি প্রকাশ করিনি ... কিন্তু বিশ্বাস করো, প্র্যাকটিক্যালিও ভেবেছি। না ভাববার তো কিছু নেই। নিজের জীবন সম্পর্কে ডিসিশন নেওয়ার অধিকার তো আমার আছেই।

তৃষা নীরব হয়ে গেল। চুপ করে রইল দেবমাল্যও। বেঁকে যাওয়া সমুদ্রের কিনার ঘেঁষে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে সার সার আলো। জোয়ার আসার প্রস্তুতি চলেছে, জল বাড়ছে সমুদ্রে। আলোর ছায়া কাঁপছে সেই জলে।

দেবমাল্য একটু পরে বলল, তৃষা তোমাকে জোর করার তো প্রশ্নই নেই, অনুরোধও করছি না। শুধু বলছি, নিজের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তুমি যদি

নিশ্চিত হও, আমার জন্য ফিরে আসার কারণটা যদি জোরালো মনে হয় কখনও, আমাকে জানিয়ো। খুব বড় ঘা খেয়েছি জীবনে, সেইজন্য নিজেকে সত্যি সত্যি এবার চিনতে চেষ্টা করছি। আমি অপেক্ষা করব।

তাও কোরো না টিপলুদা। তৃষা বলল, তোমার অপেক্ষা করাটা আমার কাছে চাপ মনে হতে পারে, আর তোমার কাছেও পরে বাধা মনে হতে পারে। যোগাযোগ তো আমাদের থাকবেই। তৃষা হাসল। থাকবে না?

হাসার চেষ্টা করল দেবমাল্য। থাকবে। আর কথা এল না মুখে।

চার-পাঁচটা দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। পিটার বার্টন ডিক্রি অ্যাবসল্যুট পেয়ে গেছে হাতে, টেলিফোন করে জানিয়ে দিল দেবমাল্যকে। ওদিকে বিলারিক-এর ফ্ল্যাট বিক্রির ফাইনাল কথা হয়ে গেছে বলে এস্টেট এজেন্ট জানিয়েছে। বছর তিনেকের মর্টগেজসহ প্রায় সাঁইত্রিশ হাজার পাউন্ড ফেরত পাবে দেবমাল্য। পিটারকেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছে, যেন এক চতুর্থাংশ টাকা কুন্তলার নামে ওর সলিসিটরকে দিয়ে দেয়।

তিনটের সময় হিথরো থেকে জে এফ কে-র ফ্লাইট তৃষার। সব ঠিক করাই ছিল আগে থাকতে। দেবমাল্য ওকে নিয়ে যাবে। কম্পিউটার রিজার্ভেশন করা ছিল। লাইনে দাঁড়াতে হল না। টার্মিনাল ফোর-এ তিন মিনিটের মধ্যে চেক-ইন করে, বোর্ডিং-পাশ হাতে নিয়ে চলে এল তৃষা। কাস্টম আর ইমিগ্রেশন চেকিং-এ ঢুকবে। দেবমাল্য দাঁড়িয়েছিল। দুজনে লাইন থেকে একটু সরে এসে দাঁড়াল। দু ঘণ্টার মতো সময় আছে এখনও ফ্লাইট ছাড়তে, তা হলেও ভেতরে ঢুকে যেতে হবে তৃষাকে। চেকিং-এ সময় লাগে আজকাল।

পৌঁছে একটা টেলিফোন কোরো তৃষা।

করব। তৃষা বলল। খুব মিস করব তোমাকে, তোমাদের সবাইকে।

মাথা দোলাল দেবমাল্য। তারপর বলল, সে দিন ইস্টএন্ডে আমার জন্য তোমাকে ফিরে আসতে বলায় তুমি নিশ্চয়ই ...।

কিছুই মনে করিনি, তোমায় স্বার্থপরও ভাবিনি। বরং তুমি স্পষ্ট বলে নিজেকে চিনিয়ে দিয়েছিলে।

মনে একটা দ্বিধা এসেছিল আমার পরে। অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম এবার। সুতরাং কথাটা আর ফিরিয়ে নিচ্ছি না।

কী ভাগ্যিস! তৃষা খুব স্বাভাবিক ভাবেই হাসল। বলল, ও কথাটা ফিরিয়ে নিলে, আমার ভাবনার জন্য আর কী থাকত টিপলুদা?

দেবমাল্যও হাসল —কেন? তোমার নিজের জন্য, নিজের জীবন সম্পর্কে ডিসিশন নেওয়ার ভাবনা!

তৃষা বেশ শব্দ করেই হাসল এবার। বলল, ভেরি গুড। সত্যি সত্যি নিজের জন্য ভাবব। নিশ্চিত হওয়ার জন্য, ডিসিশন নেওয়ার জন্য। ভাল থেকো।

তৃষার হাসিটা কমে আসতে আসতেই দেবমাল্য বলল, সেফ জার্নি ...।

গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল তৃষা। একটা সুগন্ধের রেশ ছড়িয়ে রয়েছে দেবমাল্যর চারপাশে। ও আর দাঁড়াল না। হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল মালটিস্টোরিড কারপার্ক-এর দিকে। ঝকঝকে পরিষ্কার আবহাওয়া বাইরে। উষ্ণ রোদ আর ঠান্ডা হাওয়া মেশামিশি হয়ে রয়েছে। শুধু একবার মনে হল দেবমাল্যর, জীবনটা কি এখান থেকেই শুরু হতে পারত না! দীর্ঘশ্বাস মোচন করে ও বুক ভরে নিশ্বাস নিল। প্রতিশ্রুতি কিছু নেই। প্রতীক্ষা ... তাও না। অথচ এক নিবিড় অনুভবের উষ্ণতায় ও ভরে থাকবে।